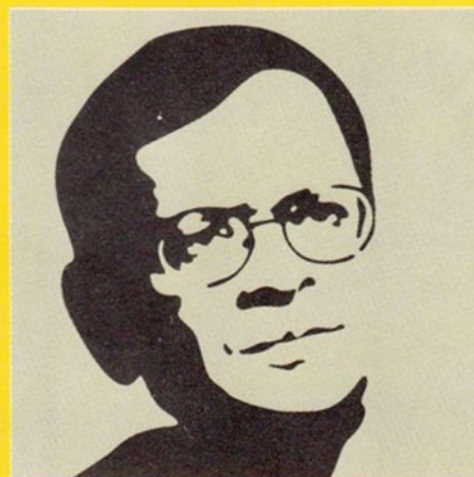
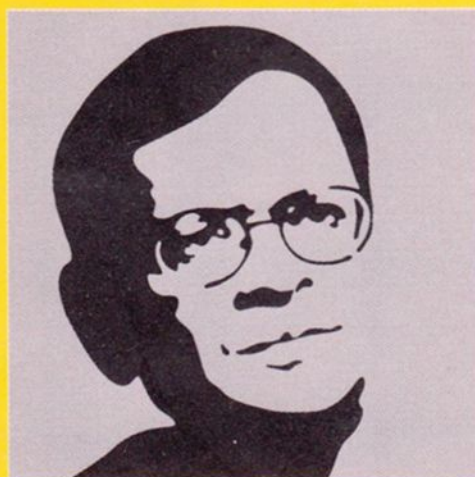
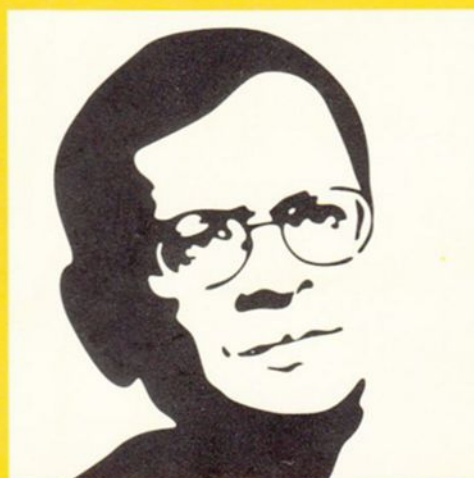


আমার ভাই

হুমায়ূন আহমেদ



মমতাজ শহীদ



নন্দিত লেখক হুমায়ূন আহমেদ ।

ডাক নাম : কাজল

নিজের রাখা নাম : হুমায়ূন আহমেদ

জন্ম : ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮

মৃত্যু : ১৯ জুলাই ২০১২

পিতা : মৃত ফয়েজুর রহমান আহমেদ

মাতা : আয়েশা ফয়েজ

বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে কৃতিমান ও জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ প্রায় চার দশক ধরে লিখছেন, তাঁকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে বিরাট এক পাঠকসমাজ ।

শহীদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হুমায়ূন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা গল্প-উপন্যাসগুলোতে বাবাকে হারানোর ব্যক্তিগত-পারিবারিক আবেগের সীমা ছাড়িয়ে গোটা জাতির দুঃখ, বেদনা, সংগ্রাম ও সংকল্পের ছবি ফুটে উঠেছে ।

এই গ্রন্থটির মাধ্যমে হুমায়ূন ভক্তরা হুমায়ূন আহমেদ সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য-কাহিনী জানতে পারবেন । খুঁজে পাবেন নতুন এক হুমায়ূন আহমেদকে । বইটি পড়ে পাঠক উপকৃত হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে ।



মমতাজ শহীদ । জন্ম ১৭ ডিসেম্বর ১৯৫৪ সিলেটের মীরাবাজারে । বাবা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ফয়জুর রহমান আহমেদ এবং মা আয়েশা ফয়েজ ।

বড় ভাই জনপ্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদ । মেজো ভাই মুহম্মদ জাফর ইকবাল এবং ছোট ভাই কার্টুনিস্ট আহসান হাবীব ।

বড় বোন বাংলার এসোসিয়েট প্রফেসর সুফিয়া হায়দার ।

অবসর কাটান বাটক, টাইডাই, জ্যান্টিং ইত্যাদি মজার মজার কাজ করে ।

স্বামী অবসরপ্রাপ্ত মেজর শহীদ উল্লাহ এবং তাঁদের একমাত্র কন্যা শবনম শহীদ ।

বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে তাঁর অনেক স্মৃতি অনেক ঘটনা । সব কি আর মনে আছে... যতটুকু স্মৃতি হাতড়ে পাওয়া যায় তাই নিয়েই এই ছোট্ট আয়োজন ।

আমার ভাই
হুমায়ূন আহমেদ



আমার ভাই
হুমায়ুন আহমেদ

প্রধান সম্পাদক
মমতাজ শহীদ

সাহিত্য সম্পাদক
সজল আহমেদ



কালিকলম প্রকাশনা

উৎসর্গ

পাঠক বিমূৰ্খতার হাত থেকে
বাংলা সাহিত্যকে যে রক্ষা করেছে,
আমার সেই বড় ভাইকে

ভূমিকা

গান -মমতাজ শহীদ	৭
হুমায়ূনের স্মরণ করা -সিরাজুল ইসলাম চৌধারী	৯
গল্পবলিয়ে হুমায়ূন আহমেদ -আবদুশ শাকুর	২০
যাকে হারালাম-রাবেয়া খাতুন	৩১
একজন-বহুজন হুমায়ূন -রিজিয়া রহমান	৩৬
হুমায়ুননামা-র জন্য -মুহাম্মদ নূরুল-হুদা	৫০
নাট্যকার হুমায়ূন আহমেদ -শফি আহমেদ	৫৫
হুমায়ূন আমাদের গান - মোস্তাফা জামান আববাসী	৬৮
আমাদের স্বপ্নের কারিগর -আনিসুল হক	৭৯
হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে কিছু কথা -মাহমুদ -আল -জামান	৮৭
পাঠকপ্রিয় হুমায়ূন আহমেদ -হরিশংকর জলদাস	৯২
হুমায়ূন আহমেদের ধর্মচেতনা - মোহাম্মদ হান্নান	৯৬
হুমায়ূন কান পেতে শুনেছি আপনার অন্ধকার গান - সরদার আব্দুর সান্তার	১০৪
হুমায়ূনের টেপেরেকর্ডার - শাওন	১১৩
বাংলাদেশের হৃদয়ে হুমায়ূন -নিয়াজ জামান	১২১
লিডার -আহসান হাবীব	১২৫
জীববাদী হুমায়ূন আহমেদ -ফরিদুর রেজা সাগর	১২৭
দেখা অদেখায় হুমায়ূন আহমেদ -আসাদুজ্জামান নূর	১৩৩
বড়ো বেদনার মতো বেজেছে ভূমি হে -হাসান হাফিজ	১৩৬

ভূমিকা

বাংলার কথা সাহিত্যের কিংবদন্তি প্রবাদ পুরুষ, সাহিত্যে জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, দুই বাংলার জনপ্রিয় ও প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের স্মৃতি চারণ ও উজ্জ্বল জীবনের প্রতিভাসমূলক গ্রন্থ আমার ভাই হুমায়ূন আহমেদের শুধু জনপ্রিয়তা ও লেখনির মাপকাঠিতে নয় বরং সর্বদিক থেকে বিচার বিশেষণ করলে দেখা যায় হুমায়ূন আহমেদের বাংলা ভাষাভাষি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের হৃদয়কে আন্দোলিত করেছেন তাঁর রহস্যময় সৃষ্টি হিমু চরিত্র ও মিসির আলীর দ্বারা। শুধু তাই নয় বাংলা চলচ্চিত্র ও টিভি নাটকে ছিল তাঁর আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তা। তার ব্যক্তিগত জীবন ছিল রহস্যময়তায় ঘেরা। তাই একজন হুমায়ূন আহমেদের তুলনায় তিনি নিজেই। প্রায়ই সকল বোদ্ধা পাঠক ও সমালোচকদের মতে তিনি নিজেই হিমু মিসির আলীর প্রতিমূর্তি। বাংলা কথাসাহিত্যেই শুধু নয় বরং তিনি তার সৃষ্টিশীলতায় জনপ্রিয়তা ও রহস্যময়তায় বিশ্বের এক কিংবদন্তি মহান প্রবাদ পুরুষ। তাঁর মননশীলতার জীবন্ত প্রতিভাস রয়েছে নুহাশ পল্লীর প্রতিটি ধূলিকণার মাঝে। হাতছানি দিয়ে দাঁড়িয়ে পথিকের অন্তর মানসে সুর ও ছন্দের দোলায় মুখরিত করছে সৌন্দর্যের বিস্তৃতি সারি সারি সবুজ বৃক্ষ ও হ্রদের উপরিভাগে মৃত্তিকার তৈরি ভাস্কর্যগুলো যেন পথিকের মনের কৌতূহলকে বাড়িয়ে তুলছে। হুমায়ূন আহমেদে এখনও চির জীবন্ত হয়ে আছেন আমাদের সবার মাঝে। তিনি আজীবন থাকবেন ভক্ত পাঠকের হৃদয়ের মহারাজা হয়ে। তাইতো লেখক ও সম্পাদক মমতাজ শহীদ ও সজল আহমেদের সার্থক নামকরণ আমার ভাই হুমায়ূন আহমেদের কিংবদন্তি ও অসম্ভব জনপ্রিয় হুমায়ূন আহমেদে জনপ্রিয়তার উপর ভর করেই তার রচিত সম্পাদিত মূল্যবান গ্রন্থটি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গভিতে প্রবেশ করায় প্রকাশক জনাব মোঃ আলমগীর রহমান অত্যন্ত খুশি মনেই লেখার জন্য অনুরোধ করেন। একজন কিংবদন্তি, প্রখ্যাত ও অসম্ভব জনপ্রিয় লেখকের স্মৃতিচারণ ও উজ্জ্বল জীবনের প্রতিভাসমূলক সংকলনধর্মী গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে পারায় আমি নিজেকে গর্ববোধ করছি। পাশাপাশি জনপ্রিয় ও প্রখ্যাত এ কথাসাহিত্যিকের পাঠক ভক্তদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কারণ এত অল্প পরিসরের লেখায় এবং সময়ের স্বল্পতার কারণে আমার ভাই হুমায়ূন আহমেদে এই মহান লেখকের যথাযথ মূল্যায়ন হয়তো করতে পারিনি। কিন্তু এ গ্রন্থের মধ্যে বাংলার সকল বুদ্ধিজীবী, লেখক, কলামিস্ট গবেষক ও সাংবাদিক হুমায়ূন আহমেদের সার্থক ও যথাযথ মূল্যায়ন করতে পেরেছেন বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি সকল পাঠক-ভক্তদের সুস্বাস্থ্য ও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করছি।

মমতাজ শহীদ

সজল আহমেদ

গান

আমাদের আকাঁ যতদিন বেচে ছিলেন, ততদিন গানের স্যারও ছিলেন । ‘৭১ সালের পর আর কারো কাছে গান’ শেখা হয় নি । অবশ্যই ভালো গান গাইতেও পারি নি কোন দিন ।

ছোটবেলায় শুনেছি দাদাভাই আর আপা গানের স্যারের কাছে গান শিখতো । আবার গান শেখার বিপদও ছিল । বাসায় কোন মেহমান এলেই মহাবিপদও ছিল । চা নাস্তার পর্ব শেষ হলেই ডাক পড়ত ‘শিখু শেফু যাও হারমোনিয়াম নিয়ে আস মেহমানদের গান শুনাও ।’...ভয়ঙ্কর অবস্থা । একে তো ছোট তার উপর কঠিন কঠিন গান গাইতে হত...গানের ভাষাই ঠিকমত বুঝি না । এটা ছিল আমার ছোট বেলার অভিজ্ঞতা ।

দাদাভাই নাকি এ ব্যাপারে ছিল খুবই সাহসী । মেহমান এলেই একটু পর যখন ডাক পড়ত—যাও হারমোনিয়াম নিয়ে আস । আপা কিছুতেই গান গাইবে না । কিন্তু দাদা ভাই নির্বিকার । তারা বেশি ছোট বলে তখন গানের স্যারেই হারমোনিয়াম বাজাতেন দুজন খালি গলায় গাইত । দাদাভাইকে নাকি শুধু বলার অপেক্ষা...সাই করে হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে বসে পড়ত । হারমোনিয়াম তার বুকে লেগে যায় বাজাতে গিয়ে । কিন্তু সে নির্বিকার...নিয়েই গলায় টান এসে যেত তার...নবীর দুলালি মেয়ে খেলে মদিনায় খেলে মদিনায় । আর সে নাকি বাজাতো বুন অদ্ভুত স্বরচিত পদ্ধতিতে । সবচেয়ে কাছের রিবসটিতে টিপ দিয়ে বাজিয়ে যেতে যেতে শেষ মাথায় চলে যেত । কোন রিবস্কে টিপ দেওয়া বাকি রাখত না । বিভিন্ন সুর শব্দ হয়ে যাচ্ছে সেও গান গেয়ে চলেছে । আমার এটা শোনার কথা । আপা এখনো হাসে— তোমার যা কাভ ছিল, গান কেউ এভাবে বাজায়? আঙুল দিয়ে একটা একটা করে টিপে টিপে যেতে যেতে শেষ মাথায় পৌঁছলে গানও শেষ হারমোনিয়ামও বন্ধ । তার অবশ্যই কোনো লজ্জা-টজ্জা লাগত না । মেহমান গান শুনতে চাইছে, ঘরে হারমোনিয়াম আছে সেটাও বাজানো দরকার...ব্যস । মেহমানরা অবশ্য সবাই খুব ভালো মানুষ ছিল বলেই কেউ হাসত না গভীর মুখে সমঝদারের মতো চোখ বুজে গান শুনে যেত ।

শাহীন বা ভাইয়ার অবশ্য এই রোগ ছিল না । তারা কেউ জীবনে হারমোনিয়াম ছুয়েও দেখেনি । ভাইয়া অবশ্যই কিছু দিন তবলা বাজিয়েছিল ।...তেরে কেটে তাক তাক । দাদাভাইয়া হারমোনিয়ামে গান স্বরলিপি দেখে, আমাদের থেকে শিখে এক আধটু গাইত ।

একবার হঠাৎ সে নিজেই গান লিখতে এবং সুর দিতে শুরু করে দিল । নতুন ডায়েরি উপরে কোনায় লেখা সুরকার হুমায়ূন আহমেদ । গীতিকার হুমায়ূন আহমেদ । ৮ মাত্রা,

তাল দাদরা...। এখানেই শেষ নয় অন্তরা কতটুকু, অস্থায়ী কতটুকু সব লেখা থাকত।
আমরা শুধু স্কুল থেকে এলেই হল। হাত মুখ ধুয়ে খেলায় যাওয়া বন্ধ। দাদাভাই
ডাকছে 'শিশু আয় নতুন গান, নতুন সুর।'

প্রতিদিন কথাও সুরের নতুন নতুন সব গান শিখতে হত। আমার এখানে মনে আছে
তার প্রথম গানটি ছিল—

‘বসে কোন পাখি আমার ঘরে
আমের গাছে দুপুর বেলা
তারে চিনি না তাও জানি না
তার যত পাখা সব লাল রঙে আকা
চোখ দুটি কোলো...চোখ দুটি কালো।’

এই গান কতবার যে গাওয়া হয়েছে। পাশের বাড়ির ছোট ছোট মেয়েদের নিয়ে। গানটি
আরো লম্বা। আমার এতটুকু মনে আছে। যতই দিন যাচ্ছে তার এই গান সুর দেওয়ার
রোগটি যেন আরো বেড়ে যাচ্ছে। একদিন স্কুলে যাচ্ছি। স্কুলের ইউনিফর্ম পরা। আমার
হাতে শুধু বই নেই। ডাক পড়ল এদিকে আয় খুব সুন্দর গান খুব মজার গান। স্কুলে
আমরাও পড়েছি দু’ এক মিনিট দেরি হলে কিছু হয় না।

শোন শোন— মাকড়সা নিয়ে একটা গান শিখেছি...

হায় হায় মাকড়সা রে
হায় হায় মাকড়সা রে
গায়ে তোর বদখত গন্ধ
স্বভাবটা তার চেয়ে মন্দ।’...

গানে মন বসছে না। বিরাট ধমক। যা, এসেই এই গানটা নিয়ে বসবি, হারমোনিয়ামে
উঠানো চাই। স্কুলে ছুটির পর সোজা বাসায় আসবি।

ছুটির পর এসে শুনি দাদাভাই একা একাই সুর মিলাচ্ছে। আগের গান
বাতিল...আরেকটা গান...‘সাজিল সজল মেঘদল নাচিল’।

এরপর হঠাৎ তার ভার্টিটির ছুটি শেষ, সে চলে গেল ঢাকা। তার গানবাজনাও
শেষ।

মমতাজ শহীদ

হুমায়ূনের স্মরণ করা

হুমায়ূন আহমেদকে তো ভুলবার কোনো উপায় নেই, যেমন উপায় ছিল না তাকে না-জানার। বাংলাদেশের শিক্ষিত মানুষ মাত্রেরই হুমায়ূনকে কোনো না কোনোভাবে জানত, যারা শিক্ষাবর্ধিত সেই মানুষরাও হুমায়ূনকে জেনেছে টেলিভিশনে তার নাটক দেখে, কেউ কেউ হয়তো অতিরিক্তরূপে জেনেছে তার তৈরি ফিল্ম দেখে। আমার নিজের জন্য হুমায়ূনকে একটু বিশেষভাবেই জানবার সুযোগ ঘটেছিল, কারণ সে লিখত, যেমন আমিও লিখি এবং আমরা উভয়েই একই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতাম। এই দুই কারণেই তার প্রথম জীবনের এবং আমার নিজের চলাফেরাটা ছিল একই বলয়ের মধ্যে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ভেতর নির্বাচন হতো, সেই নির্বাচনে একবার হুমায়ূন আমাদের সঙ্গে একই প্যানেল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। ওর সঙ্গে আমার উল্লেখযোগ্য অন্তরঙ্গতা তৈরি হয় আমরা যখন একই সঙ্গে চীন ও উত্তর কোরিয়া ভ্রমণে যাই।

ভ্রমণটি ছিল এক মাসের। বাংলাদেশ লেখক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধি দলের ভেতর হুমায়ূন ছিল, আমিও ছিলাম। দলনেতা ছিলেন প্রয়াত ফয়েজ আহমদ, আমাদের সকলের ফয়েজ ভাই। অন্য চারজন সদস্য ছিলেন মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, মুনতাসীর মামুন ও শাহরিয়ার কবির। আমরা সাতজন ব্যাংকক হয়ে চীনে গেছি। দলের ভেতর হুমায়ূন ছিল সর্বকনিষ্ঠ। প্রায়ই দেখা যেত থাকার ব্যবস্থা হতো দলনেতা ফয়েজ ভাইয়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র কামরা, বাকি হুমায়ূনের জন্য তিনটি, অর্থাৎ দুজন করে একটি কামরায় থাকতাম। হুমায়ূন ও আমি একই কামরায় থাকতে পছন্দ করতাম, এবং সে সময়ে তার সঙ্গে বেশ কথা হতো। হুমায়ূন স্বল্পভাষী ছিল, কিন্তু অল্প কথায় তার নানা অভিজ্ঞতা ও পেছনের জীবন সম্পর্কে তথ্য সুন্দর ও সরসভাবে বলত। চীন-ভিয়েতনামে যাওয়ার সময় আমরা সবাই নিজের লেখা কিছু বই সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। বিমান পথেই হুমায়ূন আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আমার দুটি বই, 'শরৎচন্দ্র ও সামন্তবাদ' এবং 'বঙ্কিমচন্দ্রের জমিদার ও কৃষক' দ্রুত পড়ে ফেলেছিল। পড়ে আমাকে বলেছে, 'আপনার লেখাতে কৌতুক থাকে, আমিও কৌতুকের সঙ্গে লিখি। সেটা সত্য। হুমায়ূনের কৌতুকবোধ ছিল খুব জীবন্ত। এবং পাঠকমাত্রেরই জানেন যে সে দুঃখের কথা অনেক লিখেছে। সে সব রচনায় গভীর অনুভূতি আছে, কিন্তু আড়ম্বর নেই। তার পরিমিতবোধটা ছিল অসামান্য। তার সংলাপ বিদগ্ধ ও তীক্ষ্ণ। আর যখন সরাসরি কৌতুক নিয়ে লিখত তখন তো কথাই নেই, পাঠকের পক্ষে হাস্যসম্ভরণ কঠিন হতো। আর ওই হাস্যরসে ভাঁড়ামোর বিন্দুমাত্র ছাপ দেখা যেত না। তার শালীনতাবোধ ও

পরিমিতিবোধ পরস্পর থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয়নি। সেটা একটা কারণ যে জন্য তার রচনা সমাজের সকল পর্যায়ে মানুষের কাছে অমনভাবে গৃহীত হয়েছে। তার বই মা, পড়ে ছেলে পড়েন, বাবা এবং বোনও বাদ যান না। হুমায়ূনের টেলিভিশন নাটক গৃহপরিচারিকা থেকে শুরু করে পরিবারের সকল সদস্য একসঙ্গে উপভোগ করতে পারেন। কোনো অস্বস্তির সৃষ্টি হয় না।

হুমায়ূনের স্মৃতিশক্তি ছিল খুব শক্তিশালী। ঘটনার তাৎপর্য তো বটেই, ঘটনাও সে পরিষ্কারভাবে মনে রাখত। যে-কোনো কথাশিল্পীর জন্যই এটা একটা বড় গুণ, হুমায়ূন বলত, এবং আমরাও নিশ্চয়ই স্বীকার করব। প্রথম যখন আমেরিকায় যায় তখনকার স্মৃতি খুবই উজ্জ্বল ছিল তার কাছে। এমনিতেই সে লাজুক স্বভাবের, তার ওপরে গিয়ে পড়েছে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে, বয়স অল্প, অভিজ্ঞতা একেবারেই নেই। একটি ঘটনা তার খুবই মনে ছিল। আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছবার পর প্রথম কয়েকদিন সকালে সে খেতে যেত একটি রেস্টুরেন্টে। খাবার অপরিচিত, দাম অজ্ঞাত। তাই রোজই সে এগ ও টোস্ট খেতো। টোস্ট করা রুটির ওপর ডিম। কদিন দেখে রেস্টুরেন্টের মালিক পাত্রে করে অন্য একটি খাবার এনে তার টেবিলে রেখে বলে, 'এটি রেস্টুরেন্টের পক্ষ থেকে আপনাকে উপহার। এর জন্য কোনো দাম দিতে হবে না।' হুমায়ূনের ধারণা লোকটির মায়া হয়েছিল। ছেলেটি, যাকে মিস্টার বলেই মনে হয়, সে রোজই এক ও সামান্য একটি খাবার খাচ্ছে দেখে ধারণা হয়েছিল যে ছেলেটি অর্থকষ্টে আছে। অথবা, হুমায়ূন যোগ করেছিল, একই খাবার রোজ রোজ দিতে দিতে বিরক্ত হয়ে গেছে। শুনে আমি হেসেছি হুমায়ূন তেমনভাবে হাসে নি, কেবল প্রসন্ন একটি কৌতুকের রেখা তার মুখে খেলা করেছিল। যে-রেখা ততদিনে আমার বেশ পরিচিত হয়ে গেছে। তার নির্মল পরিহাসের পাত্র তালিকা থেকে নিজেকে যে সে সরিয়ে রেখেছিল তা নয়।

তার একটি নাটকের কথাও বলেছিল হুমায়ূন। মঞ্চের জন্য লেখা। এতে ব্যঙ্গ ছিল। গল্পটা শোনায় নি, তবে একটি দৃশ্যের কথা জানিয়েছিল। রাজা দেখেন তিনি খুবই জনপ্রিয়। প্রতিদিন অগুনতি ভক্ত এসে ভিড় করে। কেউ কেউ রাজার পা ধরে চুমো খেতে চায়। রাজা দেখেন মহা বিপদ। তখন বুদ্ধি করে একটা কাঠের পা বানিয়ে নিলেন। অতিভক্ত প্রজা এলে ওই কাঠের পাটি এগিয়ে দিতেন। প্রজারা কাঠের পায়ের সঙ্গে ঠোট মিলিয়ে প্রীত হয়ে চলে যেতেন, রাজার আসল পা নিরাপদে থাকত। হুমায়ূনের উদ্ভাবনা শক্তি ছিল অসাধারণ। এ ধরনের দৃশ্য সে তার লেখায় অনায়াসে তৈরি করত এবং এ ক্ষমতা তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে নিঃসন্দেহে সহায়ক হতো। ওই যে দৃশ্যের বর্ণনা দিল সে সময় সে নিজে কিছু হাসেনি, যদিও আমি নিজে শব্দ করেই হেসে ফেলেছি।

উত্তর কোরিয়ায় পৌঁছার আগেই সেখানকার কর্তৃপক্ষ ঠিক করেছিল যে ওই দেশে আমাদেরকে নিদেন পক্ষে একমাস থাকতে হবে, যাতে আমরা তাদের অর্জনগুলো সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করতে পারি এবং দেশে ফিরে সেসব বিষয়ে ভালোভাবে লিখতে পারি। শুনে আমরা সবাই কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলাম। বিচলিত হয়েছিল হুমায়ূন, এবং আমিও। মুখ ফুটে বলিনি, কিন্তু উভয়েরই বক্তব্য ছিল এরকম যে, আমাদের তো অনেক কাজ আছে চীনে পনের দিন কাটিয়েছি, ভালো লেগেছে, তারপরে উত্তর কোরিয়াতে পুরো একমাস, সে তো অনেকটা সময়। আমরা পারব না। শেষ পর্যন্ত আমাদের আপত্তিতেই সময়টা কাটছাট করে পনের দিনে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল।

হুমায়ূন যে অনেক বই পড়ত সেটা বাইরে থেকে বোঝা যেত না। নানা বিষয়ে তার আগ্রহের কথা জেনেছি। প্রধান আগ্রহটা অবশ্য ছিল সাহিত্য বিষয়েই। চীন যাত্রায় আমরা রওনা হয়েছিলাম আমাদের বাসা থেকেই। আমরা তখন থাকতাম শহীদ মিনারের উল্টো দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাড়ির একতলায়। হুমায়ূন তাকত আজিমপুরে। মনে পড়ে সকালে সে আমাদের-বাশায় চলে এসেছিল এবং আমরা বিমানবন্দরে গেছি একই সঙ্গে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাড়া নেওয়া একটি গাড়িতে যাওয়ার সময় সে আমাকে বলেছিল, 'চীন সম্পর্কে আপনার তো অন্যরকম আগ্রহ, আপনি সেখানকার সামাজিক পরিবর্তন দেখবেন, আমার আগ্রহ সাহিত্যে। সেদিক থেকে আমি খুশি হতা রাশিয়াতে

' হুমায়ূনের কৌতুকবোধ ছিল স্বাভাবিক জীবন্ত। এবং পাঠকমাত্রেরই জানে যে সে দুঃখের কথা অনেক লিখেছে। সে সব রচনায় গভীর অনুভূতি আছে, কিন্তু আড়ম্বর নেই। তার পরিমিতিবোধটা ছিল অসামান্য। তার সংলাপ বিদগ্ধ ও তীক্ষ্ণ। আর যখন সরাসরি কৌতুক নিয়ে লিখত তখন তো কথাই নেই, পাঠকের পক্ষে হাস্যসম্বরণ কঠিন হতো। আর ওই হাস্যরসে ভাঁড়ামোর বিন্দুমাত্র ছাপ দেখা যেত না। তার শালীনতাবোধ ও পরিমিতিবোধ পরস্পর থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হয়নি।

যেতে পারলে। দেখলাম চীনের সংস্কৃতি-সাহিত্য বিষয়ে বেশ কিছু বই সে পড়ে গিয়েছে। এবং প্রস্তুত হতেই যাচ্ছে সে চীন ভ্রমণে। কথাটা সে চীনে থাকতে থাকতেই একদিন জানাল, অন্যভাবে এবং ভিন্ন প্রসঙ্গে। আমরা সবাই মিলে একটি পার্কে গিয়েছিলাম, সেখানে ঢোকার পথেই হুমায়ূন নিম্ন ও সজীব কণ্ঠে বলল, 'চীন সম্পর্কে অনেকেই অনেক কথা লিখেছেন, কিন্তু এখানে যে একটা বোটকা গন্ধ পাওয়া যায় সেটা কেউ জানান নি।' আমরা সবাই হাসলাম, এবং নিঃসন্দেহ হলাম যে হুমায়ূনের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাটা ভিন্ন রকমের। তার আবিষ্কৃত বোটকা গন্ধটা যেন আমরাও টের

পেলাম প্রত্যেকেই; অথচ হুমায়ূন সেটার কথা না বলার আগে সবাই ওই ব্যাপারে অনবগত ছিলাম।

তার স্পর্শকাতরতাও ছিল অত্যধিক। আমরা যখন চীনে গিয়েছি ওখানকার যৌথ ও সমবায়ী জীবনযাপনভিত্তিক কমিউনগুলো তখন দুর্বল হয়েছে বটে, কিন্তু ভেঙে পড়েনি। তারই একটিতে আমাদের আমন্ত্রণ ছিল মধ্যাহ্ন ভোজনের। চীনের খাবারদাবার বহুধাবিস্তৃতি সম্পর্কে ততদিনে আমাদের কিছুটা অভিজ্ঞতা হলেও পুরোপুরি জ্ঞানলাভ তখনো অসম্পূর্ণ ছিল। সম্পূর্ণতা প্রাপ্তির সুযোগ ঘটল ওই ভোজানুষ্ঠানে। টেবিলভর্তি নানা ধরনের খাবার। সবগুলোই কমিউনের খেতখামারে তৈরি। একেবারে খাঁটি ও তরতাজা। খাবারদাবার আসছেই। নতুন নতুন সংযোজন ঘটছে। আমরা আছি, কমিউনের গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ ও মহিলারা রয়েছেন। এক পর্যায়ে আমাদের ভীষণ বিস্ময় উদ্বেক করে টেবিলের ওপর রাখা হলো আস্ত একটি কাছিম। স্থানীয় পুকুরেই উৎপাদিত। ঠিক জ্যাস্ত নয়, মনে হলো অর্ধসিদ্ধ। ওই বিশেষ খাদ্যটির আশ্বাদ গ্রহণ না করলে বড় রকমের অভদ্রতা করা হবে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা বেশ বিচলিত। ফয়েজ ভাইয়ের কথা আলাদা চীনদেশ ও তাদের খাদ্যাভ্যাস তাঁর পরিচিত। পাকিস্তান আমলে তিনি পিকিং শহরের কেন্দ্রে এক বছর কাজ করে গেছেন, ওই কেন্দ্রের বাংলা সার্ভিসের সূচনাতে তার প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর আমাদের নতুন রাষ্ট্রকে সীমিত দেওয়ার ব্যাপারে চীন যখন গড়িমসি করছিল তখন বাংলাদেশের অনানুষ্ঠানিক বিশেষ দূত হিসেবে একেবারেই গোপনে হলেও তিনি চীন ঘুরে গেছেন, তা ছাড়া নানাদেশ ভ্রমণ ও অন্তর্গত দূততার দরুন সহজে বিচলিত হওয়ার পাত্র নন। তিনি অবিচলিতই রইলেন। কিন্তু আমাদের দশা ভিন্নতর। হঠাৎ দেখা গেল হুমায়ূন উঠে পড়েছে, কচ্ছপটি দেখে তার বিবমিষা জেগেছে, সে স্থির থাকতে পারছে না। ব্যবস্থাপকরা বুঝলেন কী ঘটেছে, তাঁরা তাকে দ্রুত হাতমুখ ধোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। প্রমাণ সাইজের কচ্ছপটিকে সরিয়ে ফেলা হলো, এবং ফিরে এসে হুমায়ূন শান্ত হয়ে বসল। তার প্রতিক্রিয়াটি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, এবং এতই প্রবল যে তাকে দমন করাটা ছিল তার সাধ্যের বাইরে।

চীনে এবং ফেরার পথে ব্যাংককে দেখবার জিনিস তো ছিলই, কিনবার মতো ছোটখাটো পণ্যও ছিল প্রচুর। আমরা সকলেই কিছু কিছু সংগ্রহ করেছি, তবে হুমায়ূনের আগ্রহটাই দেখা গেল সবচেয়ে কম। বেইজিংয়ে ফ্রেন্ডলি শপে নানা ধরনের জিনিসপত্র পাওয়া যায়, হুমায়ূনকে দেখলাম শিশুদের কাপড়জামার এলাকায় ঘুরছে। কী কিনেছে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে ঢাকায় ফিরে। কয়েকদিন পরে এক বিকেলে হুমায়ূন এসেছে আমাদের বাসায়। আগে কিছু জানায়নি, একেবারেই অপ্রত্যাশিত। এসে বলল তিন

কন্যাকে চীনের জামাকাপড় পরিয়ে নিয়ে এসেছে, আমার স্ত্রী ও আমাকে দেখাবার জন্য। এই হলো হুমায়ূন।

এর পরে হুমায়ূনের একটি পুত্র সন্তান জন্ম নেয়, এবং অল্প ক’দিন পরেই শিশুটি মারা যায়। আমার স্ত্রী তাকে ফোন করেছিল তাদের দুঃখে সহানুভূতির জানাবার জন্য। হুমায়ূনকে পায়নি, নিজের নাম বলে রেখেছিল। কিছুক্ষণ পরে হুমায়ূন ফোন করেছে। শুনি বলছে, ‘নাজমা জেসমিন চৌধুরী কি আছেন, তিনি আমাকে ফোন করেছিলেন? ফোনটা আমিই ধরেছিলাম, হুমায়ূন তার ব্যস্ততায় ও বিষণ্ণতায় সেটা খেয়াল করেনি, আমি বললাম, ‘হুমায়ূন, হ্যাঁ ফোন করেছিল, তোমাদের দুঃখের খবর শুনে, নাজমার এবং আমার সহানুভূতি জেনো।’ আমার স্ত্রীর মৃত্যু হয় ১৯৮৯-এর ১২ সেপ্টেম্বর। সেদিন দুপুরে অনেকেই এসেছিলেন আমাদের বাসায়, প্রথম যারা এসেছিলেন তাদের মধ্যে হুমায়ূন ছিল। দৃশ্যটা মনে আছে। চুপচাপ বসে ছিল।

কোরিয়াতে থাকার সময় হুমায়ূন তার নিজের পিতার মৃত্যুর ঘটনাটা বলেছিল। একান্তরে তিনি শহীদ হয়েছেন। বিস্তারিত বলে নি। বিস্তারিত সে বলত না। কথাপ্রসঙ্গে নয়, কথাসাহিত্যেও নয়, অল্পকথায় সজীব চিত্র আঁকার চরিত্রতাটা ছিল তার স্বভাবজাত। পিতার রাজনৈতিক বিশ্বাসের কথা বলেছে সে আমাকে, সে বলাতে গর্বের সুরটা যে ছিল না তা নয়। কিন্তু মোটেই ভাবাবেগ প্রকাশ করেনি। কঠিন দুঃখ ও ভয়ংকর দুঃসময়ে পড়েছিল সে। পিতার সে সন্তান, নিজের ছাত্রজীবন শেষ হয়নি। দুঃখটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তোলে নি, সে জন্য তা মর্মস্পর্শী ঠেকেছিল আমার কাছে, বিশেষভাবে।

সেই দুঃসময়ে যারা তার পাশে দাঁড়িয়েছেন সে প্রসঙ্গও এসেছে। একজনের কথা মনে পড়ে, হুমায়ূনের চেয়ে এক দু’বছরের উপরের ক্লাসে পড়ত, নাম আনিস সাবেত, একই আবাসিক হলে থাকত, খুব ভালো ছাত্র, হুমায়ূনকে স্নেহ করত। এমন ভালো মানুষ হুমায়ূন কম দেখেছে বলে জানিয়েছে। হুমায়ূনের প্রয়োজনের কথাটা তার জানা ছিল। এক সন্ধ্যায় অনেকগুলো নতুন শার্ট এনে হুমায়ূনের বিছানায় হইচই করে ছড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, ‘দেখ তো কী মুশকিল, এতগুলো জামা পাঠিয়েছে আমেরিকা থেকে, কিন্তু কোনোটাই আমার গায়ে ঠিক লাগছে না। দেখ তো তোমার গায়ে লাগে কীনা। বলে সবগুলো শার্ট রেখে আনিস সাবেত চলে গেছে। হুমায়ূন বলছে, ‘আমার তো জানতে কোনো অসুবিধা হয়নি যে জামাগুলো আমেরিকা থেকে আসে নি, ঢাকা থেকেই কেনা হয়েছে, আর প্রয়োজনের কথা মনে রাখো।’ কিন্তু ওই যে ছলনা ওইখানেই ছিল আনিস সাবেতের মহত্ত্ব। দুঃখ করে বলেছে হুমায়ূন, আনিস আমেরিকা গিয়েছিলেন, ফেরত আসতে পারেন নি, ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। তখন কে জানত যে

ওই একই রোগে হুমায়ুনকেও একদিন চলে যেতে হবে। এসব কথা যখন হচ্ছিল তখন আমারও কী জানার কোনো কারণ ছিল যে, এই আলোচনার কয়েক বছরের মধ্যেই আমার স্ত্রী নাজমাকেও চলে যেতে হবে ওই একই মরণব্যাধির আক্রমণে।

হুমায়ূনের সঙ্গে শেষ দেখা তার মৃত্যুর কয়েকসপ্তাহ আগে। চিকিৎসার ফাঁকে তখন সে ঢাকায়। ব্যবস্থা করে দিয়েছিল অন্যদিনের সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম। ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক জাহেদা আহমদ, অধ্যাপক আহমেদ কামাল ও আমি, এই তিনজন এক দিন দুপুরে অল্পক্ষণের জন্য তার ওখানে গিয়েছিলাম, ধানমন্ডিতে। অনেক বছর পরে দেখা। অথচ এক সময়ে দেখা সাক্ষাৎ ঘনঘন ঘটত, যখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল। দেখি কথাবার্তায় আগের মতোই আছে। ক্যান্সারের কথা বলল, সে রোগে কী কঠিন বেদনা, কেমোথেরাপিতে কী কষ্ট অল্প কথায় উল্লেখ করল সে। যখন বলছিল তখন মুখের দিকে আমি তাকাতে পারিনি, পাছে রোগের ব্যথায় কাতর হুমায়ূনের মুখে নাজমার মুখটি দেখতে হয়, সেও আমেরিকায় গিয়েছিল চিকিৎসার জন্য। ফিরে এসেছিল, কেমোথেরাপি নিয়েছিল, কিন্তু নিরাময় হতে পারেনি। হুমায়ূন নিরাময় হবে এটা আমরা আশা করেছিলাম, কেননা পঁচিশ বছরের কষ্টখানে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে, এবং তাঁর ক্ষেত্রে কেমোথেরাপিতে ভালো ফল পাওয়া গেছে, যা সে নিজেই বলেছিল আমাদেরকে। অপারেশন করা হবে, তখন ক্ষতস্থানগুলো ফেলে দেওয়া হবে, এরপর আর বিপদ ঘটবে না। নাজমার ক্ষেত্রে অপারেশন সম্ভব হয়নি, ক্যান্সার তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

ওই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারেই আমার পার হলে স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়া যে আবশ্যিক সে কথা বলল, আমেরিকার ওই হাসপাতালে না গেলে ক্যান্সার যে কেমন ব্যাপক ব্যাধি তা বুঝত না সেটা জানাল। বলল আমেরিকান রোগীরা একা একাই আসে, চিকিৎসা নিয়ে চলে যায়, আমরা যাই ঘটা করে, অনেককে নিয়ে, তবে এশীয় ধরনটাই তার কাছে ভালো লাগে বলে জানাল সে। ওই রোগের ভয়াবহ ধরনের অভিজ্ঞতা যে তাকে একটা দাতব্য ক্যান্সার হাসপাতাল তৈরির ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে তার কথাও উল্লেখ করল। সব মিলিয়ে খবর যেটা তা আশার।

বের হয়ে আসার সময় বারান্দায় দেখি সাদা-কালোতে একটা ছবি। মাজহারের স্ত্রী, যে আবার জাহেদা আহমদের ভগ্নিকন্যা, বলল ছবিটা হুমায়ূন ভাইয়ের আঁকা। হুমায়ূন বলল, দৃশ্যটা নেপালের। ছবি দেখে আরেকটি ছবির কথা মনে পড়ল আমার। ছোট্ট ছবি, একটি চায়ের কাপের। সেটিও হুমায়ূনেরই আঁকা। আমরা তখন চীনে; এক বিকেলে চা পানের ইচ্ছা হয়েছে; চা তো চীনারা পানির মতোই পান করে, কিন্তু পরিচারিকাকে কিছুতেই বোঝানো যাচ্ছিল না যে আমরা চায়ের প্রার্থী। হুমায়ূন তখন

চট করে একটা কাগজ নিয়ে পকেট থেকে কলম বের করে চায়ের একটি কাপ এঁকে দিল অতিদ্রুত বেগে। তারপর কয়েকটি টানে দেখিয়ে দিল কাপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। আমরা কাপ চাই না, চা চাই, এটা বুঝে পরিচারিকাটি দ্রুত বেরিয়ে গেলেন গরম চা সংগ্রহ করতে। ছবি আঁকায় হুমায়ূনের দক্ষতার একটা ইশারা সেদিন পাওয়া গিয়েছিল। পরে দেখি সে অসুস্থ অবস্থায় অনেকগুলো ছবি এঁকেছে। ওই প্রতিভাটিও তার ভেতর ছিল।

ছিল যে তার প্রমাণ তো আমরা তার গল্প, উপন্যাস, নাটক, চলচ্চিত্র সবখানেই দেখতে পাই। অল্প কথায়, ছোট ছোট সংলাপে, ইশারায় সে ছবি এঁকেছে। তার গল্পতে আমরা একের পর এক ছবি দেখতে পাই; সেটি একটি কারণ যে জন্য তার সৃষ্টিকর্ম এতটা জনপ্রিয় হয়েছে।

বৃষ্টি হুমায়ূনের খুব প্রিয় ছিল। যেদিন তার সঙ্গে ওই আমাদের শেষ দেখা সেদিনও হঠাৎ করেই এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। সেই বৃষ্টির কথা স্মরণ করতে গিয়ে এখন আরেক বৃষ্টির কথা মনে পড়ছে। হুমায়ূন তখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ নিয়েছে শহীদুল হকের হাউস টিউটরের। হুমায়ূন তখন ছোট্ট একটি মোটর গাড়ি কিনেছে, হাউস সেটা প্রভোস্টের বাসার সামনে। জায়গাটা নিচু। সেদিন সকালে ভারি বর্ষণ নেমেছিল, খেমেছে বিকেল পার হয়ে। হলের প্রভোস্ট সারাদিন বাসায় আটকা ছিলেন, বিকেল শেষে বৃষ্টি থামায় এসেছেন বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে। আমার দেশে এসেই বললেন, ‘আপনারা লেখকরা দেখি অন্যরকমের মানুষ। তার পরে কথাটা নিজেই দিলেন। ব্যাপারটা হুমায়ূনের ওই নতুন কেনা গাড়িটি নিয়েই। প্রভোস্ট দেখছেন বৃষ্টির পানি জমে গাড়িটাকে গ্রাস করে ফেলবে এমন ভাব। তিনি লোক পাঠিয়েছেন হুমায়ূনের কাছে দুঃসংবাদটি জানানোর জন্য। সেই বার্তাবাহক ফিরে এসে জানালেন যে গাড়ির মালিক বাসার জানালার পাশে বসে গাড়িটির দুর্দশা উপভোগ করছেন। আস্তে আস্তে পানি উপরের দিকে উঠছে আর গাড়িটা ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে এটা নাকি একটা বিরল দৃশ্য। ‘তা হলে বুঝুন! প্রভোস্ট ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন।

যা বুঝবার তা-ই বুঝলাম। নতুন করে জানা গেল যে হুমায়ূন নিয়মমাফিক নয়, সে ব্যতিক্রম। আর ওই যে সে গাড়ি কিনেছিল সেটাও আমার ধারণা, তার নিজের ব্যবহারের জন্য যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি গুলতেকিনের প্রয়োজনে। গুলতেকিন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী হয়ে এসেছে। আইএ পাস করার পর আর তার পড়াশোনা হয় নি, দীর্ঘদিন ঘর-সংসার করে এখন ভর্তি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। গুলতেকিনের আসা-যাওয়া এবং তিন মেয়েকে স্কুলে পৌঁছানো ও ফেরত নেওয়া এসব

কাজে গাড়িটি ভালো ভূমিকা পালন করেছে বলে আমার বিশ্বাস। গুলতেকিনের কথা মনে পড়ছে বিশেষ করে এই কারণেও যে হুমায়ূন তাকে আমাদের বিভাগে ভর্তি করতে খুবই উৎসাহী ছিল, এবং ভর্তি হয়েছে দেখে খুব আশ্বস্ত বোধ করেছিল। এর সাক্ষী আমি নিজে। ভর্তি হওয়ার পর গুলতেকিন এক বছর সরাসরি আমার টিউটরিয়াল গ্রুপের ছাত্রী ছিল। অতসব সাংসারিক দায়দায়িত্ব পালন করে যেভাবে সে তার পড়াশোনার কাজটি চালিয়ে যাচ্ছিল সে জন্য তাকে স্নেহ তো করতামই, মনে মনে বাহবাও দিতাম। অনেক বছর পরে গুলতেকিনকে সংবাদপত্রে দেখতে পেলাম ছবিতে, বিভিন্ন শোকানুষ্ঠানে, স্বভাবতই ভিন্ন এক অবস্থায়।

হুমায়ূনের সাহস ও আত্মপ্রত্যয় ছিল অনমনীয়। আমাকে একবার বলেছিল যে স্বাধীনতার পর ওরা ছয়জন সহপাঠী একসঙ্গে আমেরিকা গিয়েছিল উচ্চ শিক্ষার জন্য। তাদের ভেতর পাঁচজনই সেখানে রয়ে গেছে, কেবল সে-ই চলে এসেছে দেশে। ওরা পাঁচজন রয়ে গেল উচ্চ আয়ের প্রলোভনে, সে চলে এসেছে দেশেই- সে ওদের চেয়ে অধিক আয় করবে এই চ্যালেঞ্জটি রেখে দিয়ে। তা সে করেছে বৈকি। আর উপার্জনের দিক থেকে ওদের সবাইকেই ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু হুমায়ূন করতে ভালোবাসত বলেই হয়তো সে আসল কারণটা বলেনি বলে আমি অনুমান করি। আসল কারণটি ছিল লেখক হওয়ার অঙ্গীকার।

‘হুমায়ূন জাদু পছন্দ করত এবং জাদু জানত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র হিসেবে বিভাগীয় অনুষ্ঠানে তার প্রথম উপস্থিতি গল্পকার হিসেবে ঘটে নি। ঘটেছে জাদু-প্রদর্শক হিসেবে, যে কথা সে নিজেই স্মরণ করেছে। তার লেখায়, নাটকে, চলচ্চিত্রে একটা জাদুকরী শক্তির কার্যকারিতা আছে। হুমায়ূন গল্প তৈরি করতে এবং গল্প বলতে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। তার গল্পে অপ্রত্যাশিত থাকে, কিন্তু তা বাস্তবতাবর্জিত নয়, এবং তার জাদুকরী ক্ষমতা ছিল গল্পকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবার।

তার প্রথম উপন্যাস সে ছাত্রজীবনেই লিখেছে, যদিও সেটা প্রকাশিত হয়েছে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে। তারপরে অনেক বছর সে ব্যস্ত ছিল আমেরিকায়, অধ্যয়নে সেটা তার জন্য দরকার ছিল। কিন্তু সেখানে তার প্রাণ ছিল না। প্রাণ ছিল সাহিত্যে। তার টানেই দেশে ফেরা। এবং কিছুদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো চাকরিটি ছেড়ে পূর্ণসময় লেখক হয়ে যাওয়া।

চীন থেকে ফেরার পরে হুমায়ূনের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা এতটা কাছাকাছি চলে এসেছিল যে আমরা উভয়ই, একে অপরকে না জানিয়ে, পরস্পরকে নিজের লেখা বই উৎসর্গ করেছিলাম, প্রায় একই সময়। কিন্তু সে যখন বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চলে গেল

তারপরে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে খুবই কম। শেষ দেখার আগে একবার দেখা হয়েছিল ওর একটি চলচ্চিত্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে, কেবল সেটির কথাই মনে পড়ে।

এক সঙ্গে নির্বাচনে অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করেছি। সেটা ছিল সিনেটের জন্য ২৫ জন শিক্ষক-প্রতিনিধির নির্বাচন। তাতে হুমায়ূন দাঁড়িয়েছিল আমাদের সঙ্গে; আমাদের ২৫ জন প্রার্থীর ভেতর ২১ জন জিতেছেন, ৪ জন পারেননি। না-পারাদের ভেতর হুমায়ূন ছিল একজন।

অপ্রত্যাশিত এই ফলটা মেনে নেওয়া তার পক্ষে কঠিন হয়েছিল, কেননা ব্যর্থতা দেখতে সে অভ্যস্ত ছিল না। হুমায়ূন যে নির্বাচিত হলো না তার দুটি কারণের কথা ভাবতে পারি। একটি হচ্ছে তার বয়স, অপরটি তার জনপ্রিয়তা। প্রার্থীদের ভেতর সে-ই মনে হয় ছিল কনিষ্ঠতম। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে দেখা গেছে প্রবীণরাই ভালো করেন নবীনদের তুলনায়। দ্বিতীয় কারণ তার জনপ্রিয়তা। ততদিনে হুমায়ূন জনপ্রিয় লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, তার নাটক তখন টেলিভিশনে দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিচ্ছে। ভোটারদের কাছে দলেবলে আমাদের যেতে হতো, হুমায়ূনও যেত, শিক্ষকরা হুমায়ূনকে কাছে পেয়ে খুশি হতেন। কিন্তু হুমায়ূন ছিল লাজুক, কথা বলত কম, তাই তার পক্ষ থেকে শিক্ষকরা তেমন উষ্ণ সাড়া পেতেন না। যেমনটা তাঁরা আশা করতেন। ফলে ধারণা তৈরি হতো যে হুমায়ূন অসম্মিকায় ভরপুর। ভোটাররা হয়তো সে কারণে বিরূপ হয়েছিলেন।

নির্বাচনের ফল বের হওয়ার পরে আমরা মিলিত হয়েছিলাম। সেই সভাতে হুমায়ূনকে কিছু নিশ্প্রভ মনে হয়নি। বরঞ্চ ভোটারের খোঁজে ক্যাম্পাসের বাইরে ঘোরাঘুরির অভিজ্ঞতা সে সম্মেলনকে বর্ণনা করেছিল। অপরচিত রাস্তাঘাট, রাতে অন্ধকার, দরজায় টোকা দেওয়া এসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তার বিবৃতিতে প্রচুর হাস্যরসের সৃষ্টি করেছিল। ওইসব অভিযানে মুনতাসীর মামুন আর সে একসঙ্গে যেত, মামুনকে সাক্ষী মেনে সে গল্পের মতো করে অভিজ্ঞতার কথা বলেছিল, আমার মনে পড়ে। এর ভেতর সে শিক্ষকরা কেমন অবস্থায় থাকেন তাও সে বিলক্ষণ পর্যবেক্ষণ করেছে, এবং ফলাফল উল্লেখ করেছে ওর একটি ধারণা হয়েছিল এই রকমের যে, তুলনামূলকভাবে মহিলা শিক্ষকরা ভালো অবস্থায় আছেন পুরুষ শিক্ষকদের তুলনায়।

আমি পড়িনি, অন্যদের কাছে শুনলাম যে চিকিৎসারত অবস্থায় হুমায়ূন নিউইয়র্ক থেকে সংবাদপত্রে পাঠানো তার লেখাগুলোর একটিতে এই নির্বাচনের কথা উল্লেখ করে বলেছে যে এতে অংশগ্রহণটা ছিল তার জন্য মস্তবড় রকমের একটি ভুল। আর এর জন্য সে দায়ী করেছে প্রয়াত অধ্যাপক আহমদ শরীফ এবং আমাকে; আমরাই নাকি তাকে এই ভ্রান্ত পদক্ষেপ নিতে পরামর্শ দিয়েছিলাম। মনে হয় দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন থাকার এবং রোগ ভোগের শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার দরুন হুমায়ূন ঘটনার প্রেক্ষিতটা

যথার্থরূপে লিখতে পারেনি। আমরা ছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে এবং স্বভাবতই তরুণ শিক্ষক হুমায়ূনও তাতে যোগ দিয়েছিল। ওটি ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল না। ছিল স্রোতের টান। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের জন্য সংগ্রামটা দীর্ঘদিনের; স্বায়ত্তশাসন আমরা পেতামও না, বাংলাদেশ যদি স্বাধীন না হতো। কিন্তু ওই অধিকার রক্ষা করাটা সহজ ছিল না। আমরা নির্বাচনে দাঁড়ালাম আমাদের যে প্রতিপক্ষ-রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিতদেরকে সমর্থন জানানোর দিকে ঝুঁকে পড়েছিল তাদের বিরুদ্ধে। ব্যাপারটি পদলাভের ছিল না, ছিল মতাদর্শগত অবস্থানটাকে দৃঢ় করবার। এ কাজে হুমায়ূন যোগ দেবে এটাই ছিল স্বাভাবিক এবং সেটাই সে করেছিল।

হুমায়ূন যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল তখন প্রায়ই তার সঙ্গে দেখা হতো। চলে যাওয়ার পর বিচ্ছেদ ঘটেছে, দেখা হয়েছে খুব কম।

কিন্তু হুমায়ূন আছে। এবং থাকবে। সে আমাদের স্মৃতিতে আছে, খুবই উজ্জ্বলভাবে আছে তার নিজের সৃষ্টির ভেতরে।

হুমায়ূন জাদু পছন্দ করত এবং জাদু জানত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র হিসেবে বিভাগীয় অনুষ্ঠানে তার প্রথম উপস্থিতি গল্পকথার হিসেবে ঘটেনি। ঘটেছে জাদু প্রদর্শক হিসেবে, যে কথা সে নিজেই স্মরণ করেছে। তার লেখায়, নাটকে, চলচ্চিত্রে একটা জাদুকরী শক্তির কার্যকারিতা আছে। হুমায়ূন গল্প। তৈরি করতে এবং গল্প বলতে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। তার গল্পে অপ্রত্যাশিত থাকে, কিন্তু তা বাস্তবতাবর্জিত নয়, এবং তার জাদুকরী ক্ষমতা ছিল গল্পকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবার। অল্প কথায় সে অনেক কথা বলে নিত। বর্ণনার চাইতে সংলাপে সে দক্ষ। এবং সেই সংলাপে তীক্ষ্ণ কৌতুক ও বাগ্‌চরিত্র থাকে। আর থাকে ছবি। আড়ম্বরহীনভাবে সে ছবি আঁকতে জানে। ছবির পর ছবি আঁকে, পাঠক ও দর্শক অভিভূত হয়।

হুমায়ূন বিজ্ঞানের ছাত্র। তার লেখায় বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ শক্তি দেখি। কিন্তু সঙ্গে থাকে কল্পনার অসাধারণ শক্তি। সে কল্পনা করে এবং তার কল্পনার কথা অন্যদেরকে জানানোতে আনন্দ পায়। তার প্রথম দিককার একটি উপন্যাস 'ফেরা', সেটি নিয়ে ছোট একটি আলোচনা লিখেছিলাম আমি সেই ১৯৮৪ সালে, 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকাটিতে। পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল আমার ওপর; পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যাতে সমালোচনাটি ছিল। উপন্যাসটির পটভূমি গ্রামের। বিস্তৃত বর্ণনা দেয়নি, কিন্তু অল্পকথায় হুমায়ূন তাতে গ্রামের জীবনে প্রবহমান টানাপোড়েন সুন্দরভাবে তুলে ধরেছিল। সে বিষয়ে আমার মন্তব্য ছিল। হুমায়ূন পড়ে খুশি হয়েছে। কিন্তু চমকে দিয়েছে আরেকটা কথা বলে। বলেছে সে মামলা করবে। আমি বলেছি হুমায়ূন গ্রামকে চেনে, অন্য একজন নাকি বলেছেন গ্রাম বিষয়ে সে অজ্ঞ। এখন কোনটা সত্য, এটা মীমাংসা করার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া তো উপায় নেই। কথাটা সে হুমায়ূন আজাদকে

বলেছিল, দুজনের তখন খুবই বন্ধুত্ব; এবং হুমায়ূন আজাদ সেটা আমাকে জানিয়েছে হুমায়ূন আহমেদ এবং আরও কয়েকজনের সামনে। আমরা সবাই হেসেছি। হুমায়ূন আহমেদও হেসেছে হালকা করে। কিন্তু ওই বৈশিষ্ট্যটা তো ছিল তার স্বভাবজাত, চমকে দিতে পারত, এবং এসব চিন্তা নিয়ে আসতে অন্যরা যা ভাবতেও পারত না।

জাদুকরী ক্ষমতায় সে বাংলাদেশের মানুষকে চমকে দিয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর সর্বক্ষেত্রেই একটা চাহিদা ও শূন্যতা দেখা দিয়েছিল। পাঠক চাইছিল নতুন ধরনের লেখা, নাটক ও চলচ্চিত্রে হুমায়ূন চাহিদা চমৎকারভাবে মিটিয়েছে, শূন্যতার অনেকটা ভরাট করে দিয়েছে। বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম যা চাইছিল হুমায়ূন তার সরবরাহে ছিল অতুলনীয়। সে পাঠক টেনে এনেছে, পাঠক তৈরি করেছে। কিন্তু তার পাঠক তারই পাঠক, হুমায়ূন যে কথাটা বলেছে। এ পাঠক তার নিজের হাতেই তৈরি। সব বড় লেখকই এই কাজটা করেন। নিজের পাঠক নিজেই তৈরি করে নেন। এবং সেখানেই একজন লেখকের সবচেয়ে বড় ও প্রাথমিক পরীক্ষাটা ঘটে। হুমায়ূন এক্ষেত্রে অসামান্যরূপে সফল। অন্য লেখকদের জন্য হুমায়ূন একটি চ্যালেঞ্জ রেখে গেছে, নিজস্ব পাঠক তৈরি করে নেওয়ার। বলা বাহুল্য চাহিদা ও শূন্যতা

রাজনীতির বেলাতেও তৈরি হয়েছিল, সেটা এখনো আছে, নতুন নেতারা সেখানে এখনো আসেননি।

হুমায়ূনের সঙ্গে শেষ সাক্ষাতের উল্লেখ করেছি। সেটা দিয়েই শেষ করি। আমরা কেউ ভাবিনি যে হুমায়ূন অত দ্রুত চলে যাবে। তার ভেতর শক্তি থাকবার কথা, নিশ্চয়ই যন্ত্রণাও ছিল। কিন্তু বাইরে থেকে বুঝবার উপায় ছিল না। তার মায়ের সঙ্গেও অল্পক্ষণের জন্য দেখা হয়েছিল। হুমায়ূন আমার পরিচয়টা জানাল এভাবে যে আমি কঠিন কঠিন বিষয় নিয়ে লিখি। বলল, ‘ওসব আপনি বুঝতে পারবেন না আম্মা। তবে ইনি পায়ের কথাও লিখেছেন’। বুঝলাম আমার সেই যে দুটো বই সে একদা পড়েছিল— ‘শরৎচন্দ্র ও সামন্তবাদ’ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের ‘জমিদার ও কৃষক-যাতে পায়ের ব্যবহার নিয়ে কিছুটা মন্তব্য ছিল, সেটা তার মনে পড়েছে। হুমায়ূনের স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। দেখলাম সংকটকালেও তা অক্ষুণ্ণ আছে, যেমন রয়েছে সকলকে সজীব করে তোলার ক্ষমতা।

হুমায়ূনের মেধা ছিল অসামান্য, কর্মশক্তি অসাধারণ। কাজে তার বিরতি ছিল না। এত অল্প সময়ে এমন বিপুল সৃষ্টি সম্ভার ক’জন রেখে যেতে পেরেছেন? শেষ সাক্ষাতেও মনে হয়েছিল সে আরও অনেক কাজ করবে। সে-অগ্রগমনটা থেমে গেল। সান্ত্বনা এই যে, যা সে রেখে গেছে তার মূল্য কম নয়, অনেক। তাকে ভুলবার কোনো উপায়ই নেই।

-সিরাজুল ইসলাম চৌধারী

গল্পবলিয়ে হুমায়ূন আহমেদ

অকালে লোকান্তরিত অনন্যসাধারণ কথাসিঙ্গী হুমায়ূন আহমেদ সম্পর্কে আমি অল্প কয়েকটা কথা বলার অধিকার বোধ করছি। এই অধিকার তাঁর সঙ্গে আমার একটি বিশেষ সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত। সম্পর্কটি হল কোনো সম্পর্ক না থাকার সম্পর্ক। তাঁর সঙ্গে কখনো আমার দেখা হয়নি, হয়নি ফোনে কথাও কোনোদিন। এটা সম্পূর্ণই আমার অজ্ঞাতবাসপ্রসূত, অন্য কোনো কারণজনিত নয়। আমাদের সম্পর্কটি তাই একান্তই অ্যাকাডেমিক। আমার মূল্যায়নে একরপ্তি মূল্য বর্তালেও তা বর্তাবে কেবল এ কারণে। কথাটা একটু খুলে বলছি।

এই স্মরণ-সংখ্যায় কোনো অপ্রিয় সত্য উচ্চারণ নয় জেনেও পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে আমাকে উচ্চারণ করতে হচ্ছে যে বহুল আলোচিত রবীন্দ্র-দূষণের মতো 'হুমায়ূন-দূষণেরও একটা গুঞ্জন 'বোদ্ধামহলে' বহুদিন ধরেই চলেছে। এ বিষয়ে ফিসফিস শুনেই আমার মনে পড়ে যায় 'প্রবাসী' মাসিকের রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিধার্য মন্তব্যটি : 'বঙ্গদেশে রবিবাবুকে তুচ্ছজ্ঞান না করিলে বিজ্ঞ হওয়া যায় না।' শতবর্ষ পূর্বের কথাটা ধার করে বলা যায় : 'বাংলাদেশে হুমায়ূন আহমেদকে তুচ্ছজ্ঞান না করিলে বিজ্ঞ হওয়া যায় না'।

সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৭১ সালে আয়োজিত তাঁর জীবৎকালের বৃহত্তম জন্মজয়ন্তি অনুষ্ঠানটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিভাষণে 'রবীন্দ্র-দূষণের' ধারণাটি বর্ণনা করেছিলেন এইভাবে : 'এমন শ্রমবরত, এমন অকরণ, এমন অপ্রতিহত অসম্মাননা আমার মতো আর কোনো সাহিত্যিককেই সহিতে হয় নি।'

পরিণত বয়সে যখন তিনি দেশবরেণ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী তখনও তাঁকে অত্যন্ত অশ্রদ্ধার সঙ্গে লাগাতার হয় করার কারণে খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কবি এবং সে ক্ষোভ অব্যক্তও রাখেননি। প্রেসিডেন্সি কলেজের রবীন্দ্র পরিষদের ১৩ ডিসেম্বর ১৯২৭ সালের সভায় কবি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন :

... দেশের লোক কাছের লোক— তাঁদের সম্বন্ধে আমার ভয়ের কথাটা এই যে, তাঁরা আমাকে অনেকখানি দেখে থাকেন, সমগ্রকে সার্থককে দেখা তাঁদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। ... নানা লোকের ব্যক্তিগত রুচি, অভিরুচি ও রাগ-দ্বেষ্টার ধূলিনিবিড় আকাশে আমি দৃশ্যমান। যে দূরত্ব দৃশ্যতার অনাবশ্যক আতিশয্য সরিয়ে দিয়ে দৃষ্টিবিষয়ের সত্যকে স্পষ্ট করে তোলে দেশের লোকের চোখের সামনে সেই দূরত্ব দৃশ্যতার অনাবশ্যক আতিশয্য সরিয়ে দিয়ে দৃষ্টি- বিষয়ের সত্যকে স্পষ্ট করে

তোলে দেশের লোকের চোখের সামনে সেই দূরত্ব দুর্লভ। মুক্ত কালের আকাশের মধ্যে সম্বরণশীল যে সত্যকে দেখা আবশ্যিক, নিকটের লোক সেই সত্যকে প্রায়ই একান্ত বর্তমান কালের আলপিন দিয়ে রুদ্ধ করে ধরে তার পাখার পরিধির পরিমাণ দেখে, কিন্তু ওড়ার মধ্যে সেই পাখার সম্পূর্ণ ও যথার্থ পরিচয় দেখে না।...

হুমায়ূন আহমেদের লেখালেখি সম্পর্কে তাঁর যারপরনাই প্রিয় ও পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্ধৃত মন্তব্যটি একান্তই লাগসই বলে মনে করি। মন্তব্যে ব্যাখ্যাত 'সেই সত্যকে' আমি দেখতে পেয়েছি তার নিকটের লোক বা দূরের লোকও ছিলামনা বলে। দূরের লোক বলতে বোঝাচ্ছি তাঁদের- যারা তাঁর লেখা অনুধ্যান সহকারে পাঠ না করে মন্তব্য করেন।

আমি তাঁর নিম্নবর্ণিত বইগুলো পড়ে এবং নাটক ও চলচ্চিত্রগুলো দেখে মন্তব্য করছি যে হুমায়ূন আহমেদ ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী আলোচনাকালে রবীন্দ্রনাথ যা অতীব প্রশংসার সঙ্গে লিখেছিলেন, তা ধার করে আমিও লিখতে চাই যে হুমায়ূন আহমেদের উদ্ভাস কল্পনাশক্তি আর দারুণ রসবোধ তাঁর সৃজনমাত্রকেই সমৃদ্ধ করছে। তাঁর তাবৎ রচনার প্রসাদগুণ অত্যধিক বড়মাপের স্রষ্টাকে উদ্ঘাপিত কথাসাহিত্যিকের রচনায়ও পাই না। 'মুক্ত কালের আকাশের মধ্যে সম্বরণশীল যে সত্যকে দেখা আবশ্যিক, সে সত্যকে এখন থেকে হুমায়ূন আহমেদের মনোযোগী পাঠক অবশ্যই দেখতে পাবেন বলে আমি আশা করি।

ছোটগল্প : চোখ, অচিন বৃক্ষ, নিশীথাবা, জীবনযাপন, খাদক, ছায়াসঙ্গী, ভয়, সে, আয়না, রহস্য, জলিল সাহেবের শিউশন, যন্ত্র, অপেক্ষা সৌরভ।

উপন্যাস : নন্দিত নরকে, শঙ্খনীল কারাগার, অচিনপুর, যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ, মেঘের ওপর বাড়ি, মধ্যাহ্ন, আমি এবং আমরা, চাঁদের আলোয় কয়েকজন যুবক, নি, আমি এবং কয়েকটি প্রজাপতি, নক্ষত্রের রাত, লীলাবতী, বাদশাহ নামদার।

নাটক : এইসব দিন রাত্রি, বহুব্রীহি, কোথাও কেউ নেই, অয়োময়।

চরিত্রাবলি : ময়ূরাক্ষী, দরজার ওপাশে, পারাপার, হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম, হিমুর মধ্যদুপুর, আজ হিমুর বিয়ে (হিমু)।

আমিই মিসির আলি, দেবী, বৃহন্নলা, মিসির আলির চশমা, যখন নামিবে আঁধার, কহেন কবি কালিদাস (মিসির আলি)।

সায়েন্স ফিকশন। তোমাদের জন্য ভালোবাসা, ইরিনা, শূন্য, নিউটনের ভুল সূত্র।

চলচ্চিত্র : আগুনের পরশমণি, শ্রাবণ মেঘের দিন, শ্যামল ছায়া।

সাহিত্যের জগতে সকলেই একমত যে হুমায়ূন আহমেদ গল্পের জাদুকর। তাঁর গল্প শুনতেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সর্বশ্রেণির পাঠক। ডক্টর ইউনুসের মন্তব্যও প্রকারান্তরে একই কথা বলতে চেয়েছে— হুমায়ূন আহমেদ কেমন করে যেন সকল মানুষের মনের মধ্যে ঢুকে পড়েন। আসলে কেমন করে নয়, ঢুকে পড়েন গল্প বলতে বলতেই। কারণ তিনি জানেন, গল্প শোনা মানুষের চিরন্তন অভ্যাস। হুমায়ূন গল্প মুখে বলেন না, লিখে বলেন। মানুষকেও তাঁর গল্প পড়ে শুনতে হয়। তাই তাঁর লেখা পড়তে ভিড় জমান পাঠক।

প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন, এ যুগে গল্প পড়বার—

“এপিডেমিক থেকে মুক্ত শুধু নিরক্ষর লোক— যেমন বেরি-বেরি থেকে মুক্ত শুধু নিরন্ন লোক।

কিন্তু একটু চোখ চেয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি সকল যুগেই মানুষের সর্বপ্রধান মানসিক আহার হচ্ছে গল্প। পৃথিবীর অন্যঅন্য ভূ-ভাগের কথা ছেড়ে দিয়ে একমাত্র ভারতবর্ষের অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যায়, সে অতীত গল্পপ্রাণ। এ দেশে পুরাকালে যত গল্প বলা

হয়েছে ও লেখা হয়েছে, অন্য কুত্রাপি তাই হুলনা নেই। আমরা ধর্মপ্রাণ জাতি বলে বিশ্বে পরিচিত। কিন্তু যুগ যুগ ধরে আমাদের ধর্মের বাহন হয়েছে, মুখ্যত গল্প। রামায়ণ, মহাভারত বাদ দিলে হিন্দুধর্মের পনেরো আনা বাদ পড়ে যায়, আর জাতক বাদ দিলে বৌদ্ধধর্ম দর্শনের কচকচি মাত্র হয়ে ওঠে। রামায়ণ, মহাভারত, জাতক ছাড়াও এদেশে অসংখ্য গল্প আছে, যা সেকালে সাহিত্য বলেই গণ্য হ'ত। এ দেশের যত কাব্যনাটকের মূলে আছে গল্প। তা ছাড়া আখ্যায়িকা ও কথা নামে দুটি বিপুল সাহিত্য সেকালে ছিল, এবং একালেও তার কতক অংশের সাক্ষাৎ মেলে। আখ্যায়িকাই বলো আর কথাই বলো, ও দুই হচ্ছে একই বস্তু— শুধু নাম আলাদা। ইংরেজি লজিকের ভাষায় যাকে বলে genus এক species আলাদা।—

এর থেকে স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ভারতবর্ষের লৌকিক অলৌকিক সকল সাহিত্যের প্রাণ হচ্ছে কথা-সাহিত্য।

কথা-সাহিত্য এ দেশে বিলেত থেকে আমদানী-করা নূতন সাহিত্য নয়। বরং সত্য কথা এই যে, পুরাকালেও সাহিত্য ভারতবর্ষে রচিত হয়ে, তারপর দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। এককালে পঞ্চতন্ত্র ও জাতকের প্রচলন যুরোপের লোকসমাজে যে অতি বিস্তৃত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উপরন্তু বহু পণ্ডিতের মতে আরব্য উপন্যাসের জন্মভূমিও হচ্ছে ভারতবর্ষ।

আজ যে আমরা সকলেই গল্প শুনতে চাই, তার কারণ এ প্রবৃত্তি আমরা আমাদের পূর্বপুরুষের কাছে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি।” (সবুজ পত্র, দশম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা ৥ পৌষ, ১৩৩৩)।

আসলে মানুষের ইতিহাস যেদিন থেকে শুরু হয়েছে, তার গল্পও আরম্ভ হয়েছে সেদিন থেকে। শ্রমপর্বের অভিজ্ঞতা বর্ণনার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মকে অভিজ্ঞ করে তোলা এবং বিশ্রামপর্বে আনন্দ পরিবেশন করার দ্বৈত প্রেরণা থেকেই মনুষ্যজীবনে গল্পের আবির্ভাব ঘটেছে। (স্মরণ করুন : মানবজীবনের আদিতে দিনভর অ্যাডামের মাটি কোপানো ও ইভের কাপড় বানানোর শেষে সন্ধ্যার অবসরে সন্তানদের কাছে তাঁদের গল্প করার কথা)। পরিবেশ, জীবনযাত্রা এবং আনন্দলাভের প্রয়োজনে সব দেশের মানুষই মোটামুটি অভিন্ন ধারায় গল্প কল্পনা করতে অভ্যস্ত হয়েছে। প্রধান দুটি ধারা-নীতিশিক্ষা আর রূপকথার উপকরণও প্রায় একই রকম। সম্ভবত সকল গল্পের প্রথম নায়কও ছিল অভিন্ন- সূর্য। কারণ প্রাচীন মানুষকে সূর্য আলো দিয়ে নিরাপদ করতো, রোদ দিয়ে তার ফসল ফলাতো, ভেজ দিয়ে ফল পাকাতো, বরফ গলাতো, মাছ ভাসাতো এবং আরও অনেক উপকার করতো।

গল্প-সাহিত্যের ভাগ মোটামুটি তিনটি। Fable অথবা কথা, Anecdote বা আকর্ষণীয় ঘটনা এবং Tale কিংবা আশ্চর্য্যকথা। প্রথমটাতে ছোটগল্পের সংক্ষেপ, দ্বিতীয়টাতে গল্পের আমেজ আর তৃতীয়সেই উপন্যাসের আভাস। Fable বা কথা বহু পূর্বেই বিলুপ্ত। বিষ্ণুশর্মা বা কুশটীপের মতো প্রাণী-নির্ভর কিংবা মানব-আশ্রয়ী নীতিধর্মী ছোট ছোট গল্পের রেকর্ড আজ আর নেই। সে-বস্তু বলতে গেলে উনিশ শতকের রুশ সাহিত্যের গল্পের জাদুকর ইভান ক্রাইলভের (ivan Krilov) সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু টেল বা আখ্যায়িকা বা কাহিনী এবং অ্যানিকডোট বা কিস্সা কিংবা কোনো বিশেষ ঘটনার বৃত্তান্ত ছোটগল্পের ছদ্মবেশে এখনও বিদ্যমান। তাই এ-দুটি প্রকরণ সম্বন্ধে ধারণাটা স্পষ্ট রাখা দরকার। দরকার ইমায়ূন আহমেদের গল্পের প্রকৃতি এবং ধারাগুলো বোঝার জন্য।

‘আখ্যায়িকা অতি পুরাতন কথাসাহিত্য এবং তা একাই জমিয়ে রেখেছে জাতক, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎ-সাগর, দশকুমার-চরিত, শুকসপ্ততি, আরব্য উপন্যাস (আলিফ লায়লা), তার নবতর সংস্করণ পারস্য উপন্যাস (হাজার আফসানে), দেকামেরন এবং উপদেশাত্মক গল্পমালার বৃহত্তম ইয়োরোপীয় সংস্করণ পেস্তা রোমানোরাম (রোমানদের কার্যকলাপ) বা সংক্ষেপে পেস্তা, ক্যান্টারবেরি টেলস, গারগাঁতুয়া, পঁাতগ্রুয়েল। সংকলিত এসব আখ্যান গল্পরসে টাইটম্বুর এবং বৈচিত্র্যে জমজমাট। কিন্তু খণ্ডতার মধ্যে অখণ্ডের হৃদিস এরা দেয় না। মানুষের সহজাত গল্প বলার প্রেরণা থেকেই এদের

উদ্ভব। তাই সাধারণত কোনো ব্যঞ্জন্য নিহিত থাকে না এদের বুনটে, পাওয়া যায় না ইঙ্গিতধর্মী একমুখিতা বা অনন্য কোনো মহামুহূর্ত। পাওয়া যায় বরং ঘটনাবহুল, এমনকি দ্বন্দ্ব-সংঘাতময়, শিথিল-পৃথুল উপন্যাসেরই জৌলুস। বর্ণিত নেতিধর্মী এবং ইতিধর্মী, এইসব চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই আখ্যায়িকা ছোট হলেও ছোটগল্প হয়ে ওঠে না; ভেজাল হিসাবে ছোটগল্পের দলে ভিড়ে গেলেও সহজেই ধরা পড়ে যায়।

কিন্তু তেমন সহজে ধরা পড়ে না 'অ্যানিকডোট বা 'কথানক বা 'বৃত্তান্ত'-নামক ছদ্মবেশী ছোটগল্প। কারণ সে জন্মগতভাবে ছোটগল্পেরই সহোদর। দুই ভাইয়ের মধ্যে 'শর্ট স্টোরি' যেন কবি-স্বভাবের দার্শনিক আর 'অ্যানিকডোট' যেন ব্যবহারিক স্বভাবের সাংসারিক। 'ছোটগল্প গৃহী-সন্ধ্যাসীও হতে পারে, কিন্তু কথানক বা বৃত্তান্ত নিতান্তই গৃহী। এই গৃহীটিকে চেনার প্রথম উপায়টি হল তার দ্ব্যর্থহীন অন্তিম যতি। ওটি এমনই পূর্ণতা-সূচক যে এর পরে যেমন তার নিজের কোনো কথা থাকে না, তেমনি পাঠকেরও কোনো কথা জন্মায় না। কারণ ওটা এমন একটা 'ঘটিত' ঘটনা-যা পড়বার পরে একান্তভাবেই শেষ হয়ে যায়-'শেষ হয়ে হইল না শেষ' বলে মনে হয় না পাঠকের। ফলে 'শেষ' করার আকুলিবিকুলিতে তাঁর মনে নিজস্ব কোনো সৃষ্টি-প্রক্রিয়াও আনাগোনা করেনা। কারণ অ্যানিকডোট একটা 'ফিনিশড প্যোডাষ্ট', প্রতিপক্ষে ছোটগল্প যেন 'আন্ফিনিশড'।

অ্যানিকডোটের সমার্থক যুৎসই কোনো বাংলা প্রতিশব্দ আমি পাচ্ছি না। এর পরিভাষা হিসাবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্য ছোট গল্প'-শিরোনামক গ্রন্থের 'রূপতত্ত্ব-অনুশিরোনামক দ্বিতীয় অঙ্কেও ব্যবহার করেছেন "বৃত্তান্ত"। আমার মতে শব্দটিতে অ্যানিকডোটের অর্থের অপরিহার্য কিছু দিক বাদ পড়ে যায়। দেশী-বিদেশী সকল প্রামাণ্য শব্দকোষ একমত যে অ্যানিকডোটকে হতে হবে 'ছোট', 'মজাদার' বা 'আকর্ষণীয়', 'প্রকৃত কোনো ব্যক্তি কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনা সম্পর্কিত'। এসবের একটিকেও আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে না বৃত্তান্ত-শব্দটি। যেমন 'আব্রাহাম লিংকন সম্বন্ধে অনেক অ্যানিকডোট আছে', 'ওয়ার-হেরো আলেক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কিত অনেক অ্যানিকডোট জানে'। এই বাক্য-দুটি অ্যানিকডোট-শব্দটি দিয়ে যা বোঝাচ্ছে, 'বৃত্তান্ত'-শব্দটি দিয়ে তা বোঝানো যাবেনা; উল্টে বাক্যগুলির ভাবার্থে বিভ্রান্তিও ছড়াবে। বিভ্রান্তি না-ছড়িয়ে অনেকটাই বোঝানো যাবে বরং 'গল্প'-শব্দটি দিয়ে। যেমন লিংকন সম্বন্ধে অনেক 'গল্প' আছে, আলেক মহাযুদ্ধ সম্পর্কে অনেক 'গল্প' জানে। এজন্যেই গণসম্প্রচার সংস্থা 'ভয়েস অব অ্যামেরিকা মেজর 'স্টোরিজ' 'অব দ্য ডে' প্রচার করে। নিউজ কিংবা রিপোর্ট নয়, 'স্টোরি' তথা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আমি বলতে চাই, ইঙ্গিতপূর্ণ এবং ব্যঞ্জন্যময় 'শর্ট স্টোরি'-কে আমরা যখন 'ছোট গল্প' বলছি, তখন ইঙ্গিতবিহীন-ব্যঞ্জন্যহীন 'অ্যানিকডোট'কে তো 'স্টোরি'বা 'গল্প'ই বলতে পারি। 'বৃত্তান্ত' তো ঠিক

কাহিনীও নয়— সংবাদ বা বিবরণ কিংবা প্রতিবেদন। অ্যানিকডোট কিন্তু সংবাদ নয়, গল্পই। অতএব আমার পরিভাষায় 'টেল' হল 'কাহিনী', 'ফেবল' বা কথার জায়গায় চলুক 'ছোটগল্প' আর 'অ্যানিকডোট'কে বলা হোক 'গল্প'। এই গল্প হল 'শেষ হয়ে হইল' না শেষ।

অ্যানিকডোট নিয়ে এই তুলকালামের কারণ : আমরা উপস্থিত উপজীব্য হুমায়ূন আহমেদের গল্পে, ছোটগল্পে, এমনকি উপন্যাসে তাঁর সমধিক কৃতিত্ব প্রত্যক্ষদৃষ্ট চরিত্রাবলির বা ঘটনাবলির সম্যক চিত্রণে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতীতির গল্পকথনে। তাঁর দেখা বা শোনা এইসব বাস্তবভিত্তিক চরিত্রাবলি এবং ঘটনাবলি অ্যানিকডোটধর্মী। [অ্যানিকডোটের সংজ্ঞা] short, usually amusing, story about some real person or event. (Oxford Advanced Learner's Dictionary)]

তবে কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদের কুশলী রূপায়ণে অনেক অ্যানিকডোটই যে-কোনো সমালোচকের বিবেচনায় সার্থক ছোটগল্পে উত্তীর্ণ। প্রমথ চৌধুরীর নিরিখে তো বটেই। তিনি বলেছেন :

“মাসিক সাহিত্যের প্রধান সম্বল হচ্ছে ছোটগল্প। এই ছোটগল্প কী ভাবে লেখা উচিত সে বিষয়েও আজকাল আলোচনা শুরু হয়েছে। এও আর একটি প্রমাণ যে, লেখবার বিষয়ের অভাববশতই লেখবার ক্ষমতার বিচারই আমাদের দায়ে পড়ে করতে হয়।

এ সম্বন্ধে আমার দুটি কথা বলবার আছে। আমার মতে ছোটগল্প প্রথমে গল্প হওয়া চাই তার পরে ছোট হওয়া চাই; এ ছাড়া আর-কিছুই হওয়া চাইনে।

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে 'গল্প' কাকে বলে, তার উত্তর 'লোকে যা শুনতে ভালোবাসে। আর যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন 'ছোটো' কাকে বলে, তার উত্তর 'যা বড়ো নয়।

এর উত্তরে পাঠক আপত্তি করতে পারেন যে ডেফিনিশনটি তেমন পরিষ্কার হল না। এ স্থলে আমি ছোটগল্পের তত্ত্ব নির্ণয় করবার চেষ্টা করছি। এবং আশা করি সকলে মনে রাখবেন যে তত্ত্বকথা এর চাইতে আর পরিষ্কার হয় না। এর জন্য দুঃখ করবারও কোনো কারণ নেই; কেননা, সাহিত্যের তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে সাহিত্য রচনা করা যায় না। আগে আসে বস্তু, তার পরে তার তত্ত্ব। শেষটি না থাকলেও চলে কিন্তু প্রথমটি না থাকলে সাহিত্য জগত শূন্য হয়ে যায়।”

ছোটগল্প বিষয়ক আলোচনায় প্রমথ চৌধুরী অন্যত্র আরেকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন : ‘ট্র্যাজি-কমেডিই হচ্ছে ছোটগল্পের প্রাণ’। (ছোট গল্প, সবুজ পত্র,

পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা)। চৌধুরী মশায়ের এ মন্তব্য হুমায়ূন আহমেদকে মহান ছোটগল্পকারের মর্যাদায় আসীন করে। কেননা তাঁর ছোটগল্প যুগপৎ হাস্যরস ও করুণরসে মণ্ডিত।

গল্প-উপন্যাস-নাটক-সিনেমা-কলাম সব কিছুতেই দেখা মিলবে গল্পবলিয়ে হুমায়ূনের। এখানে আমি উদাহরণ দেবো তাঁর যে লেখা থেকে সেটা তাঁর প্রয়াণের এক সপ্তাহ পরে (২৬ জুলাই ২০১২) স্মরণিক স্তম্ভস্বরূপ সংকলিত হয়েছে দৈনিক প্রথম আলোর উপসম্পাদকীয় কলামে— ‘যোগাযোগমন্ত্রীর পদত্যাগ’—শিরোনামে।

কলামটির আরম্ভ এ রকম :

[এখানে যে যোগাযোগমন্ত্রীর গল্প বলা হচ্ছে তিনি আওয়ামী লীগ, বিএনপি বা এরশাদ আমলের মন্ত্রী নন। অন্য কোনো আমলের। তবে আনন্দের বিষয়, সব আমলের জিনিস একই।—লেখক]

যোগাযোগমন্ত্রী সালাহউদ্দিন খান ভুলু সাহেবের দপ্তরে কিছুক্ষণ ঘুমানোর অভ্যাস। মন্ত্রীর কঠিন দায়িত্ব পালনের সময়ও তিনি এই অভ্যাস বহাল রেখেছেন। একটু উনিশ-বিশ অবশ্য হচ্ছে ; আগে ঘুমানোর সময় একলা



দিল্লিতে তিন কণ্যার সাথে দাদা ভাই ১৯৮৩ সাল।

গায়ের ঘামাচি মেরে দিত, এখন সেটা সম্ভব হচ্ছে না। প্রায়ই ভাবেন, পলিটিক্যাল পিএসকে ঘামাচি মারতে বলবেন। সে আগ্রহ নিয়ে কাজটা করবে। একটাই ভয়, কোনো পত্রিকায় যদি নিউজ চলে যায়! পত্রিকাগুলো চলে গেছে দুইদুইদের দখলে। তারা সম্মানিত মন্ত্রীদেব ওপর টেলিস্কোপ ফিট করে রেখেছে। আরাম করে ১০ মিনিট ঘুমানোর উপায়ও নেই।

সালাহউদ্দিন খান ভুলু দিবানিদ্রা সেরে উঠেছেন। মন-মেজাজ এখনো খাতস্থ হয়নি। তিনি কয়েকবার হাই তুললেন। এই সময় তাঁর পিএস (সরকারি) ঢুকলেন। বিনীত গলায় বললেন, স্যারের ঘুম ভালো হয়েছে?

মন্ত্রী বললেন, আমি আপনাকে অনেকবার বলেছি, দুপুরে আমি ঘুমাই না। চোখ বন্ধ করে এক ধরনের যোগব্যায়াম করি। 'শবাসন' এই ব্যায়ামের নাম। এতে টেনশন কমে।

পিএস বললেন, স্যার, সরি। আমি যোগব্যায়ামের ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। আপনার নাক ডাকার শব্দে বিভ্রান্ত হয়েছি।

আর বিভ্রান্ত হবেন না। নাক ডাকাব শব্দ দ্রুত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ফেলা যোগব্যায়ামেরই অংশ। আমার নাকে পলিপ আছে বলে দ্রুত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় নাক ডাকার মতো শব্দ হয়। এখন ক্লিয়ার হয়েছে?

অবশ্যই, স্যার।

কোনো কাজে এসেছেন?

একটা রোড অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। মাইক্রোবাস ভেঙে গুঁড়া হয়ে গেছে। পাঁচজন মারা গেছে।

অ্যাকসিডেন্ট হলে মানুষ মারা যাবে, এটা নতুন কী? এই তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আপনি আমার কাছে এসেছেন?

মাইক্রোবাস দুর্ঘটনায় কিছু বিখ্যাত মানুষ মারা গেছেন। যাঁরা আহত, তাঁদের দেখতে যাওয়া উচিত।

বিখ্যাত মানুষ কে মারা গেল?

পিএস বিখ্যাত মানুষদের তালিকা বললেন।

মন্ত্রী বিরক্ত গলায় বললেন, এরা বিখ্যাত হলো কবে? আমি তো নামও শুনি নাই। মিডিয়া এদের বিখ্যাত বানিয়েছে। সব মিডিয়ার কারসাজি। দেশটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে মিডিয়া।

যথার্থ বলেছেন। তবে মিডিয়াকে অগ্রাহ্য করা ঠিক হবে না।



দাদা ভাইয়ের কোলে আমি ১৯৫৬ সালে

আমাদের এই মুড়ি মন্ত্রী নানা ধরনের কথাবার্তা বলা শুরু করলেন। মিডিয়া তাকে নিয়ে কিছু কাজকর্ম করল। মন্ত্রী যখন গাড়ি নিয়ে রাস্তার বেহাল দশা দেখতে গেলেন, তখন বদগুলো তাঁর হাসি মুখের ছবি ছাপাল। রাস্তায় বিশাল এক গর্তের সামনে দাড়িয়ে তিনি হাসছেন— এ রকম ছবি। এই অপরাধ ক্ষমা করা যায়, কিন্তু তাঁর পদত্যাগ চেয়ে প্রতিবেদন ক্ষমা করা যায় না। বাংলাদেশের ইতিহাসে কখনো কোনো মন্ত্রী পদত্যাগ করেছে? মন্ত্রীরা হলেন কচ্ছপ। কচ্ছপের মতো কামড় দিয়ে তাঁরা মন্ত্রিত্ব ধরে রাখবেন। এটাই নিয়ম।

মন্ত্রী তাঁর রাজনৈতিক পরামর্শে কিছু জটিল পদক্ষেপ নিয়ে নিলেন। একজন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো। একটা ছোট্ট সমস্যা তাতে হলো; দেখা গেল, সবাই দুর্নীতিবাজ। রসুনের বোঁটা অবস্থা। একজনকে শাস্তি দিলে বাকিরা খেপে যাবে। ওদের গায়ে হাত দেওয়া যাবে না। কাজেই অনেক ঝামেলা করে একজন সৎ কর্মচারী খুঁজে তাঁকে বরখাস্ত করা হলো।

মন্ত্রী মহোদয় সব পত্রিকায় তাঁর একটি ছবি পাঠালেন। সেই ছবিতে তিনি কোদাল হাতে ভাঙা রাস্তার পাশে দাঁড়ালেন। নিচে লেখা, 'মন্ত্রী মহোদয় নিজেই রাস্তা মেরামতে নেমে পড়েছেন।

কোনো পত্রিকা এই ছবি ছাপাল না, উল্টো এক বদ পত্রিকা এই ছবি নিয়ে কার্টুন বানিয়ে ছাপিয়ে ফেলল। কার্টুনে দেখা যাচ্ছে, রাক্ষস টাইপ চেহারার এক লোক খালি গায়ে খাকি হাফপ্যান্ট পরে বেলচা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ের এবং পায়ের বড় বড় লোম দেখা যাচ্ছে। কার্টুনের নিচে লেখা, 'যোগাযোগমন্ত্রী বললেন, আমি একাই ৩৫০ কিলোমিটার রাস্তা মেরামত করব, ইনশাআল্লাহ।

এক সকালবেলার কথা। মন্ত্রীর স্ত্রী সালমা খান (বিশিষ্ট সমাজসেবী, পরিবেশ রক্ষাকর্মী, বিপন্ন হনুমান বাঁচাও আন্দোলনের সভানেত্রী) তাঁর স্বামীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, আমাকে না জিজ্ঞাসিয়ে, আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে তুমি কী করে এই কাজ করলে?

মন্ত্রী বললেন, কী কাজ করলাম?

পদত্যাগ করেছে, আমাকে না জানিয়ে।

পদত্যাগ করব কোন দুঃখে?

পত্রিকায় নিউজ এসেছে। এই দেখো।

মন্ত্রী মহোদয় হতভম্ব হয়ে পড়লেন, 'যোগাযোগমন্ত্রীর পদত্যাগ। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, মন্ত্রী মহোদয় স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন।

হতভম্ব মন্ত্রী তাঁর পিএসকে টেলিফোন করলেন। অনেকবার রিং হলো, পিএস ধরলেন না। তিনিও নিউজ পড়েছেন। এখন যে মন্ত্রী নন তাঁর টেলিফোন কেন ধরবেন! আমজনতার টেলিফোন ধরার কিছু নেই। মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক পিএসকে টেলিফোন করলেন। পিএস তাঁর কোনো কথা না শুনেই বললেন, পদত্যাগ করে ভালো করেছেন। দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। আচ্ছা রাখি।

মন্ত্রী লাইন কেটে দেওয়ার পর অনেকবার চেষ্টা করলেন, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব টেলিফোন ধরলেন না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি লক্ষ্য করলেন, পত্রিকার এই বানোয়াট খবর সবাই বিশ্বাস করে বসে আছে। তাঁর পিরাপত্তায় নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীর সাব-ইন্সপেক্টর সিগারেট ফুঁকছিল, তাঁকে দেখে সিগারেট ফেলে না দিয়ে শুধু পেছনে আড়াল করল।

মন্ত্রী মহোদয় প্রধানমন্ত্রীকে ধরার অনেক চেষ্টা করলেন। তাঁর চেষ্টা দেখতে পেয়ে রবার্ট ব্রুসও লজ্জা পেত। একসময় চেষ্টা সফল হলো। প্রধানমন্ত্রী টেলিফোন ধরলেন এবং বললেন, আপনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে একটি সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন। আপনাকে অভিনন্দন। মন্ত্রী না থেকেও জনগণের সেবা করা যায়। জনগণের সেবা করুন।

প্রধানমন্ত্রী টেলিফোন রেখে দিলেন।

[গল্পের মোরাল : মন্ত্রীদের বুকে এবং পায়ে লোম না থাকা বাঞ্ছনীয়।]

প্রতিভাবান গল্পবলিয়ার চমৎকার গল্পকথনের অন্তর্ভুক্তি যোজিত পাদটীকাটি প্রশংসিত হতে পারে। এক. এই লেখক অসংকোচে 'মরালকে' 'মোরাল' লিখতে পারেন। দুই. সুস্ব রসের লেখাটির সঙ্গে অহেতুক যুক্ত হয়েছে স্থূলরস। বিষয়বস্তু-বিশেষজ্ঞদের এধরনের প্রশ্নের জবাব চেয়েছেন হুমায়ূন আহমেদের অনেক সাক্ষাৎকারী। তারা আরেকটু ব্যাখ্যা করে বলেছেন তাত্ত্বিকদের মতে এধরনের অযত্নে তাঁর লেখায় নান্দনিকতা ক্ষুণ্ণ হয়, তার পরিবেশিত রস আরেকটু গাঢ় হওয়া বাঞ্ছনীয়, বা সার্বিকভাবে তার লঘুপাকের কল্পসাহিত্য আরেকটু কড়াপাকের হওয়া কাম্য। এসব প্রশ্নে সাক্ষাৎকারে হুমায়ূনের জবাব হতো তাঁর স্বভাবসুলভ-এটাই আমার স্বাভাবিক পাক, আমি জানি আমি কী করছি। সুতরাং আমি চলবো আমার পথে, তাত্ত্বিকরা তাদের পথে চলতে পারেন।

প্রকারান্তরে হুমায়ূন আহমেদ প্রথম চৌধুরীর উপরে বর্ণিত কথাটাই বলেছেন :

'সাহিত্যের তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে সাহিত্য রচনা করা যায় না। আগে আসে বস্তু, তার পরে তার তত্ত্ব। শেষটি না থাকলেও চলে, কিন্তু প্রথমটি না থাকলে সাহিত্যজগত শূন্য হয়ে যায়।'

সাহিত্য স্রষ্টা তাঁর সৃষ্টির পালা শেষ করে অতীতকালে চলে গেছেন। এবার তত্ত্বযোদ্ধা তাঁর ব্যাখ্যা করে যাবেন অনন্তকাল।

আবদুশ শাকুর

যাকে হারালাম



আমেরিকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় হুমায়ূন আহমেদকে দেখতে যান প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা

হুমায়ূনের সঙ্গে প্রথম দেখা করে কোথায় হয়েছিল আজ আর তা মনে নেই। তবে আশির দশকের শুরু বা সত্তর দশকের শেষ দিকে সম্ভবত। জাতীয় চলচ্চিত্রের পুরস্কারের জন্য নির্বাচন কমিটির আমরা ক'জন। সবাই বলতে গেলে সিনেমার সঙ্গে সংযুক্ত মানুষ। বাইরে থেকে এসেছে বাংলা একাডেমীর তখনকার মহাপরিচালক কবি আবু হেনা মোস্তফা কামাল, হুমায়ূন আহমেদ ও আমি। প্রতিদিন একটা করে ছবি দেখতে হতো একটানা এক মাস।

কাজ করতে গিয়ে দেখলাম নিজেদের অজান্তেই কেমন করে যেন একটি দল দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। আমাদের দিকে যেন আউট সাইডার, আউট সাইডার ইশারা ইঙ্গিত। সেটা আমরা খেয়াল করতাম এমন নয়। ছবি দেখতে দেখতে আবু হেনা একটু-আধটু বিভেদ বিষয় নিয়ে সবার মধ্যে মন্তব্য ঝাড়ত।

দলপ্রধান সৈয়দ আলী আহসান নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতেন। হুমায়ূন সম্পর্কে সবসময় বলতেন 'লারনেড ম্যান'।

হেনা সপ্তাহের চারদিনই অনুপস্থিত থাকে। বিরক্তিও প্রকাশ করত মাঝে মাঝে- এসব অখাদ্য রোজ রোজ গিলতে কেন যে আসি!

দেশীয় এই সময়ের ছবি, আইডিয়া তো কিছু পাওয়া যাচ্ছে।

হুমায়ূনের কথায় কখনো শোনা যেত এমনি মন্তব্য।

এব্যাপারে রাবেয়া আপার অভিজ্ঞতা বেশি। যিনি বিদেশি সিনেমা, এখনকার সিনেমার দর্শক প্রথম প্রহর থেকে।

আদি থেকে সব দেখেছি বলতে পারব না। তবে কোয়ালিটি সম্পর্কে বলতে পারব।

আমি আর হুমায়ূন এমনিতে স্বল্পভাষী। আমরা বসতামও পাশাপাশি। হেনা, আমি ও হুমায়ূন।

যেদিন হেনা আসত তিনজনের বেশ জমতো। ও না এলে আমি হুমায়ূনের সঙ্গে ছবি সম্পর্কে মতবিনিময় করতাম। মজার বিষয়, হুমায়ূনও মাঝে মাঝে আসত না।

আমি আবার কোনো ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ কাজে থাকতাম না। সপ্তাহে সব দিন যাওয়া চাই। দেখতে আনন্দের নয়, তার ভেতর থেকেই যেটুকু ভালোর সন্ধান। পরদিন ও এলে তা নিয়ে আলোচনা। হেনা হাসতে হাসতে বলত, সব দেখলে চোখ দুটো আর কাজে লাগাতে পারব না। আমার ভয়সে তোমরাই। একটাই তো মাস, দেখতে দেখতে চলে যাবে। আমি অবশিষ্ট আশা সত্ত্বেও দু'একদিন অনুপস্থিত থেকেছি। তখন এতে বাঁকা চোখদের জোর বেড়েছে।

আমরা তো নিরপেক্ষ। কোনো ছবির দিকে আঙুল তুলে বসে নেই।

তবু আপনারা এলে ঠিক বিচার পাচ্ছে ছবি। এ ব্যাপারে আমি কিছু নিশ্চিত থাকি।

সৈয়দ আলী আহসান হাসতে হাসতে। (সম্ভবত) অপরপক্ষের কান বাঁচিয়ে কথাটা বলতেন।

এক, দুই করে কেটে গেল একমাস। হুমায়ূন ও আমি শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতার' পক্ষে ছবি তৈরি, নায়ক-নায়িকার অভিনয় ভালো। অন্যান্য দিক দিয়ে খুব একটা এগুইনি আমরা। হেনা শেষের দিকে প্রায় নিয়মিত আসত। সেও আমাদের সঙ্গে একমত হলো।

কিন্তু ওপক্ষ থেকে বলা হলো, বেস্ট ছবি হবে শরৎচন্দ্রের 'শুভদা' এবং নায়ক-নায়িকা গোলাম মুস্তাফা ও আনোয়ারা।

আলী আহসান সাহেব দু'দলকেই সমর্থন করছেন। হেনা বলল, আপনারাই যান।

আমি বললাম, তুমি গেলে আর একটু জোরালো হতে পারত আমাদের যুক্তিগুলো। হেনা স্নান হেসে বলল, কেমন অপরাধবোধ কাজ করছে একটু, তাই...।

বাকি কথাটা শেষ করল হুমায়ূন, তাই যেতে চাইছেন না! ঠিক আছে। আমরাই যাই।

আমি বললাম, চলচ্চিত্রের সবকটা আমি দেখেছি। পরিণীতা এর মধ্যে অবশ্য শ্রেষ্ঠ। আমি সৈয়দ আলী আহসানকেও তেমনি বললাম। হুমায়ূনকে আস্তে করে বললাম, এবার যুক্তিগুলো স্পষ্ট করে তুমি বলো।

নিশ্চয়।

হুমায়ূন আস্তে আস্তে একটার পর একটার জট ভাঙতে শুরু করল। পর্দার পাত্রপাত্রী এবং সেকালের জন্য কঠিন বাস্তবভিত্তিক কাহিনী। ও যেন কথার জাদুকে চোখের ওপর টেনে নিয়ে এল। নায়ক-নায়িকা ললিতা এবং শেখর এসে সামনে দাঁড়াল এবং সেই সঙ্গে সামাজিক অবস্থাও।

সবদিক থেকে আমরা সঠিক থাকলেও দেখা গেল প্রাইজ পেয়েছে দুই জোড়া নায়ক-নায়িকা। দল না করেও দলাদলি করা যায়। এক হাতেও তালি বাজে।

আগে কি পরে মনে নেই, আমরা আবার যুক্ত হলাম বাংলা একাডেমীর সদস্য পদে। একদল বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে। মহাপরিচালক হারুন-রশীদ।

হুমায়ূন আহমেদের বহুবিধ পরিচয়ের একটি 'ক্রিকেট ফ্যান', বিশেষ করে বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের তিনি একনিষ্ঠ সমর্থক। ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০০৭ উপলক্ষ্যে ডানো ভাইটাইডিস-অন্যদিন বিশ্বকাপ ক্রিকেট পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে সাবেক ও বর্তমান জাতীয় ক্রিকেটারদের মাঝে তাঁর উপস্থিতি সে সাক্ষ্য দেয়। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ ও স্পন্সর প্রতিষ্ঠান আরলা ফুডস-এর কান্ডি ম্যানেজার আহমেদ করিম।

সতের কি আঠারজন সদস্যের মাঝে হুমায়ূন আর আমি কম কথা বলি। তিন বছর একটানা নয়, থেমে থেমে বৈঠক বসত। আমরা ইলেকশনে আসিনি। এসে আমরাই সেটা দিলাম। এই নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক আমাদের নিয়ে নানারকম মন্তব্য করতেন। অন্যরা সরাসরি কেউ কিছু বলতেন না। কিন্তু বিষয়টা ভালো চোখেও কেউ দেখতেন না। প্রফেসর শমসের আলী সবদিন আসতেন না। প্রথম যেদিন এলেন সোজা দাঁড়িয়ে যুক্তি তর্কে অত্যন্ত সাহসের পরিচয় দিলেন। তারপর থেকে সেই ভদ্রলোক আর গলা তোলেননি।

হুমায়ূন বলেছিল, এসব লোক ইলেকটেড হয়ে আসে আননেসেসারি গুণগোলের জন্য। ঝগড়া এরা পছন্দ করে। শান্তির ব্যাপারে অশান্ত করে রাখে মানুষকে।

এই তিন বছরে আমি তিন মাস থাকিনি, অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার জন্য। তবে হুমায়ূনের পাঠানো বই পাঠের মাধ্যমে তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

হুমায়ূন এমনিতে স্বল্পবাক্ মানুষ। তবে প্রিয়জনদের মাঝে বোঝা যেত কতটা মাতিয়ে রাখা লোক এবং কতটা প্রাণবন্ত।

তার বাসায় বিভিন্ন সময় যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। কোনো ছবি তৈরির আগে সে ডেকে পাঠাত আমাদের। শৃঙ্খলার সঙ্গে সবাইকে সব ব্যাপারে বোঝাত। তারপর টেবিলভর্তি শাহী খানা।

এই রকমারি বৈঠকগুলো বসত সাধারণত তার শোবার ঘরে। অত বড় গুণী ও সৌখিন মানুষ, তার শোবার ঘরটা যেন প্রশ্নের মতো। বড় ঘর। একদিকে শোবার খাট। তারপর কাঠের মেঝে। হুমায়ূন সেই মেঝেতে বসে টুলের ওপর লিখত। ঘরে থাকার মধ্যে বড় একটা টিভি, কিছু বই আর অডিও ভিডিও ক্যাসেট।

বাইরের ঘরে যখন কিছু নিয়ে আলোচনা চলত, তখন আসর জমজমাট।

তার বাড়ির নানান অনুষ্ঠানের ছোট ছোট আমন্ত্রণপত্র আসত। সেগুলো ছেলেদের জন্মদিনেই বেশি। হুমায়ূনের নিজের লেখা আরও ছোট ছোট চিঠি আসত। একটা থেকে আরেকটা সম্পূর্ণ আলাদা। বিষয় হয়তো একই কিন্তু ভাষা বৈচিত্র্য বিচিত্র। সেগুলো এতই চিত্তাকর্ষক হতো, আমার কাছে এতটাই বাড়ির তরুণরা নিয়ে যেত। জমাতো।

হুমায়ূন ব্যবহারেও মিষ্টিভাষী এবং স্পষ্টবাদী ছিল। তার কথাই ধরনই ছিল আলাদা। একেবারে স্পষ্ট। সেই তার বৈশিষ্ট্য। এমনিতে ছোটখাটো মানুষ। কিন্তু তার মেলামেশা এবং কথাবার্তা ছিল ভীষণ আকর্ষক।

হুমায়ূন তার লেখা আমাকে যে বইটি উৎসর্গ করেছে তাতে লিখল- ‘তিনি সব সময় হাসেন। যতবার তাকে দেখছি হাসিমুখে দেখেছি। আমার জানতে ইচ্ছে করে জীবনের কঠিন দুঃসময়ে তিনি যখন কলম হাতে নিয়েছিলেন তখনো কি তাঁর মুখে হাসি ছিল?’

ফোনে কথা হলো এ ব্যাপারে। আমি বললাম, জবাবটা তোমাকে বই উৎসর্গ করেই দিব।

তাই দিয়েছিলাম। আমার ‘সমুদ্র বন ও প্রণয়পুরুষ’ বইয়ের উৎসর্গপত্রে লিখেছিলাম : ‘হুমায়ূন আহমেদকে, তোমার উৎসর্গিত বইতে প্রশ্ন রেখেছিলে, কঠিন দুঃসময়েও কি মুখে হাসি ছিল? ছিল। এখনো আছে। কারণ সম্ভবত কৈশোরের অভ্যাস। কিংবা জীবন যখন নানাদিক থেকে আক্রান্ত, তখন হাসিই বোধহয় আত্মবিশ্বাসের কাজ করে।’

এই তো গত রোজার গুরু দিকে আমি অসুস্থ ছিলাম। হঠাৎ এক বিকেলে 'অন্যদিন'-এর সম্পাদক মাজহারের সঙ্গে হুমায়ূন এসে হাজির। ওর কাছে গোমড়া মুখ করে থাকা যায় না। যতক্ষণ থাকল ততক্ষণ শুধু কথায় মাতিয়ে রাখল। যাওয়ার আগে বলল, শুয়ে থাকবেন কী! উঠে বসুন। সামনে ঈদ। কলম ধরুন।

তখনো ওর অসুখের খবর জানা যায়নি। অসুখের কথা শুনলাম। মনে হলো এ রোগ ভয়ঙ্কর সন্দেহ নেই। আমার কিছু আত্মীয়স্বজন জ্বলো হয়ে গেছে। বিশ্বাস ছিল হুমায়ূনও তেমনি আবার ভালো হবে, উঠে দাঁড়াবে। ওর মতো প্রাণবন্ত শিল্পীরা আত্মবিশ্বাসে সেরে ওঠে। ওর মধ্যে প্রচুর আত্মবিশ্বাস ছিল। বিশ্বাস করতে এখন মন চায় না আমাকে অসুস্থতা থেকে উঠতে বলে দে-ই বিছানায় পড়ে গেল।

চিকিৎসার মাঝখানে দেশে ফিরে নুহাশপল্লীতে যখন এসেছিল আমি যেতে পারিনি। কিন্তু কেমন বিশ্বাস ছিল ও আবার ফিরে আসবে।

মানুষের মন কেমন চলত। কিংবা মানুষ চিন্তার গভীরে যেতে পারে না, অথবা যেতে চায় না। তবে নিয়তি তার নিজের কাজ করেই যায়। আমরা নিরুপায় দর্শকমাত্র।

আমরা হুমায়ূনকে হারিয়েছি। কিন্তু হারাইনি তার মূল্যবান স্মৃতি এবং বিশাল সাহিত্যকর্মকে।

রাবেয়া খাতুন

একজন-বহুজন হুমায়ূন

একবার হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে আমাকে লিখতে হয়েছিল, নব্বই দশকের প্রথমদিকে। এতদিন পরে আবার কলম ধরতে হলো। হুমায়ূনের জন্যই। শেষের এই কলম ধরাটা নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক, সেই সঙ্গে গৌরবেরও বটে, অসময়ে চলে যাওয়া একজন প্রিয়পাত্রের অসাধারণ সৃজনক্ষমতার কথা বলবার সুযোগটি কম কথা নয়।

গত প্রায় এক দশকে হুমায়ূনের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ বা ফোনে কথা বোধহয় কমই হয়েছে। একটা সময় ছিল, যখন হুমায়ূনের সঙ্গে মাঝে মাঝেই ফোনে কথা হতো আমার। অসুস্থ আমি যখন একবার হাসপাতালে শয্যাশায়ী, গুলতেকিনসহ হুমায়ূন চলে এসেছিল আমাকে দেখতে, তখন সে খুবই ব্যস্ত লেখক এবং নাট্যকার, তবুও। শেষ দেখাটিও হয় প্রায় সাত-আটবছর আগে, ও তখন হার্ট অপারেশনের পরে ফিরেছে, আমাকে দেখে ওর প্রথম কথাটি ছিল-রিজিয়া আপা, আপনাকে আমার নুহাশপল্লীতে নিয়ে যাব। আপনাকে যেতেই হবে। কিন্তু এরপর ওর পারিবারিক জীবনে জটিলতা নেমে আসে। সে সময়ে ফোনেই জানি না কেন, বলেছিল রিজিয়া আপা, সাত দিনের মধ্যেই আমি আপনার বাসায় আসছি, সব বলব আপনাকে।

সাত দিনের মধ্যে সে আসতে পারেনি, তার পরেও নয়, আর কোনোদিন সে আসেনি বা আসতে পারেনি। জীবনে তখন তার বড় একটি পরিবর্তন ঘটে গেছে।

আমিও আর কখনো ওকে ফোন করিনি। তবু নানাজনের কাছে শুনতাম, হুমায়ূন বলে, রিজিয়া আপাকে নুহাশপল্লীতে আনবই একবার। আপাকে বড়বোনের মতো সম্মান করি। পুরনো এই কিস্তিগুলো লিখতে গিয়ে দু'চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হচ্ছে বারবার। বারবারই মনে হচ্ছে কেন ওকে একবার ফোন করে বললাম না হুমায়ূন, তোমার নুহাশপল্লী দেখতে আসব আমি। (অবশ্য আমি না গেলেও হয়তো কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হতো না।) অকপটে স্বীকার করি, হুমায়ূনের জন্য আমার হৃদয়ে স্নেহের ঘাটতি কখনো হয়নি, এখনো হয় না।

আমাদের সাহিত্যজগতে আমার অনুজ কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক রয়েছেন, যারা আমার অত্যন্ত স্নেহের পাত্র, হুমায়ূনও ছিল তাদেরই একজন। ছোট ভাই-বোনের মতোই ওদের স্নেহ দিয়েছি। ওরাও আমাকে বড় বোনের শ্রদ্ধা-সম্মান দিতে কখনো কার্পণ্য করেনি। তবে এদের প্রত্যেকের প্রতিভা ও অবদানকে অবশ্যই আমি সম্মান করি ও গুরুত্ব দিই।

হুমায়ূনের অসময়ে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রয়াণের পর পত্র-পত্রিকায় তার সম্পর্কে অজস্র লেখা প্রকাশিত হচ্ছে, টিভি চ্যানেলগুলোতেও তার সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে প্রচুর,

আমার এই লেখাটি তার কলেবর বৃদ্ধির জন্য নিশ্চয়ই নয়, বরং এটি লেখকের সঙ্গে লেখকের সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ এবং সেইসঙ্গে এ দেশের একজন জনপ্রিয় বহুল আলোচিত লেখকের সাহিত্য অবদানের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন প্রচেষ্টা মাত্র।

আমি লেখক হুমায়ুনকেই চিনতাম, চিনতাম তার বিনয়ী ব্যক্তিত্ব ও লেখার কারণেই। স্বীকার করি, নাট্যকার বা চলচ্চিত্র নির্মাতা হুমায়ুন আহমেদ আমার ভালো করে চেনা নয়।

হুমায়ূনের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় সম্ভবত সত্তর দশকের দিকে। ততদিনে সে হয়ে উঠেছে ‘শঙ্খনীল কারাগার’ ও ‘নন্দিত নরকের’ লেখক। বই দুটির কথা আমাকে প্রথম বলেছিল শাহরিয়ার কবির, তার বক্তব্য ছিল ‘আপা, হুমায়ুন আহমেদের উপন্যাস দুটো পড়বেন, অসাধারণ লেখা।’

বাংলাদেশ বেতারের এক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে গিয়ে প্রযোজক-কবি আবু তাহেরের কাছেই পেয়ে গেলাম হুমায়ূনের উপন্যাস। তাহেরই দিল পড়তে, বলল, এমন লেখা বাংলা সাহিত্যে এর আগে কেউ লেখেননি।

বাড়িতে ফিরেই পড়ে ফেললাম উপন্যাস দুটি। পড়া শেষে আবেগে মুগ্ধতায় এবং ভালোলাগায় আমি স্তব্ধ। লেখকের শিল্পীত চেনানোবোধ আমাকে আশ্চর্য বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন করল।

মনে হয়েছিল, যেন চমৎকার একটি জীবিতা পড়ে উঠলাম।

হুমায়ূনের আত্মপ্রকাশের আগে আমাদের সাহিত্য অঙ্গনটি হতদরিদ্র ছিল—এমন মনে করবার কোনো কারণ নেই। পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন সাহিত্যের দিকেই যে আমরা ভিক্ষার হাত পেতে বসে ছিলাম, এমনও নয়।

বায়ানুর ভাষা আন্দোলনের পর থেকেই বাংলাদেশের সাহিত্য নিজের ঘরটি ঘুছিয়ে নিতে আত্মনিয়োগ করেছিল। ‘৪৭-এর পর থেকে পঞ্চাশের দশক অবধি এদেশের সাহিত্যিকরা অবিভক্ত বাংলা সাহিত্যের প্রভাবমুগ্ধ হয়তো হননি। কিন্তু ষাটের দশকে এসেই এ দেশের সাহিত্যের গতিপথ একেবারেই ভিন্নমুখী হলো। নিবেদিত হলো নিজ দেশ, পরিবেশ, প্রকৃতি ও নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-ইতিহাস এবং রাজনীতি সম্পৃক্ততায়। এদেশের আঞ্চলিক মানুষেরা তাদের সংগ্রামী চেতনাবোধ নিয়ে হয়ে উঠল সাহিত্যের মানুষ।

কারোই অবিদিত নেই যে, সাহিত্যের বাহন হচ্ছে ভাষা। আমাদের বাংলা সাহিত্যের সেই বাহনটি পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র যন্ত্রটির জনের পর থেকেই নিগৃহীত হচ্ছিল। তাকে শবাগারে পাঠাবার সব রকম ষড়যন্ত্রই অব্যাহত ছিল। বায়ানুর ভাষার লড়াইয়ে প্রাণে বেঁচে গেলেও একান্তরের মুক্তিযুদ্ধ অবধি সে ছিল প্রায় পরাধীন। তাকে

শৃঙ্খলমুক্ত করবার জন্য বায়ান্নর পর থেকেই কলম নামক অঙ্কটিকে হাতে তুলে নিয়েছিলেন সে সময়ের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সাহিত্যিকেরা। বিমুখ তারা আমাদের করেন নি। আমাদের জাতীয়তা সৃষ্টির প্রধান উপাদান বাংলা ভাষাকে যেমন তাঁরা সম্মানের আসনে তুলে এনেছিলেন, তেমনি বাংলাদেশের আধুনিক সাহিত্যের ভিতটি দক্ষ হাতে গড়ে দিয়েছিলেন। আমরা যারা ষাটের দশকে এই মজবুত ভিতের ওপরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, সাহিত্যসৃষ্টিকে নিয়েছিলাম বাঙালির আত্মপরিচয় বা 'আইডেনটিটি' প্রকাশের উচ্চকণ্ঠ দাবির মাধ্যম হিসেবে। বলা বাহুল্য, ষাটের দশক বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় এক গৌরবের অধ্যায়, এরই প্রভাবে জাতীয়তার আত্মপ্রকাশে, স্বাধীনতা স্পৃহায়, আত্মপরিচয়ের দৃঢ়তায় জেগে উঠেছিল মধ্যবিস্ত। গড়ে উঠেছিল আত্মসচেতন, বুদ্ধিদীপ্ত, দেশপ্রেমিক পাঠক তথা নতুন মধ্যবিস্ত শ্রেণী। বায়ান্ন থেকে একান্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত, রাজনৈতিক চিন্তাধারা, অর্থনৈতিক ভাবনা ও জাতীয় স্বার্থের জাগরণে সাহিত্য তার যথার্থ ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে আমাদের সাহিত্যের সমৃদ্ধিই পাঠক আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়। এ সময় থেকেই পশ্চিমবঙ্গে সাহিত্য আর এ দেশের

একক সাহিত্য হিসেবে বিবেচিত হয়নি।

মহাশ্বেতা দেবী, সুনীল, শীর্ষেন্দু, সমরেশ সেন, সমরেশ মজুমদার, শংকর প্রমুখের লেখা ওদেশে বহুল পঠিত হলেও এরা বিপরীতে তখন বাংলাদেশের সাহিত্য উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পাঠক সৃষ্টি করে উঠেছে। তৈরি করে ফেলেছে নিজস্ব সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য।

(তখনো তার জনপ্রিয় ধারাটি উন্মোচিত করেন নি তিনি।) হুমায়ূনের সাহিত্য সৃষ্টির দ্বার উদ্ঘাটিত হয়েছিল যে দুটি উপন্যাস নিয়ে, ('নন্দিত নরকে' ও 'শঙ্কনীল কারাগার') বহুল প্রশংসিত ও আলোচিত হলেও উপন্যাস দুটি সম্পর্কে আমার উপলব্ধিটি বিবৃত করা প্রয়োজন বোধ করি।

দুটি উপন্যাসের বিষয় একান্তই মধ্যবিস্ত পারিবারিক কাহিনী। এমন বিষয় নিয়ে আগেও যে লেখা হয়নি, তা নয়। তবুও কেন বই দুটি পাঠকের মনে গভীর দাগ কাটতে সমর্থ হয়েছে, ভেবে দেখতে হয় বৈকি।

আমার মনে হয়, সবচেয়ে আকর্ষণীয় হচ্ছে এর ভাষা। এমন কাটছাঁট শাণিত ভাষার এমন শৈল্পিক ব্যবহার এর আগে আমরা কমই পেয়েছি। (যদিও ভাষার মাধুর্য চিত্রকল্পে আলাউদ্দিন আল আজাদের ছোটগল্প জাদুকরী মোহ বিস্তার করে) ভাষার ব্যবহার ও কাহিনী বর্ণনায় হুমায়ূন আহমেদের কলমের আশ্চর্য সংযম তার দুটি উপন্যাসেই অপূর্ব শিল্পমাত্রা দিয়েছে। সর্বোপরি উপন্যাসের চরিত্রগুলো আমাদের চেনা

মানুষ হলেও ব্যতিক্রমী। আচার-আচরণ ভাবনা-চিন্তা নিয়ে তারা একেবারেই অন্যরকম নতুন মানুষ। উপন্যাসের সংলাপ সম্পূর্ণ নতুনত্ব বহন করে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এসবই ছিল হুমায়ূন আহমেদের পাঠক আকর্ষণের চুম্বকী গুণাবলি।

ক্রমে উল্লেখ্য যে, ভাষার শিল্পীত ব্যবহার আমাদের আর একজন কথাসাহিত্যিককে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছে, তিনি মাহমুদুল হক। ভাষার মোহনীয় চমক, ভাষাকে প্রয়োজনমতো ভেঙ্গেচুরে তৈরি করে নেওয়া তাঁর অসাধারণ কাহিনী বিন্যাসকে আরও অসাধারণত্ব দিয়েছে। নিভৃত আত্মগোপনকারী বিরল ব্যক্তিত্বের লেখক মাহমুদুল হকের সাহিত্যকর্ম বাংলাদেশের সাহিত্যকে ভিন্নমাত্রা দান করেছে অস্বীকার করা যায় না।

বাংলা সাহিত্যের পাঠক ও বিজ্ঞ আলোচকবৃন্দ মাহমুদুল হকের সাহিত্যকর্মের যথার্থ মূল্যায়নে ব্যর্থ হয়েছে বলেই মনে হয়। তাঁর নিঃশব্দে চিরপ্রয়াণটিও ছিল বেদনাদায়ক। বাংলা একাডেমী প্রাক্কণে যখন তাঁর মরদেহ আনা হয়, পাঠকের ঢল দূরে থাক, অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তি বা নামি লেখকও তাকে শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনে অনুপস্থিত ছিলেন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও ব্যাপারটি নতুন কিছু ছিল না। পৃথিবীতে বহু কালজয়ী লেখকেরও এমন অবহেলিত মৃত্যুর ইতিহাস রয়েছে।

এদিক দিয়ে হুমায়ূন আহমেদ নিঃসন্দেহে মহা ভাগ্যবান। জীবিত ও মৃত-দুই অবস্থাতেই তিনি তার প্রাপ্য সম্মান আদায় করে নিয়েছেন।

হুমায়ূনের 'নন্দিত নরকে' ও 'শঙ্খনীল কারাগার' উপন্যাসের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর রোমান্টিক কাব্যময়তা। ঐতকাল বাংলা সাহিত্যে (উভয় বঙ্গের) যে মধ্যবিস্তৃত জীবন আমরা পেয়েছি, সেখানে জীবন ধারণের টানাপোড়েন, উচ্চ মার্গীয় মূল্যবোধ এবং ন্যায়ভিত্তিক আদর্শের জন্য সংগ্রামকেই আমরা দেখেছি, দেখেছি হতাশা আর ভাঙনের সঙ্গে যুদ্ধ। বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল এবং কল্লোলযুগীয় সাহিত্যে বাঙালি মধ্যবিস্তৃতকে একটি গুপ্তির মধ্যেই অবস্থিত রেখেছিলেন বাংলা কথাসাহিত্যিকেরা। মধ্যবিস্তৃত মানসে যে সৃজনশীলতা, সৌন্দর্যবোধের চর্চা, সুখ-দুঃখ বা জীবনের অপ্রতিরোধ্য দহনের মাঝেও শিল্পীত বেদনাবোধের নিয়ত আনাগোনা এবং আত্মবিস্ফোরণের যে ব্যাকুলতা সেটা আমরা সম্ভবত সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করলাম প্রথমে মাহমুদুল হক ও পরে হুমায়ূন আহমেদের মাঝে-তার 'নন্দিত নরকে' ও 'শঙ্খনীল কারাগারে'। তবে মাহমুদুল হক যেখানে অসংকোচ প্রকাশে দুর্বীর, হুমায়ূন সেখানে মৃদু লয়ের।

'নন্দিত নরকে' ও 'শঙ্খনীল কারাগারে'র মুগ্ধ পাঠক আমি তখনো ব্যক্তি হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারিনি। শুনেছি, তিনি খুবই লাজুক মানুষ। তাকে নিয়ে অনেক মজার গল্প পাঠিকা মহলে প্রচলিত ছিল। বেশ অনেক বছর আগেও হুমায়ূন

আহমেদের এক পাঠিকা (যিনি বয়সে তরুণী এবং হুমায়ূনের লেখার ভক্ত) আমাকে জিজ্ঞেস করে বসলেন আপনাদের হুমায়ূন আহমেদ নাকি খুব লাজুক আর নার্ভাস? স্টেজে কথা বলতে গেলে নাকি খুব নার্ভাস হয়ে যান, তার পকেট থেকে কলম পড়ে যায়, কলম তুলতে গেলে নোটবই, পার্স, পড়ে যায়? কোনো সমাবেশে বক্তব্য রাখবার সময় বিব্রত, নার্ভাস হুমায়ূন আহমেদের কলম, পার্স, নোটবই পকেট থেকে পড়ে যাওয়ার ঘটনা আমার জানা ছিল না। তবু বুঝে নিয়েছিলাম, লেখক হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে তার ভক্ত-পাঠকদের অনুসন্ধিসার ও কল্পকাহিনী তৈরি করার শেষ নেই। নিঃসন্দেহে সেটা ছিল জনপ্রিয় হতে যাওয়া একজন লেখকেরই প্রাপ্য।

হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় এর কিছুদিন পরেই। চীন দেশ থেকে আসা কয়েকজন লেখকের সম্মানে লেখক শিবির একটি নৈশভোজের আয়োজন করে। সেখানে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম আমি। হুমায়ূনও সেখানে ছিলেন। ওকে তখন বললাম, তোমার বই পড়বার পর থেকেই তোমাকে দেখবার দারুণ ইচ্ছে ছিল। ইচ্ছেটা পূরণ হলো আজ। এত অল্প বয়সে এমন সাংঘাতিক বই তুমি কেমন করে লিখলে? (তুমি সম্বোধনই করেছিলাম ওকে। ছোটখাটো মিষ্টি চেহারার ছেলেটিকে গুরুগম্ভীর অধ্যাপক বা বিজ্ঞ ব্যক্তিত্বের লেখক বলে মনেই হয়নি।)

আমার প্রশ্নের জবাবে কিছুই বলতে পারেনি হুমায়ূন, শুধু হাসছিল, অপ্রতিভ হাসি।

চলে আসবার সময় হুমায়ূন যে কবিতা আমাকে অনুসরণ করেছে, বুঝতেই পারিনি, গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি পেছন থেকে ডেক্স-রিজিয়া আপা। মুখ দেখলাম। জ্যোৎস্না ছিল বেশ হালকা। কুয়াশার শীতের রাতে উলের জ্যাকেট পরা হুমায়ূনকে দেখাচ্ছিল কৈশোর উত্তীর্ণ সদ্য তরুণের মতো। খুব বিনীত ভঙ্গিতে কুণ্ঠিত স্বরে হুমায়ূন বলল, 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার ছিল।' অবাকই হলাম, খাবার টেবিলে হুমায়ূন আমার সঙ্গেই কেবল নয়, অন্যদের সঙ্গেও কথা খুব কমই বলেছে। ধরে নিয়েছিলাম, নবীন এই লেখক সম্ভবত মিতবাক মানুষ। (পরে অবশ্য জানতে বাকি থাকেনি, ক্ষেত্রবিশেষে হুমায়ূন যথেষ্ট কথা বলতে পারে এবং রসিকতা করতেও পটু) বিস্মিতই হয়েছিলাম, জিজ্ঞেস করলাম কী কথা? কী যে হলো হুমায়ূনের বুঝলাম না, খুব লাজুক অভিমানী কিশোরের মতো মাথা ঝাকাল-থাক, পরে বলব।

(জানি না কেন, সেই শীতের রাতে কিশোর প্রায় ছেলেটির প্রতি আশ্চর্য মমত্ববোধ আমাকে আপ্ত করেছিল!)

হেসে ফেললাম-এখন বলতে অসুবিধা আছে?

সংকোচের হাসিতে হুমায়ূন বলল, পরেই বলব আপা!

কী কথা বলতে চেয়েছিল ছোটখাটো লাজুক সেই ছেলেটি, পরে আর জিজ্ঞেস করিনি কখনো।

অনেক বছর পরে হুমায়ূন আহমেদ যখন বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক এবং জনপ্রিয়তম টিভি নাট্যকার, আমাকে তার না-বলা কথাটি বোধহয় জানতে পেরেছিলেন।

বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে, আমি সভাপতি নাকি প্রধান অতিথির আসনে বসেছিলাম। প্রধান বক্তা লেখিকা মকবুলা মঞ্জুর বাংলাদেশের মহিলাদের লেখা নিয়ে বেশ বড় একটি প্রবন্ধ পাঠ করছিলেন। দর্শকদের আসনের প্রথম সারিতেই ছিলেন আমন্ত্রিত অতিথি হুমায়ূন আহমেদ। স্টেজে বসেই দেখতে পাচ্ছিলাম, তাকে ঘিরে অটোগ্রাফপ্রার্থী তরুণী-কিশোরী ভক্ত পাঠক-পাঠিকাদের ভিড়। প্রিয় লেখকের সঙ্গে কথা বলতে পারার উচ্ছ্বাস-উত্তেজনায় অনেকের মুখটি গোলাপি বর্ণ ধারণ করেছে, ইংরেজিতে যাকে বলে 'ব্লাশ' করা। বেশ উপভোগ করছিলাম সেটা। স্টেজে প্রবন্ধ পাঠ শেষ হতেই উঠে দাঁড়ালেন কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ। তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন প্রবন্ধ পাঠিকা মকবুলা মঞ্জুরকে। অনেক আগের কথা, তবু যতদূর মনে পড়ে, মহিলা সাহিত্যিকদের জীবন-অস্তিত্বের অভাব ও দুর্বলতাই ছিল হুমায়ূনের আক্রমণের প্রতিপাদ্য বিষয়। তার একটি বাক্য বেশ মনে আছে, বলেছিলেন, 'লেখিকারা যখন লেখেন, তাদের স্বামীরা দাঁড়িয়ে পাশে বসে পাখার বাতাস দেন না।'

মহিলা সমিতির অভিটোরিয়াম ছিল দর্শকে পরিপূর্ণ। সেখানে অনেক নবীন-প্রবীণ লেখিকাই উপস্থিত ছিলেন। বেশ সাহসে তারা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠানটি বাদ-প্রতিবাদে জমজমাট উপভোগ্য হয়ে উঠল। এরই মধ্যে হুমায়ূন আহমেদ বলে বসলেন, যিনি পতিতাদের নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন, তারও ঠিক বাস্তবতা অভিজ্ঞতা আছে? আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি, পতিতাপত্নী দূরে থাক, তিনি রাত একটায় ঢাকা শহরের রাজপথে একা হেঁটে বেড়াতে পারবেন না, যা কেবল একজন পুরুষ লেখকই পারে। মৌচাকে ঢিল পড়ল যেন, গুরু হলো হল জুড়ে মহিলাদের হইচই, যেন জেতার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

এই উত্তেজিত সময়ে আরেক আমন্ত্রিত অতিথি বিশিষ্ট সাংবাদিক হেদায়েত হোসেন মোরশেদ উঠে দাঁড়ালেন। হুমায়ূনের মন্তব্যের বিরুদ্ধে পাল্টা মন্তব্য দিতে শুরু করলেন। উঠে দাঁড়ালেন আরও অনেকেই, অনুষ্ঠানটি হয়ে গেল যেন একটি বিতর্ক সভা। আমার জন্য সেটা ছিল রীতিমতো বিব্রতকর পরিস্থিতি। তবু নির্বিকার ভঙ্গিতেই বসে থাকলাম। উদ্ভূত পরিস্থিতির পাশ কাটিয়ে নিজের বক্তব্যটি শেষ করতে পেরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম যেন। হল থেকে বেরিয়ে আসবার সময়ে দেখলাম এক দঙ্গল মহিলার

গলাবাজি দ্বারা আক্রান্ত হুমায়ূন রীতিমতো নাজেহাল। তার দ্রুত কথা বলার ভঙ্গিতে আত্মপক্ষের সমর্থন থাকলেও, তাকে নার্ভাসই দেখাচ্ছে। কুয়াশাচ্ছন্ন এক সন্ধ্যারাতে লাজুক যে নবীন লেখকটি আমার স্নেহভাজন হয়ে গিয়েছিল একদল গলাবাজি মহিলা যোদ্ধাদের মাঝে তাকে বিব্রত হতে দেখে খারাপই লাগছিল। তাকে সমর্থন দেওয়ার কোনো উপায়ই সেই মুহূর্তে আমার ছিল না। ভেবে নিয়েছিলাম, জনপ্রিয়তার জ্বালা অনেক।

পরদিন সকালেই পেলাম হুমায়ূনের ফোন। রিজিয়া আপা রাগ করেছেন? কণ্ঠস্বর যেন সেই কিশোর চেহারার তরুণের। হাসলাম—কেন রাগ করব ভাই! কী এমন দোষ করেছ তুমি।

মকবুলা আপাকেও ফোন করেছি, খুব রেগে আছেন, আপনিও রেগে আছেন নিশ্চয়ই।

কী যে বলো! হাসতে থাকি আমি।

না, আপা। কাল আপনাকে অনর্থক আক্রমণ করেছি।

হেসেই বললাম, কোথায়! তুমি তো আমার নামও উচ্চারণ করনি। তাছাড়া তুমি যা বলেছ, সবই তো সত্যি, আমি কখনো রাসুদপুরে ঢাকার রাস্তায় একা হাঁটতে পারব না।

হুমায়ূনের কণ্ঠস্বর হয়ে যায় বিস্ময়। কিশোরের কণ্ঠ—সবাই যে বলেছে, আপনার কাছে আমার মাফ চাওয়া উচিত।

সেদিনই ফোনে হুমায়ূন বলেছিল, রিজিয়া আপা, আপনি আমার বড় বোনের মতো! ছোট ভাইয়ের ভুল নিশ্চয়ই মাফ করবেন। প্রথম দেখা হুমায়ূনের না-বলা প্রশ্নটি ততক্ষণে যেন আমার বোঝা হয়ে গেছে। সম্ভবত ও আমার কাছে জানতে চেয়েছিল, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া কী করে পতিতাদের জীবন নিয়ে উপন্যাস লেখা সম্ভব হয়েছে? পরবর্তীকালে সফল ও জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ নিশ্চয়ই জেনে গেছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়াও অনেক সময় সফল উপন্যাস লেখা সম্ভব। এমন অনেক উপন্যাস তিনি নিজেও লিখেছেন। এর কিছুদিন পরেই হুমায়ূন তার লেখা একটি উপন্যাস আমাকে উৎসর্গ করেছিল।

দুটি চমৎকার উপন্যাস পাঠকদের উপহার দিয়ে বেশ অনেক দিন হুমায়ূন আহমেদের কলম থেমে ছিল। সপরিবারে তিনি চলে গিয়েছিলেন আমেরিকায়,

উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য। সে সময়ে বিদেশে চলে না গেলে, হুমায়ূন আহমেদের কাছ থেকে আরও ব্যতিক্রমী শিল্পময় উপন্যাস হয়তো আমরা পেতে পারতাম। ফিরে এসে যখন তিনি আবার কলম ধরলেন, আমরা অন্য এক হুমায়ূনকে পেলাম। জনপ্রিয় একজন কথাসাহিত্যিককে।

যতদূর মনে পড়ে, হুমায়ূনের অবর্তমানে, তার বিখ্যাত উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রচারিত হয়েছিল বিটিভিতে। সে নাটক যে হুমায়ূনের লেখা থেকে অনেক দূরে, সেটা বুঝতে দর্শকের অসুবিধা হয়নি। নাটক হিসেবে তা তেমন দর্শকের জনপ্রিয়তাও পায়নি। কিন্তু যখন হুমায়ূন আহমেদের নিজের লেখা স্ক্রিপ্ট-‘এইসব দিন রাত্রি’, ‘অয়োময়’ বা ‘কোথাও কেউ নেই’ ইত্যাদি নাটক প্রচারিত হতে শুরু করল, হুমায়ূন হয়ে গেলেন শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় টেলি-নাট্যকার। একই সঙ্গে হুমায়ূন আহমেদ তার লেখা উপন্যাসের জন্য হলেন প্রবল আলোড়ন সৃষ্টিকারী এক জনপ্রিয় লেখক। তখনো হুমায়ূনের বিশুদ্ধ রুচির চলচ্চিত্র শুরু হয়নি, তবু সবাইকে অবাক করে দিয়ে তৈরি করে ফেললেন বিশাল পাঠকগোষ্ঠী, যা বাংলাদেশের সাহিত্যের অভূতপূর্ব ঘটনা।

পৃথিবীর জনপ্রিয় নায়ক, গায়ক, রাজনৈতিক নেতাদের অনেক সময় সাধারণ মানুষের ভক্তির আতিশয্যের কারণে, ভিড়ের মাঝি থেকে রক্ষার জন্য পুলিশের সুরক্ষা ব্যুহের প্রয়োজন হয়। এ দেশে হুমায়ূন আহমেদই সেই রকম ব্যক্তিত্ব যাকে ভক্ত-পাঠকের উচ্ছ্বাসের ঢেউ থেকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য পুলিশের সাহায্য নিতে হয়েছিল। (বইমেলায় এই ঘটনা শিঁচয়ই অনেকেরই মনে আছে। বইমেলায় যে হুমায়ূনের লক্ষ কপি বই বিক্রি হয়েছিল, এটাও মনে থাকবার কথা।)

এই সময়েই সাহিত্যযোদ্ধা এবং সাহিত্যিক মহলে ‘অ্যান্ট হুমায়ূন’ বা হুমায়ূন-বিরুদ্ধ মতবাদও বিতর্কের প্রচলন প্রবল হয়ে ওঠে। আলাপ-আলোচনা বা সভা-সমিতিতেই শুধু নয়, লেখালেখি শুরু হয় পত্র-পত্রিকাতেও। ধারণা দেওয়া হয়, হুমায়ূন আহমেদ এদেশে বুদ্ধিদীপ্ত পাঠক গড়ে উঠবার পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছেন। জীবন-বহির্ভূত কল্পকাহিনীর রোমান্টিকতায় পাঠকের বুদ্ধি বৃত্তিকে আচ্ছন্ন করে সাহিত্যকে অপসাহিত্য করে তুলেছেন। অনেকে সাহিত্যের জনপ্রিয় ধারাকে মূল ধারার বহির্ভূত এক ধরনের সাহিত্যের সৃষ্টিকারক আখ্যায় হুমায়ূনকে ত্যাগ করে দেখাতেও কার্পণ্য করেন নি।

‘নন্দিত নরকে’ ও ‘শঙ্খনীল কারাগারের’ বলিষ্ঠ কথাসিল্পীর এই অবমূল্যায়নের প্রচারে লজ্জিত ও ব্যথিত হয়েছিলাম। আমি তখন দৈনিক ‘ইত্তেফাকের’ বিশেষ একটি পাতায় নিয়মিত কলাম লিখতাম। বিদগ্ধ-কথিত প্রচারের বিরুদ্ধেই কলাম লিখতে হলো আমাকে। হুমায়ূনের জন্য সেটাই ছিল আমার প্রথম লেখা। লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম,

কারণ হুমায়ূনই এদেশে প্রথম গল্প-উপন্যাসের বাজারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। বইয়ের যে একটি বাণিজ্যিক দিক রয়েছে সেটা অস্বীকার করলে বই লেখার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, লেখার কাজটি হয়ে পড়ে অনুৎপাদনশীল কর্মকাণ্ড, জাতীয় আয় বা সমাজে তার কোনো অবদানই থাকে না।

হুমায়ূনের আগে অনেক লেখককেই প্রকাশক খুঁজতে হতো,

‘অনেকের ধারণা, টিভি নাটকের সাফল্যই প্রাথমিকভাবে হুমায়ূনের উপন্যাসের কাটতি বাড়িয়েছে। কিন্তু তবু প্রশ্ন জাগে, শুধু কি নাটকের সাফল্যের জন্য গ্রন্থকার হুমায়ূনের সাফল্য এসেছে? জনপ্রিয় লেখক হয়েছেন? সম্ভবত নয়, হুমায়ূন নিজেই ছিলেন এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণ থেকে তিনি তার সাহিত্য সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

পরে প্রকাশকেরাই লেখক খুঁজে বের করবার নিয়মে অভ্যস্ত হতে শুরু করেন। এবং পাঠকের চাহিদা অনুসারে, বেশি হারে লেখককে রয়্যালিটির অংশ দিতে আগ্রহী হতে শেখেন। বাণিজ্যিক সফলতার জন্য বইয়ের প্রচারের ব্যাপারটিও হুমায়ূনকে কেন্দ্র করেই প্রতিষ্ঠা পায়।

আমার লেখা কলামটি পড়ে হুমায়ূন জামিয়েছিল, আপনার লেখা পড়ে আমি আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছি রিজিয়া আপা^{১১} নিজের লেখার প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলাম।

হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্য নিয়ে তবুও বিতর্ক থেকেই যায়। তখনো হুমায়ূন আহমেদের রচনাকে সাহিত্যিক মূল্য দিতে অনেকেই ইতস্তত করেছেন। তার উপন্যাসকে ‘অপন্যাস’ আখ্যা দিতেও দ্বিধা করেনি কেউ কেউ।

বলা হতো, হুমায়ূনের সৃষ্টি চরিত্রেরা প্রায় সবাই একইভাবে কথা বলে, আচরণ করে। (কিছুটা স্ক্যাপাটে ধাঁচের।) তা ছাড়া বাস্তবতা বিবর্জিত এক ধরনের অবাস্তব রোমান্টিকতার অধিবাসী মধ্যবিত্ত চরিত্রেরাই তরুণ প্রজন্মের পাঠকদের আকর্ষিত করে।

হুমায়ূন আহমেদের অজস্র সৃষ্টির বিস্তৃত আলোচনা সীমিত পরিসরে সম্ভব নয় বলেই তার প্রতি দোষারোপ খণ্ডনের অল্প কিছু যুক্তি এখানে উল্লেখ করছি। প্রসঙ্গক্রমে হুমায়ূন আহমেদের বই কেন লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে, কেনইবা আশি/নব্বই দশক থেকে তরুণ পাঠকদের মাঝে হুমায়ূন-উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছে, সেটাও ভাববার বিষয়। এই প্রেক্ষিতে প্রথমেই টিভিতে প্রচারিত হুমায়ূন আহমেদের নাটকের অবদানটির কথা এসে যায়। হুমায়ূন আহমেদের নাটকের মধ্যবিত্ত জীবন আগে গুরুত্বই দর্শকদের উপভোগ্যতা অর্জন করে। মধ্যবিত্ত জীবনভিত্তিক মমতাজ হোসেনের আগে লেখা ধারাবাহিক নাটক যথেষ্ট দর্শকপ্রিয়তা পায়। কিন্তু হুমায়ূন আহমেদের নাটক ছিল

একজন দক্ষ কথাশিল্পীর লেখা নাটক। তাঁর নাটক মূলত মধ্যবিত্তভিত্তিক হলেও এর সংলাপের সংযম ও তীক্ষ্ণতা এবং 'উইট' বা হিউমার সেই সঙ্গে স্বচ্ছতা দর্শককে আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করেছে। রসবোধ থাকলেও সেটা কখনোই স্থূল ভাড়ামি হয়ে ওঠেনি।

এই প্রসঙ্গে বলতে হয়, ব্যতিক্রমী চরিত্রের উপস্থাপনা হুমায়ূনের নাটকেই শুধু নয়, গল্প-উপন্যাসেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পাওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে দর্শক ও পাঠক মহলে। ফলে হুমায়ূন আহমেদের নাটকের দর্শক ও উপন্যাসের পাঠকেরাও হয়ে গেছে একই বৃত্তের মানুষ। এই কারণে অনেকের ধারণা, টিভি নাটকের সাফল্যই প্রাথমিকভাবে হুমায়ূনের উপন্যাসের কাটতি বাড়িয়েছে। কিন্তু তবু প্রশ্ন জাগে, শুধু কি নাটকের সাফল্যের জন্য গ্রন্থকার হুমায়ূনের সাফল্য এসেছে? জনপ্রিয় লেখক হয়েছেন? সম্ভবত নয়, হুমায়ূন নিজেই ছিলেন এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণ থেকে তিনি তার সাহিত্য সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধ, বিজ্ঞান ইতিহাস ছাড়াও পৃথিবীর নানা অনুন্মোচিত রহস্যময়তাকে করে তুলেছেন সাহিত্যের বিষয়। এদিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হয়, বিষয় আহরণে হুমায়ূন আহমেদ বহুগামী। লেখার ধরন বা স্টাইল যদিও তিনি কখনোই পরিবর্তন করেননি, বিষয় অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারেও উদাসীন ছিলেন। একই আঙ্গিকে বলে গেছেন বিভিন্ন ধরনের কাহিনী, তবু প্রায় প্রতিটি উপন্যাসই শেষ হয়েছে ভিন্ন বোধের জন্য দিয়ে।

হুমায়ূন আহমেদের দুই শতাধিক উপন্যাসের অনেকগুলিই পড়ে উঠবার সুযোগ আমার হয়নি, তবু দীর্ঘ সংলাপ সংবলিত তার কাহিনী গ্রন্থনার মূল বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করতে সম্ভবত ভুল হয়নি আমার।

হুমায়ূন তার বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, তিনি সামাজিক কোনো দায়বদ্ধতা থেকে লেখেন না, কালজয়ী কোনো অমর সৃষ্টিও তার উদ্দেশ্য নয়, তিনি লেখেন আনন্দ পেতে ও দিতে।

হুমায়ূন আহমেদ জানতেন, কিংবা জানাতেন যে, তার এই আনন্দদানের বিষয়টির অন্তরালে প্রখর কোনো সত্যের প্রচ্ছন্ন অবস্থান রয়েছে। আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনে যখন হুমায়ূন আহমেদের দ্বিতীয় আগমন, যখন তিনি সমভাবে জনপ্রিয় ও বিতর্কিত হয়ে ওঠেননি, তখন দেশটি এক অচলাবস্থায় প্রায় স্থবির। রক্তক্ষয়ীযুদ্ধে অর্জিত গৌরবের স্বাধীনতা তখন ক্ষমতা দখলকারীর স্বৈরাচারীর মুঠোয় বন্দি। '৭৫ থেকে '৯০ পর্যন্ত পাকিস্তানি মডেলের ঘৃণ্য অনুসারী সেনা-শাসনে সাধারণ মানুষ রুদ্ধবাক। বিজয়ের গৌরবকে পদদলিত করে গণতন্ত্রের বিলোপ, একান্তরের ঘাতক যুদ্ধাপরাধীদের উত্থান, এবং সুবিধাবাদী সুযোগসন্ধানীদের দাপটে দেশের মানুষ চরম হতাশা ও নিরানন্দে নিমজ্জিত। নবীন প্রজন্ম যারা অনেকেই মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি, জানেনি

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি শেষ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা, জানতে পারেনি মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস, দেশকে দেশের মানুষকে ভালোবাসার দিকনির্দেশনাও ছিল তাদের জন্য বিভ্রান্তিকর। ছাত্র রাজনীতিতে তখন চরম দুর্বৃত্তায়ন শুরু। এসবই তরুণ মনে হতাশাকেই প্রকট করে তুলেছিল। রাজনৈতিক পরিস্থিতির শিকার-অন্ধকারে বন্দি তরুণ সমাজ (তারুণ্যের ধর্ম অর্থাৎ উচ্চকণ্ঠ নির্ভীক আত্মপ্রকাশ থেকে তারা ছিল বঞ্চিত) ঠিক এই সময়েই যেন পেয়ে গেল স্বপ্নলোকের চাবি, পেল হুমায়ূন আহমেদকে।

মধ্যবিত্তের কোমল রোমান্টিকতা তাদের আচ্ছন্ন করল। হুমায়ূনের উপন্যাসের চরিত্রেরা হলো তাদের আদর্শ। সেসব চরিত্র অনায়াসে মনের কথা বলে ফেলে, সাবধানি সতর্ক ও অবদমিত মানুষের মতো মনের ভাব প্রকাশে লুকোচুরি করে না।

হুমায়ূনের সৃষ্ট ব্যতিক্রমী চরিত্রেরা অনেকেই প্রচলিত সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় শাসিত মানুষের বন্দিত্ব ভেঙে বেরিয়ে আসা স্বাধীন মানুষের প্রতীক। জীবনাচরণে, ভাবনায়, দর্শনে আপাতদৃষ্টিে তারা স্বেচ্ছাসূরী বা জীবন আসক্তিশূন্য মনে হলেও প্রকৃত জীবনদর্শনে বহুদূরগামী। বস্তুত হুমায়ূন আহমেদ মানুষের বহিরাবরণ ভেদ করে তার অন্তর্গত সত্তাটাকেই উন্মোচিত করেন।

সংলাপের মাধ্যমেই এটি পরিলক্ষিত হয়। মানুষ যা সাধারণত বলে থাকে তা নয়। যা বলতে চায়, কিন্তু বলে না বা বলতে পারে না, সেটাই হুমায়ূন তার চরিত্রকে দিয়ে বলেন। ‘অন্তর্গত সত্য’ বা ‘ইনহিট টুথকেই’ হুমায়ূন গুরুত্ব দেন। সামান্য ‘উইট’ বা রসিকতার ছলে প্রকৃত সত্যটিকেই তিনি বলে কেলেন। অনেক সময় এই হাস্যকৌতুকের আড়ালে প্রচ্ছন্ন থাকে কোনো বেদনাবাহী নির্মম সত্য। হুমায়ূন আহমেদের রচনায় আপাতদৃষ্টিতে যা অগভীর তরল বলে মনে হয়, একান্ত পর্যবেক্ষণে তা হয়ে ওঠে গভীর মর্মকথা।

জীবনের বিরুদ্ধে এই গভীর মর্মকথাকে সহজ কথন, সংযত স্বল্পবাক্যে বিধৃত করে হুমায়ূন জয় করেন বিশাল পাঠকশ্রেণীর মন। হয়ে ওঠেন প্রিয় লেখক, প্রিয় ব্যক্তিত্ব।

হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্যকে উন্মাসিক তাক্ষিল্যে যারা বলেন, অপরিপক্ক, তরল, পাঠক ভুলানো সরল লেখা, তাদের প্রতি অনুরোধ তারা যেন হুমায়ূনের ছোটগল্পগুলো আরও একবার পড়ে দেখেন। এমন অসাধারণ গল্পকার আমাদের সাহিত্যে আছেন হাতেগোনা কয়েকজন। হুমায়ূনের প্রায় প্রতিটি গল্পই আমাকে মুগ্ধ বিশ্বাসে হতবাক করেছে। খুব নির্মোহ ভঙ্গিতেই নৈর্ব্যক্তিক কলমে এক-একটি গল্প বলে গেছেন তিনি।

মানুষের জীবনকে এত ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণে এত নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় অথচ অনবদ্য শিল্প আঙ্গিকে তুলে আনবার দক্ষতা কম গল্পকারেরই থাকে।

হুমায়ূন ছিলেন অনিরুদ্ধ এক লেখক। অসংখ্য লেখা তিনি লিখেছেন। তার সব লেখাই যে উচ্চমানসম্পন্ন একথা বলা যায় না। তবে মান বিচারে তার অনেকগুলো উপন্যাসই উচ্চস্থান পেয়ে যায় নিঃসন্দেহে।

হুমায়ূনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মিডিয়ার অসার উচ্ছ্বাসের টেউ কখনো কখনো তাকে কালভোর্গীতার দুয়ারে পৌঁছে দিলেও বলতে হয়, কে হবেন কালজয়ী বা কে হবেন না, সে বিচার একমাত্র কালের হাতেই। এই মুহূর্তে এই মূল্যায়ন করতে যাওয়া নেহাতই হঠকারিতা।

তবে নির্ধায়ে বলতে পারি, হুমায়ূন আহমেদের ‘নন্দিত নরকে’ ‘শঙ্খনীল কারাগার’সহ আরও বেশ কয়েকটি উপন্যাস এবং তার ছোটগল্পগুলো আমাদের বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ।

হুমায়ূনের বড় কৃতিত্ব, তিনি শিল্পমাধ্যমের তিনটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ সাহিত্য, টিভি নাটক ও চলচ্চিত্রে তিনটি ভিন্নমাত্রা সংযোজন করেছেন। তিনটিতে প্রতিভার স্বাক্ষ রাখলেও একটি অপরটিকে অতিক্রম করেনি। একটি অপরটির পরিপূরক হয়ে ওঠেনি। টিভি নাটকে হুমায়ূন ছিলেন তার পুরবর্তী ও সমকালীন নাট্যকারদের থেকে ব্যতিক্রমী। (মূলত মধ্যবিত্ত জীবনই সর্বশ্রেষ্ঠ নাটকের প্রধান বিষয়) মধ্যবিত্ত দর্শকশ্রেণী যেমন হুমায়ূনকে সাদরে গ্রহণ করেছে, তেমনি সর্বস্তরের দর্শকের কাছে তার নাটকের জনপ্রিয়তার কারণ তার সাধারণ ঘটনাবলি ও হাস্যরসাত্মক সংলাপ এবং ‘হিউমার’। দর্শকদের কাছে তার নাটক ছিল বিশেষত্ব মণ্ডিত হুমায়ূনের নাটক।

উপন্যাসের মতো নাটকে যেমন ছিলেন হুমায়ূন সফল, চলচ্চিত্র নির্মাণেও তেমনি সাফল্য অর্জন করেছেন। বলা বাহুল্য একজন নামি কথাসাহিত্যিক যখন চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন, সেটা অবশ্যই সাহিত্যগুণ থেকে বিচ্যুত হয় না, হুমায়ূন নির্মিত চলচ্চিত্রে সেটা বেশ উপলব্ধি করা যায়। এক্ষেত্রে এ দেশের একজন প্রথম শ্রেণীর কথাশিল্পীর কথা অবশ্যই উল্লেখ্য, তিনি প্রয়াত জহির রায়হান। সাহিত্যমনস্কতা যথেষ্ট পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তার চলচ্চিত্র প্রচুর দর্শকপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তার বিখ্যাত উপন্যাস ‘হাজার বছর ধরে’ অসাহিত্যিক নির্মাতার হাতে নিশ্চয়ই সাহিত্যিকের শিল্পীত পরিমার্জনার অভাব থেকে যাওয়ারই কথা। জহির রায়হানের চলচ্চিত্র নির্মাণে সম্ভবত সাহিত্যভিত্তিক বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা সত্যজিৎ রায়ের প্রেরণা ছিল অন্তর্নিহিত। (পরবর্তীতে ‘সূর্য দীঘল বাড়ি’র পরিচালনাকেও প্রচ্ছন্ন ছিল সত্যজিৎর প্রভাব) কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ জহির রায়হান বা সত্যজিৎ রায় হতে চেষ্টা করেননি। হুমায়ূনের নাটকের মতো তার

চলচ্চিত্রও ছিল 'হুমায়ূনের চলচ্চিত্র'। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নির্মিত তার চলচ্চিত্রগুলো স্বাধীন বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডটির স্বপ্নের দিগন্তকে স্পর্শ করতে প্রয়াস পেয়েছে তার নিজস্ব ধারাতেই। সাহিত্য, নাটক চলচ্চিত্র সর্বত্রই হুমায়ূন তার নিজস্ব মৌলিক ভাবনা ও মেধাকে প্রয়োগ করে তৈরি করতে চেষ্টা করেছেন 'হুমায়ূনী স্টাইল'। যা তাকে দিয়েছে অনন্য একক এক পরিচিতি, যা একান্তই হুমায়ূন আহমেদের। এইসব বৈশিষ্ট্যই হুমায়ূন হয়ে ওঠেন হুমায়ূন আহমেদ। আর কেউ বা আর কারও মতো নন।

আর এইজন্যই তৈরি হয় হুমায়ূনের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা। সম্ভবত এই কারণেই হুমায়ূনের অকাল প্রয়াণে হুমায়ূনের বহুমুখী কর্মক্ষেত্রটি হঠাৎই অপার এক শূন্যতার জন্ম দিতে পারে। সারা দেশ শোকের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়, একজন বহুপ্রজ্ঞ হুমায়ূন আহমেদের জন্যই। হুমায়ূন আহমেদের শেষ প্রয়াণের অনুষ্ঠানগুলো তাই তার দর্শক, পাঠক, সহকর্মী, গুণগ্রাহী, আত্মীয় পরিজন সব নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত জনতার সমুদ্র হয়ে যায়। অসংখ্য মানুষ ভালোবাসা আর শ্রদ্ধার টানেই আসে প্রিয় মানুষটিকে শেষ অভিবাদন জানাবার জন্য। হুমায়ূনের অনন্ত যাত্রাটি হয়ে ওঠে লাখো মানুষের শ্রদ্ধা-ভালোবাসার অশ্রুজলে সিঁজ।

এদেশে বোধহয় এই প্রথম একজন কথাশিল্পী, নাট্যকার, চলচ্চিত্র নির্মাতা এমন লাখ লাখ ভক্ত মানুষের শোকবার্তায় সিঁজ হয়ে চিরবিদায় নেন। বলতে হয় যেন একজন নয়-বিদায় নিলেন একাধিক সম্মানিত হুমায়ূন।

প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সংবাদ বাহ্যকার ও প্রতিবেদকেরা উচ্ছ্বসিত আবেগের আতিশয্যে নানা বিশেষণ ভূষিত করে তার বিদায়ের ঘটনা ও দৃশ্যাবলির বর্ণনা দিয়েছেন। অনেকে তাকে রাজপুত্র, কেউবা সম্রাট, আবার কেউ মহানায়ক, লেখক অথবা মহামানব আখ্যায় ভূষিত করেছেন। তাকে সমাধিস্থ করার পারিবারিক বিলম্ব সিদ্ধান্তটিকে নিয়ে টিভি চ্যানেলের টকশোয়ের বিজ্ঞজনেরা আলোচ্য আলোচ্য বিষয় করে বিভ্রান্তির জন্মও দিয়েছেন। 'টকশো' টেবিলে কোনো কোনো বক্তা 'বাংলা সাহিত্য এতিম হয়ে গেল' এমনই আশঙ্কা করেছেন। কেউ আবার মনে করেছেন বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পও বোধহয় হুমায়ূনের প্রয়াণের সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করল।

নির্দিধায় বলা যায়, এইসব তখন ফেনিল বিভ্রান্তিকর উচ্ছ্বাস প্রকাশের

'হুমায়ূনের বড় কৃতিত্ব, তিনি শিল্পমাধ্যমের তিনটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ সাহিত্য, টিভি নাটক ও চলচ্চিত্র তিনটি ভিন্নমাত্রা সংযোজন করেছেন। তিনটিতে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখলেও একটি অপরটিকে অতিক্রম করে নি বা একটি অপরটির পরিপূরক হয়ে ওঠে নি। টিভি নাটকে হুমায়ূন ছিলেন তার পূর্ববর্তী ও সমকালীন নাট্যকারদের থেকে ব্যতিক্রমী।

কারণটি হচ্ছে হুমায়ূন আহমেদের অবদান সম্পর্কে অজ্ঞতা। সাময়িক স্বল্পমেয়াদি এইসব শোক উচ্ছ্বাসের অনেক উর্ধ্বেই রয়েছেন হুমায়ূন আহমেদ।

আমরা যারা সাহিত্য-শিল্প অঙ্গনের মানুষ, আমাদের প্রত্যাশা, হুমায়ূন তার কীর্তিতেই বেঁচে থাকবেন সাহিত্য শিল্পের জগতে। সংস্কৃতি অঙ্গনের এক বেগবতী নদীর প্রবহমানতা থেমে গেলেও খাতের অবস্থান থেকে যায় তবু।

তাই পাঠকেরা বারবার পড়বেন হুমায়ূন আহমেদের লেখা প্রিয় বইগুলি, প্রতি বছরই পুনঃমুদ্রিত হবে তার জনপ্রিয় সব উপন্যাস। আমরা আশা করব, হুমায়ূন আহমেদ প্রবহমানই থাকবেন; হারিয়ে যাবেন না।

হুমায়ূনের গল্প-উপন্যাসের যথার্থ মূল্যায়নটি ভবিষ্যতে একসময় নিশ্চয় ই হবে। কেন হুমায়ূন এত জনপ্রিয় হয়েছিলেন, কেন তার তিরোধানে সারা দেশের অসংখ্য মানুষ শোকাভূর হয়েছে, এর প্রকৃত রহস্যটিও উদ্ঘাটিত হবে।

একসময় আহমদ ছফা (হুমায়ূনের ঘনিষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী) হুমায়ূনের মাঝে অমিত, সম্ভাবনার চিহ্ন দেখেছিলেন। হুমায়ূন তার প্রথম লেখা 'শঙ্খনীল কারাগার' ও 'নন্দিত নরকের খ্যাতি থেকে সরে, অন্যরকম খ্যাতির অঙ্গনে পৌঁছে রাখলে, ক্ষুদ্র আহমদ ছফা হতাশ হয়েছিলেন। তিনি বেঁচে থাকলে আজ আহমদ ছফাকে বলতাম— এবার হুমায়ূনের অবদানের নতুন মূল্যায়নটি আপনি করুন আবার একবার। আমি বিশ্বাস করি, হুমায়ূন আহমেদের অবদানের বিস্তারিত, সং ও যথার্থ মূল্যায়নের সময়টি আসবেই একদিন এবং প্রমাণিত হবে জনপ্রিয় হলেই তা বটতলার সস্তা লেখা নয়, সাহিত্যিক মূল্যমানেই তার গুরুত্ব।

রিজিয়া রহমান

হুমায়ুননামা-র জন্যে

স্বাভাবিক হয়ে আসছে সবকিছু, স্বাভাবিক হয়ে যাবে সবকিছু। ব্যাপারটা কেবল সময়ের। আর সব রোগশোক, তর্কবিতর্ক কিংবা জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে হুমায়ুন এখন নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে তার সাধের নৃহাশপল্লীর ছায়া সুশীতল লিচুতলায়। আসলে যা হওয়ার কথা ছিল তা-ই হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সাময়িক মতভেদের পরে তার আকাঙ্ক্ষিত নৃহাশপল্লীতেই চিরকালের জন্যে শয্যা পেতেছে হুমায়ুন। এখানেই সে গুয়ে থাকবে অনন্তকাল। এখান থেকেই ছড়িয়ে যাবে তার সৃষ্টিবীজ। এখানেই চর্চিত হবে তার কীর্তি। হয়তো এখানেই একদিন বাস্তবায়িত হবে তার স্বপ্নধৃত ক্যানসার হাসপাতাল। তবে ...। হ্যাঁ, কিন্তু 'তবে', আর 'কিন্তু'র অস্তিত্ব আছে এখনো। হয়তো থাকবে আরও কিছুকাল। ঠিক কতকাল থাকবে তা বলা মুশকিল। তবে এটুকু বলা যায়, যতকাল তাকে নিয়ে তার নিকটতম স্বজন ও বৈধ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মতানৈক্য থাকবে, ততদিন এই প্রক্রিয়া বিলম্বিত হবে। আমার মনে হয়, যে শুভবোধ তাঁর স্বজনকে তার সমাহিত হওয়ার ব্যাপারে একমত্যে এনেছে, সেই শুভবোধই তাদের মধ্যে আবার প্রার্থিত ঐক্য রচনা করবে।

তা যদি হয়, হুমায়ুন চর্চার পথ অচিরেই সুপ্রস্তুত হবে। এই ঐক্যের জন্যে যেমন শুভবোধের ও সুনীতিচর্চার প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন কিছু আইনী সদাচার। সহজ কথায় বলা যায়, তাঁর বৈধ উত্তরাধিকারী সনাক্তকরণ ও তাদের মতামত গ্রহণ। ইতিমধ্যেই কোনো কোনো পত্রপত্রিকায় তার রচনায় রয়্যালটি সুবিধা আনুপাতিক হারে পাবেন ও ভোগ করবেন। তার ক্ষেত্রে প্রথমেই প্রয়োজন সাকসেসন সার্টিফিকেট তৈরি। এই আইনী ডকুমেন্টই চূড়ান্ত করবে তার বৈধ উত্তরাধিকারীর তালিকা ও তাদের প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশের পরিমাণ। গ্রন্থের বা চলচ্চিত্রের সম্মানী থেকে শুরু করে হুমায়ুনের তাবৎ স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, যা তার নামে আছে, এই সব-কিছুর ক্ষেত্রে এই সাকসেসন সার্টিফিকেট মূল ভিত্তি হয়ে দাঁড়াবে। আসলে কিছুটা অপ্রিয় হলেও বৈষয়িক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এর কোনো বিকল্প নেই। তবে হ্যাঁ, তার যেসব গ্রন্থ বা জমি বা সম্পত্তি তার কোনো সন্তান বা অন্য কোনো প্রিয়জনের নামে আইনসম্মতভাবে প্রদান করা হয়েছে বা হস্তান্তর করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে অন্য উত্তরাধিকারীরা সহজ অধিকার পাবে না। এই ক্ষেত্রে যাকে প্রদান বা হস্তান্তর করা হয়েছে তার সদিচ্ছাই মুখ্য হয়ে দাঁড়াবে। তবে কোনো বিতর্ক সৃষ্টি হলে আইনী মীমাংসা প্রয়োজন হবে। এই আপাত-অপ্রিয় বিষয়টির এখানেই ইতি টানতে চাই, কেননা আমরা শতভাগ বিশ্বাস করতে চাই যে, তার রয়্যালটি বা বিষয় সম্পত্তির বিষয়ে তার বৈধ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কোনো অবাস্তব ঘটনার উদ্ভব হবে না। বরং

হুমায়ূনের সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখা আর তার স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্যে তার স্বজনরা দৃষ্টান্ত মূলক ঐক্য ও সখ্যের সূচনা করবে। কেননা শহীদ মুক্তিযোদ্ধার এই পরিবারে রয়েছে এমন কিছু মানুষ, যারা আমাদের সমাজে তাদের সদাচার ও সুনীতির জন্যে বিশেষভাবে সমাদৃত। হুমায়ূনকে নিয়ে যা-কিছু করা হবে তা যেন পরিবারের সকলের সম্মতিতে করা যায় এই ব্যবস্থাই জরুরি। যতই অসম্ভব মনে হোক, এটি যদি সম্পন্ন করা যায়, তাহলে বাংলাদেশের মতো অনৈতিক ও বিভাজনমুখী সমাজে তা হয়ে দাঁড়াবে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। হুমায়ূনের মহিয়সী জননী ও তার অনুজ মুহম্মদ জাফর ইকবাল এইক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নেবেন, এটাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

এখন কেমন আছে হুমায়ূন?

না, এই উত্তর আর হুমায়ূনের কাছ থেকে পাওয়ার কোনো উপায় নেই। সম্ভব হয়তো স্বপ্নে। তার প্রিয়জনদের কাছে স্বপ্নে ধরা দিতে পারে সে, বলতে পারে তার ভালো থাকা-না-থাকার কথা। আরেকভাবেও হয়তো সম্ভব। সেটি হচ্ছে হুমায়ূনের একটি প্রিয় পদ্ধতি, প্লানচেট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসিন হলে থাকাকালে হুমায়ূন প্রায়ই রাত জেগে জেগে কখনো একা, কখনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে, যৌথভাবে প্লানচেট করতো। হাজির করত প্রয়াত বড় বড় মানুষের আত্মা। রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন থেকে শুরু করে অজানা অচেনা কতিমানুষের আত্মা। তাদের সঙ্গে কথা বলতো সে কুশল বিনিময় করত, এশুয়িক সমাজ ও সভ্যতার সঙ্কট ও সম্ভাবনা সম্পর্কেও মত বিনিময় করত, আমি নিজেও এই ব্যাপারে কিঞ্চিৎ এগিয়েছিলাম। আমার বন্ধু জামশেদুজ্জামান লালী (শিশুসাহিত্যিক, অর্থনীতিবিদ, বাংলাদেশ বাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক) ও আমি বহুরাত জেগে জেগে এই প্লানচেট করেছি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, তেমন একটি প্লানচেটে একজন অচেনা আত্মার কাছ থেকে আমরা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কথা জেনেছিলাম সেই '৬৯-৭০ সালেই। কোনো নির্দিষ্ট আত্মাকে আনতে হলে যে রকম নিষ্ঠা ও গভীরতর মনো-সংযোগ দরকার তা আমরা পরিনি। কিন্তু প্রায়ই শুনতাম হুমায়ূন তার প্রার্থিত অনেক আত্মাকেই হাজির করেছে। এক্ষেত্রে তার সাধনা ও সিদ্ধি আমাদের চেয়ে বহুগুণ বেশি ছিল অবশ্যই। আজ কি আমরা তার ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করব? আমি এর উত্তরে হ্যাঁ-না কিছুই বলব না। তবে আমি নিজে এই পদ্ধতি আর প্রয়োগ করতে চাই না। কেননা পরলোকগত আত্মার ভালো-মন্দ জানার কৌতূহল এই বয়সে এসে আমার তিরোহিত হয়েছে। আমি শুধু জানতে চাই ও বিশ্বাস করতে চাই, যে-জগতে হুমায়ূন গেছে সেখানে সে ভালো আছে, সেখানে সে ভালো থাকবে অনন্তকাল। তার জন্যে আমাদের শুভকামনা ও সমর্থক প্রার্থনাই বড় কথা।

ব্যক্তিগত তর্কাতর্কির পর এই সময়ের মধ্যেই শুরু হয়েছে হুমায়ূনকে নিয়ে ব্যক্তি পর্যায়ে মূল্যায়নের পালাও। কথা শুরু হয়েছে পক্ষে আর বিপক্ষেও। জানি, জীবিত হুমায়ূন হয়তো এ নিয়ে আলোড়িত হতো, কিন্তু লোকান্তরিত হুমায়ূনকে এইসব পার্থিব নিন্দা-ভালোবাসা স্পর্শ করবে না। স্পর্শ করবে তার স্বজনদের, তার অনুরাগীদের আর সমকাল ও উত্তরকালের পাঠক-পাঠিকাদের। এই ধরনের কিছু আলোচনায় আমরাও যৎসামান্য যোগ করতে চাই। প্রথম কথাটি হচ্ছে, হুমায়ূনের জনপ্রিয়তা ও স্থায়িত্ব। হুমায়ূন যে বাংলা ভাষার সর্বকালের একজন জনপ্রিয়তম লেখক এটা কমবেশি সবাই স্বীকার করেছেন। তবে কেউ কেউ, যেমন তসলিমা নাসরিন মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গে হুমায়ূনের তেমন জনপ্রিয়তা নেই। তার প্রকাশকরা শত চেষ্টা করেও পশ্চিমবঙ্গে তাকে জনপ্রিয় করতে পারেননি। সে কারণে বাংলা ভাষাভাষী সব অঞ্চলে হুমায়ূন সমান জনপ্রিয় নয়। এর কারণ কি? নাসরিন এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বাংলাদেশের জনগণ যদি এত বিপুল পরিমাণে অশিক্ষিত আর অর্ধশিক্ষিত না হতো, হুমায়ূন আহমেদের পক্ষে এত বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন সম্ভব হতো না। একবারে ঢালাও মন্তব্য, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণকেই অপমান করা হয়েছে। তারপরই নাসরিন বলেছেন, 'আমিও জনপ্রিয় লেখক ছিলাম এককালে। প্রশ্ন হচ্ছে তখন কি তার মধ্যেও হুমায়ূন আহমেদের বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল, যা বাংলাদেশের তথাকথিত 'অশিক্ষিত আর অর্ধশিক্ষিত' জনগণকে তার প্রতি আকৃষ্ট করেছিল? আর এখন কি তিনি নতুন ও উন্নতর কোনো সাহিত্যিক গুণাবলির অধিকারী হয়েছেন যা বাংলাদেশের সেই 'অশিক্ষিত আর অর্ধশিক্ষিত' জনগণের পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব হচ্ছে না? বিষয়টি আসলে তা নয়। বাংলাদেশের জনগণ, তথা প্রত্যেক দেশের জনগণের মধ্যে মোটা দাগে দুধরনের পাঠকপাঠিকা থাকেন। এক. সরস, ব্যঙ্গপ্রবণ, পরিহাসপ্রবণ, সহজপাঠ্য, কাহিনীমূলক, নাট্যগুণসম্পন্ন ও একপাঠে শেষ করা যায় এমন গল্প-কাহিনীর পাঠক; যারা শুধু পড়তে চায়, উপভোগ করতে চায়, আর এ নিয়ে আর দীর্ঘশ্রয়ী কোনো চিন্তা ভাবনা করতে চায় না। এরা যে আবশ্যিকীয়ভাবে অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত হবেন এমন কথা নেই, বরং এরা সবাই বেশ শিক্ষিত ও পাঠাভ্যাস সম্পন্ন। আমি নাসরিনের যুক্তিটিকে পুরোপুরি ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিতে চাই। কেননা একজন অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত পাঠকের তো যোগ্যতাই নেই হুমায়ূন কোনো বই পাঠ করার। শুধু হুমায়ূনের কেন, অন্য কোনো লেখক, এমনকি নাসরিনের বই পাঠ করার যোগ্যতাও তার বা তাদের নেই। আসলে 'অশিক্ষিত আর অর্ধশিক্ষিত' না বলে বলা উচিত পাঠ-রুচির কথা। যাদের রুচি চিন্তা-উদ্রেককারী গল্প বা অন্য রচনা পাঠের অনুবর্তী নয়, তারাই প্রধানত হুমায়ূনের পাঠক। আর বেশ কয়েক দশকের সাধনায় হুমায়ূন এই পাঠকপাঠিকাদের নিজের দিকে নিয়ে এসেছেন তার অদ্ভুত গল্প বলার ক্ষমতার জান্যে, যা নাসরিন নিজেও স্বীকার করেছেন। আর

জীবদ্দশায় হুমায়ূন নিজেই বলেছে, সে বাংলাসাহিত্যের পাঠকবৃদ্ধি করেনি, সে করেছে তার বইয়ের পাঠকবৃদ্ধি। অত্যন্ত খাঁটি কথা। হুমায়ূনের পাঠকরা অন্য কোনো লেখকের প্রতি ঝুঁকেছেন এমন ঘটনা বিরল। হয়তো ঘটতে শুরু করবে এখন, যখন বাজারে হুমায়ূনের নতুন বই থাকবে না। কে জানে, হয়তো হুমায়ূনের তৈরি ছাঁচকে ব্যবহার করে অন্য কোনো লেখক তার পাঠকপাঠিকার চিত্ত হরণ করবে। তবে সেই লেখককে অবশ্যই হুমায়ূনের মতো নতুন নতুন চমক সৃষ্টি করতে হবে। বলা বাহুল্য, চমক সৃষ্টি করা, চমকে দেওয়া যে তার মূল কৌশল, হুমায়ূন নিজে তা বহুবার বহু সাক্ষাৎকারে বলেছে। তার বই কেন পড়েন সে সম্পর্কে একজন সচেতন পাঠকের বক্তব্য শুনুন, তার উপন্যাস বা গল্প পড়ে খুব বেশি মনে থাকে না। সেগুলোর প্রতিপাদ্য বাস্তব জীবনে খুব কাজে লাগে না। কিন্তু তার গল্প উপন্যাসে যে ভালো লাগাটুকু, সেটাই বা কম কিসে? (প্রিয় যে কারণে/ আশিকুর রহমান/ ১৯ আগস্ট ২০১২)। আমার নিজের অভিজ্ঞতাও তার অধিকাংশ বইয়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ। তবে সবগুলো গ্রন্থের ক্ষেত্রে না। ৩২২টি গ্রন্থের সবগুলোই সমমানের হতে পারে না, অধিকাংশই পাঠরঞ্জনমূলক, কিন্তু 'নন্দিত নরকে', 'শঙ্খনীল কারাগার', 'অচিনপুর', 'জোছনা ও জননী'র গল্পসহ তাঁর অন্তত এককুড়ি গ্রন্থ আছে যা বিষয়ে ও বুননে সমকালীন বাংলাসাহিত্য তাৎপর্যপূর্ণ আসনের দাবিদার। কার চেয়ে ভালো কার চেয়ে খারাপ সেই তুলনায় যাওয়ার আগে আমাদের কোনো সতর্ক কাব্যসমালোচককে তার বাংলাসাহিত্যের একটি সতর্ক পাঠ-সমীক্ষণ সম্পন্ন করতে হবে। তার জন্যে চাই হুমায়ূন চর্চা কেন্দ্র। আর সেটি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নুহাশপল্লী বা অন্যত্র। এই চর্চা কেন্দ্র না থাকলে কোনো ব্যক্তিগবেষকের উদ্যোগে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও এ কাজটি সম্পন্ন হতে পারে।

দ্বিতীয় যে শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার কথা আমার বলতে চাই, তার অবশ্য মননশীল, চিন্তাশীল, বিচক্ষণশীল, এবং একটি রচনা পাঠের পর তার ভেতর এমন সব বিষয় অন্বেষণ করেন যাতে গ্রন্থটি পরবর্তীবার বা বার বার পাঠ করতে হয়। এই শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা সবদেশে সব কালেই অঙ্গুলিমেয়। হুমায়ূন তাদের জন্যে যতোটা লিখেছে, তার চেয়ে বেশি লিখেছে সাধারণ পাঠকের জন্যে, যারা একপাঠে বইটিকে থেকে প্রার্থিত বিনোদন কুড়িয়ে অন্যকে তা হস্তান্তর করতে পারে। একবার আমারও তেমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল। হুমায়ূনের সদা প্রকাশিত একটি গ্রন্থ হাতে আমি কমলাপুর রেলস্টেশন থেকে উঠে চট্টগ্রাম যাওয়া পর্যন্ত একপাঠে বইটি শেষ করলাম। আজ এতোদিন পরে সেই বইয়ের নাম ও কাহিনী আমার মনে নেই। কিন্তু যেগুলোর কাহিনী ও ব্যঙ্গনা এখনো মনের ভিতর গুনগুন করছে সেগুলোকে তুলবো কী করে? একজন লেখকের শ্রেষ্ঠত্ব তার শ্রেষ্ঠ রচনা দিয়ে, তার নিকৃষ্ট খসড়া দিয়ে নয়। নিকৃষ্ট বা সাধারণ

মানের রচনাবলি একজন লেখকের অনুশীলনীমূলক রচনা বা লেখকত্ব বজায় রাখার ধারাবাহিকতা হিসেবে গণ্য। হুমায়ূনের ক্ষেত্রেও অন্যথা হওয়ার জো নেই।

আমাদের মতে, একজন লেখক কতখানি পুরুষতান্ত্রিক বা নারীতান্ত্রিক ব্যক্তিজীবনে সে কতখানি সদাচারী বা ব্যভিচারী, কতখানি ধার্মিক বা পাপী, তার ধনসম্পদের জরুরি বিবেচিত হলেও তার রচনার নান্দনিক মূল্যায়নে প্রয়োজনীয় নয়। জুয়াড়ি বলে একজন দস্তয়ভস্কিকে আমরা লেখক হিসেবে বাতিল করতে পারি না। আমি হুমায়ূনকে আমার কালের একজন তাৎপর্যপূর্ণ কথাসাহিত্যিক মনে করি তার উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিল্পসফল রচনার জন্যে। সে কার চেয়ে বড় বা ছোট সেটি পরে বিবেচ্য। এ নিয়ে সময় সুযোগ মতো আরও বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছে রইল। আর যে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বাঁকবদলময় জীবনযাপন করেছে হুমায়ূন, তাকে মনে করি একটি অভিনব উপন্যাসের বিষয়। হয়ত নতুন প্রজন্মের কারও হাতে রচিত হবে সেই হুমায়ূননামা।

আমরা তার জন্যে অপেক্ষমান।

মুহাম্মদ নুরুল হদা

AMARBOL.COM

নাট্যকার হুমায়ূন আহমেদ

হুমায়ূন আহমেদ অকালে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তার হাজারো বন্ধু, আত্মীয় পরিজন, লাখো পাঠক এবং কোটি ভক্তকুল এখনো এই বিষাদের আবহ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। শহীদ মিনারে আনীত তার কফিনের প্রতি দৃষ্টিপাত করার জন্য সারা ঢাকা মহানগরী যেন সেদিন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। শ্রাবণী বরিষণ যেন বিচ্ছেদের বেদনাকে আরও নিখর, কিন্তু ব্যঙ্গময় করে তুলেছিল।

টেলিভিশনের আনুকূল্যে বাংলাদেশের বাইরের লাখ লাখ বাঙালি সেই দৃশ্য অবলোকন করে একটি বিষয়ে নিশ্চিত বোধ করেছিলেন যে, জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী স্থানটাই হুমায়ূন আহমেদের। অন্তত জীবনাবসান-উত্তর শেষযাত্রা থেকে তা অনুমান করা যায়। ঢাকার শহীদ মিনার থেকে গাজীপুরের নূহাশপল্লীর দৃশ্য সে কথার পক্ষেই সাক্ষ্য দেয়। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'তিথিডোর' উপন্যাসে দু'এক পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুস্থানের যে দৃশ্য এঁকেছেন, তা মনে পড়েছিল আমার, হয়তো আরও হাজার পাঠকের। আর একটি প্রাকৃতিক মিলও কেমন করে মনটা ভিজিয়ে দেয়। সাত দশকেরও কিছু আগে ১৮৪১ সালে সে-ও ছিল এক শ্রাবণ মেঘের দিন।

বর্তমান রচনার জন্য আমার এই প্রাথমিক অনুচ্ছেদকে কিছুটা বাহুল্যমণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত বলে বিবেচনা করতে পারেন। কেউ কেউ, তবে অনুমান করি এর অন্তরে-বাহিরে যে আন্তরিকতা আছে, তা নিয়ে কেউ সংশয় প্রকাশ করবেন না। তা ছাড়া এই লেখার প্রাথমিক ভিত তৈরি করার জন্য আমি এই সূত্র থেকেই একটা প্রাসঙ্গিক বিষয় অবতারণা করতে চাই। উল্লেখ করতে চাই, টেলিভিশনে যে দৃশ্য দেখা গেছে, তার চেয়ে শত গুণ মানুষ বেদনার্ত হয়েছেন, বেদনার্ত হয়েছেন নাগরিক পরিসরের বাইরে গ্রাম-গ্রামান্তরে, অজ পাড়াগাঁয়, লাখো বসার ঘর, শয়নকক্ষ এবং রান্নাঘরে। টেলিভিশনের কর্মীরা নানা বিদগ্ধজনের প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছিলেন যে, সত্তর পেরিয়ে আশির দশকে পড়ার সেই সময়টিতে সমাজে যে পাঠকখরার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, হুমায়ূন আহমেদের বিভিন্ন রচনা ছিল তার বিপক্ষে এক নির্ভুল সদুত্তর। তিনি আমাদের সমাজে পাঠাভ্যাস ফিরিয়ে আনতে বা তা সুদৃঢ় করতে সবচেয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত অনেকগুলো লেখাতেও সেকথা গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। আর পাঠাভ্যাসের প্রকৃতি এমন উদারপন্থী ও সংক্রমণপ্রবণ যে, পঠনের ইচ্ছা যখন পরিণতি পায়, তা আর হুমায়ূন আহমেদ নামে একজন জাদুকরী কথাসাহিত্যিকের

সৃষ্টির পৃষ্ঠায় আটকে থাকে না, তা কবিতায় শামসুর রাহমান-আল মাহমুদের গন্তব্যে যেতে চায়, ছোটগল্পের নেশায় ছুটে যেতে চায় হাসান আজিজুল হকের দিকে, উপন্যাসের ভুবন ভ্রমিয়া ছুঁয়ে দেখতে চায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াস-সৈয়দ শামসুল হক-সেলিনা হোসেনকে, নাটকের জন্য পদবিক্ষেপে সাহসী হয়ে ওঠে সেলিম আল দীনের জটিল ও ধূসর শিকড় সন্ধানে। এই নামোল্লেখ নেহাতই নেতৃস্থানীয় কতিপয় প্রখ্যাতজনের। এর বাইরে, দেশের বাইরের এমনকি সাহিত্যজগতের বাইরের বহু লেখক ও অসংখ্য বিষয়ের লেখা আছে। হুমায়ূন পরোক্ষভাবে সেইসব পঠনেও একটা অদৃশ্য কিন্তু ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন বলে অনুমান করতে পারি। এজন্য সমগ্র সমাজ এবং বিশেষত প্রকাশবন্দ তাঁর প্রতি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবেন। পাঠ এমন একটা বিষয় যা আমাদের সমগ্র সামাজিক উন্নয়নেরও একটি সূচক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এর একটা আবর্তনিক অভিঘাত আমরা অনেকেই অনুভব করতে পারি।

এই যে হুমায়ূনের সুবিপুল পাঠকগোষ্ঠী, তারা তাদের অতিপ্রিয় লেখককে হারিয়েছেন। কিন্তু তার জীবনাবসানের এই এতদিন পরও প্রায় প্রত্যহ এবং বিশেষত ছুটির দিনে আক্ষরিক অর্থেই যে হাজার হাজার মানুষ তাদের মধ্যে বেশ একটা বড় অংশ নারী, যারা অনেকেই তরুণ বা মাঝবয়সী সুবধূ ও প্রৌঢ় পুরুষকুল, নৃহাশ পল্লীতে আসছেন কোন এক গভীর প্রাণের দীর্ঘ যাকে শুধু কবর জিয়ারত ক্রিয়া ও নৃহাশ উদ্যান দর্শন হিসেবে গণ্য করা যায় না বলে আমি মনে করি, তাদের অধিকাংশই তো এমন বিদ্যার্জনের সুযোগ পায় নি যার দ্বারা তারা হুমায়ূনের বই পড়তে পারেন। সম্ভবত এমন শিক্ষাবঞ্চিত সাক্ষরতা-দক্ষতাবিহীন অপাঠক কিন্তু তার প্রশ্নাতীত ভক্তরাই সংখ্যায় অনেক বেশি। এরা হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্য সম্পর্কে একেবারে জানেন না, তা কিন্তু নয়। এদের মধ্যে অনেকে হুমায়ূনের বহু কাহিনী প্রায় নিখুঁতভাবে দৃশ্য পরম্পরায় বলে যেতে পারেন। তাদের প্রিয় লেখকের মৃত্যুর পর অনেকেই সেইসব দৃশ্যের স্মৃতিচারণা করেছেন, কারও একটু ভুল হলে অন্যজন বা কয়েকজন তা ধরিয়ে দিয়েছেন। সাধারণ বা আভিধানিক অর্থে এমন লাখ লাখ মানুষ হুমায়ূনের 'পাঠক' নন। হুমায়ূন আহমেদের জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে, সেই বিগত শতাব্দীর শেষ দশকের প্রথম ভাগে ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মিছিল ও সমাবেশ, সেখান থেকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছিল বাকের ভাইকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না। বাস্তবে নয়, কথাসাহিত্যের কাহিনীর ধারাক্রম বা পরিণতিতে তা করা যাবে না। এমন দাবিতে সামাজিক সমাবেশ বা আন্দোলন করার ঘটনা আর কোথাও ঘটেছে বলে আমাদের পরিজ্ঞাত নয়। ঠিক ওই সময় আমি কিছুদিনের জন্য বিদেশে অবস্থান করছিলাম। তখনো অনলাইনে পত্রিকা পাঠের সুযোগ গড়ে ওঠেনি। জার্মানির রাজধানীতে বসবাসরত বাঙালিদের কাছ থেকে ওই সংবাদ শুনে আমি রীতিমতো

বিস্মিত হয়েছিলাম। বাকের ভাইকে বাঁচিয়ে রাখার সপক্ষে যারা রাস্তায় নেমেছিল, তাদের রাজনৈতিক আনুগত্য যা-ই থাক, তাদেরকে আওয়ামী লীগ বা বিএনপির সমর্থক হিসেবে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যাবে না, তাদের সম্মিলিত করার জন্য মাথাপিছু বিশ বা পঞ্চাশ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ছিল না, তারা অধিকাংশই সম্ভবত ছিল 'কোথাও কেউ নেই' গ্রন্থের অপাঠক এবং সাধারণভাবে পাঠ ক্ষমতা রহিত।

আবার উল্লেখ করতে চাই, হুমায়ূন আহমেদ সৃষ্ট পাঠাভ্যাসের বাইরে থাকা জনসংখ্যাই তাঁর কৃতি ও সাহিত্যের সঞ্চার ভক্ত। এরা টেলিভিশনের পর্দায় তাঁর কাহিনীর উপস্থাপনার একনিষ্ঠ দর্শক। এই অপাঠক এবং পাঠক সবাই মিলে হুমায়ূনের নাটক দেখেছেন ছোট পর্দায়, গভীর অনুরাগে। সেসব কাহিনী নিয়ে তখনই আলোচনা-পর্যালোচনায় মেতে উঠেছেন এবং তার মৃত্যুর পর সবাই মিলে আবার স্মৃতিকাতর হয়ে উঠেছেন। টেলিভিশনে সেইসব পরিবেশনা তখন এবং অদ্যাবধি 'নাটক' হিসেবে পরিচিতি পেয়ে আসছে। শুধু হুমায়ূনের নয়, আরও খ্যাত-অখ্যাত বহুজনের কাহিনীও এমন অভিধা অর্জন করেছে। বিগত কয়েক বছরে দেখা যাচ্ছে, কখনো গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হবেনা এমন পূর্বসিদ্ধান্ত নিয়েই টেলিভিশনে প্রদর্শনের জন্য অকাতরে নির্মিত হচ্ছে নাটক। এই এখানে ঢাকায় আর ওই ওখানে ফালকাতায়। আর এর জন্য বিভিন্ন চিহ্নায়ন ব্যবহার করা হচ্ছে। টিভি-নাটক, টেলিনাটক, প্যাকেজ নাটক, পর্বভিত্তিক ধারাবাহিক ইত্যাদি। হুমায়ূন আহমেদ প্যাঠাস সৃষ্টি করতে এক অসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন, সে কথা অনস্বীকার্য, কিন্তু আম-জনতার কাছে তাঁর সুবিপুল পরিচিতি নাট্যকার বা আরও বিশেষায়িত কবি বললে টিভি নাট্যকার ও নির্দেশক হিসেবে। এবং অবশ্যই তাঁর কাহিনী অবলম্বনে নির্মিত ও তাঁর নির্দেশিত চলচ্চিত্রের সঙ্গে ব্যাপক জনসাধারণের পরিচিতি অনেক ব্যাপক দেশে ও বিদেশে। বিদেশে যাবার সময়, আমরা অবধারিতভাবে আমাদের পরিচিত বাঙালি বন্ধুবান্ধবদের জন্য হুমায়ূন আহমেদের এইসব নাটক ও ছায়াছবির ডিভিডি নিয়ে যাই উপহার হিসেবে। এবং প্রবাসীদের কাছে এসবের কদরও বেশ বেশি।

কিছুটা বন্ধুতার অন্তর্গত চাপে, কিছুটা বিস্তৃত গৌরচন্দ্রিকা রচনার অভিপ্রায়ে, কিছুটা আলোচনা-পর্যালোচনা সূচনাবিন্দুতে পৌঁছানোর নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় অনেকটা অংশ পেরিয়ে এখন আমার এই রচনার কেন্দ্রে পাঠকদের সম্ভাষণ জানাতে চাই। পাঠক, অপাঠক, অন্ধ ভক্ত, চোখ-খোলা অনুরাগী, মিত্র-অমিত্র, পরিচিত-অপরিচিত, গুণমুগ্ধ ও সমালোচক, এমন সব ধরনের মানুষের কাছে হুমায়ূনের যে পরিচয়ই থাকুক না (যেমন, আমার কাছে হুমায়ূনের আলাদা একটা পরিচয় হলো, তিনি ছিলেন মানব-সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে এক উৎসাহী ও অক্লান্ত পাঠক।) 'নাট্যকার' হিসেবে তাঁকে আমরা সাধারণত পৃথকভাবে গণ্য করি না। যে অর্থে আমরা মুনীর চৌধুরী, আনিস

চৌধুরী, সেলিম আল দীন, সৈয়দ শামসুল হক, আবদুল্লাহ আল মামুন বা মামুনের রশীদকে গণ্য করে থাকি। এর মাধ্যমে আমরা স্পষ্টতই টিভি-নাটকের সঙ্গে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত নাট্যসাহিত্য বা বিভিন্ন গোষ্ঠী কর্তৃক প্রযোজিত ও পরিবেশিত মঞ্চনাটকের পৃথক বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছি। কলকাতায় বা পশ্চিমবঙ্গে একটা প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন নাট্যকাররা। প্রধানত মঞ্চের প্রয়োজনে বা মঞ্চপ্রযোজনার বিষয়টা মাথায় রেখে এবং নাট্যসাহিত্য ভুক্তির যোগ্যতাকে অগ্রাধিকার বা দিয়ে যারা নাটকের পাঠ না text বা sub-text রচনা করেন, তাদের আলাদাভাবে নাট্যকার হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস লক্ষ করা গেছে। এর মধ্যে যা বিশেষভাবে বিবেচনার তা হলো, এমন 'নাট্যকার' মঞ্চভাবনা বা থিয়েটার কলাকৌশল এবং নাট্যকলার পরিবেশনা (performing) গুণের প্রতি সর্বদাই মনোযোগী। কাহিনী নিয়ে প্রাথমিক চিন্তা ভাবনার সময়ই তিনি নাট্যরূপের ছক পরিকল্পনা করেন। রবীন্দ্রনাথকে আমরা 'নাট্যকার' বলি না, যদিও তিনি অনেক নাটকই রচনা করেছেন শুধু পরিবেশনার বিষয়টি নয়, দিনক্ষণ মাথায় রেখেও। কারণ, কাহিনী সঞ্চারের জন্য তাঁর মনোযোগের একাগ্রতা ছিল উপস্থাপনার দৃশ্যরূপের তুলনায় অধিক গভীর। হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্য বিচারে আমাদের এই জায়গাটিতে একটা সঙ্কটের মধ্যে পড়তে হয়। তাঁকে আমি কোনোভাবেই নাট্যকার বলতে পারব না কারণ তিনি মঞ্চভাবনার প্রতি তাঁর আকর্ষণ তেমনভাবে প্রতিফলিত করেননি।

আমার মনে পড়ে, বেশ কয়েক বছর আগে আমি ব্যক্তিগতভাবে এই প্রশ্নটা পেড়েছিলাম তাঁর সঙ্গে, তাঁর উত্তর। আমাদের সেই স্বল্পদৈর্ঘ্য সংলাপের সারকথাটা ছিল এরকম। সদা স্পষ্টবাক হুমায়ূন আহমেদ আমাকে জানানেন যে, মঞ্চনাটক বিষয়ে তাঁর উৎসাহ প্রবল নয়, অন্তত নিজের লেখাকে মঞ্চে পরিবেশনার জন্য নির্দিষ্টভাবে প্রস্তুত করার বিষয়ে। কারণটা খুবই সুস্পষ্ট ও অপকট। তিনি বলেছিলেন, সবাই মিলে কত রকমের পরিশ্রম করে অনেকদিন মহড়া দেওয়ার পর নিজেদের সময় ও অর্থ ব্যয় করে আমরা যে মঞ্চনাটক বানাই, তা খুবই সফল হলেও, পঞ্চাশ সন্ধ্যা অভিনীত হওয়ার পরও, যত মানুষ এটা দেখেন, একবার টেলিভিশনে প্রচারিত হলেই দর্শকসংখ্যা দাঁড়ায় তারও চেয়ে বহুগুণ বেশি। হুমায়ূনের ওই মন্তব্যের মধ্যে যে বাস্তব যুক্তি আছে, তার বিপরীতে বলার মতো আমার কিছু ছিলনা। কিন্তু মঞ্চনাটক ও আর ভাবনার সঙ্গে যেহেতু আমার নাড়ির টান, তাই আমি কিছুটা কষ্ট পেয়েছিলাম। এই জন্যে যে, হুমায়ূনকে মঞ্চনাটকের সীমানায় আনতে পারলাম না এবং ওকে নিয়ে আমাদের কর্মকাণ্ডের গতিশীলতা বা জনপ্রিয়তা বাড়ানোর কোনো সম্ভাব্য সুযোগ নেই।

আরও একটা বিষয় আমাদের বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই যে হুমায়ূনের অনেকগুলো উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রস্তুত করা হলো, আবশ্যিকভাবেই টেলিভিশনের

পর্দায় প্রদর্শনের জন্য, সেই চিত্রনাট্যও আলাদা করে প্রকাশ করার কোনো আন্তরিক তাগিদ দেখা যায় নি তাঁর মধ্যে। টেলিভিশনের পরিবেশিত অত্যন্ত জনপ্রিয়, সুনির্মিত, সুপরিষ্কৃত যেসব কাহিনী ও বহুদিন ধরে প্রচারিত ধারাবাহিক সৃজনশীল সাহিত্যের যথার্থ অঙ্গ হয়ে উঠতে পারত, সেইগুলোরও কোনো মুদ্রিত ও প্রকাশিত নাট্যরূপ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। লেখক নিজে যদি এবিষয়ে যথাবিহীন উৎসাহ প্রদর্শন করতেন, তাহলে তাঁর জনপ্রিয়তার নিরিখেই প্রকাশকবৃন্দ এই কাজে এগিয়ে আসতেন। কিন্তু ব্যাপারটা তো সেভাবে ঘটেনি। ক্যামেরাবন্দি করে ছোট পর্দায় মানবজমিনের নানা বিচিত্র রেখাঙ্কনে হুমায়ূন আহমেদের যে আত্মহ ছিল, নাট্যসাহিত্যে অবদান রাখার বিষয়ে তিনি সে রকম মনোযোগী ছিলেন না। মঞ্চনাটক, বলতে চাইছি বাংলাদেশের বা ঢাকার মঞ্চনাটক, বিষয়ে হুমায়ূন আহমেদ বিশেষভাবে আকর্ষণ বোধ করতেন, এমন তথ্য আমাদের জানা নেই। তিনি যে এর দ্বারা মঞ্চনাটকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহুজনের উদ্যোগ সম্পর্কে উদাসীনতা প্রদর্শন করছেন বা প্রত্যাখ্যান জ্ঞাপন করেছেন সেকথা হয়তো বলা যাবে না। মঞ্চনাটকের অনেক তারকাকে তিনি টিভি নাটকে এবং তাঁর নির্মিত ও নির্দেশিত চলচ্চিত্রে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সাধারণভাবে সংস্কৃতি জগতে আমাদের মঞ্চনাটকের দায়বদ্ধতা, সম্মিলিত উদ্দেশ্য, অতীত ঐতিহ্য ও আধুনিকতার সংমিশ্রণ বিষয়ে অনেকেই প্রশংসা করলেও হুমায়ূন আহমেদকে মধ্যে এসে আমাদের নাটক উপভোগ করতে দেখিনি। আমার প্রশংসনীয় বন্ধু যারা নাটকে কাজ করেন, তাদের জিজ্ঞেস করেও জেনেছি, হুমায়ূন নাটক দেখতে আসতেন না। হতে পারে, তিনি ভিড় পছন্দ করতেন না, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো তাঁর 'জনতার জঘন্য মিতালী' ভালো লাগত না। যাই হোক, মঞ্চনাটকের ক্ষেত্রে তাঁর কোনো দৃষ্টিগ্রাহ্য সখ্য গড়ে ওঠেনি।

তাই সারা দেশে, ভারতে ও বিদেশে বহু অঞ্চলে হুমায়ূন আহমেদের নাটকের লাখো অনুরাগী ও গুণগ্রাহী থাকলেও তাঁর রচিত নাটক বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রাথমিক রসদ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে বাজারে আছে একটি মাত্র পুস্তক। গ্রন্থের নাম 'স্বপ্ন ও অন্যান্য মঞ্চ নাটক সমগ্র'। গ্রন্থের নামের সঙ্গে 'সমগ্র'-বাচক একটা ব্যাপ্তিসূচক শব্দের অবস্থান সত্ত্বেও এই বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র ১৬৩। সময় প্রকাশন থেকে বের হওয়া এই বইটিতে বিভিন্ন আয়তনের নাটক আছে মোট ছয়টি। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারির বইমেলায়। অদ্যাবধি এই গ্রন্থের কোনো দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয়নি। হুমায়ূন আহমেদ রচিত কোনো গ্রন্থ সম্পর্কে এ এক অবিশ্বাস্য তথ্য।

লেখক নিজে যে বইটার শিরোনামে 'মঞ্চনাটক' শব্দবন্ধনির বিশেষায়িত বিশেষ্য জুড়ে দিলেন, তা থেকে যে বিষয়টা স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, তা হলো, তিনি নিজে এটাকে আলাদা করে দেখতে চাইছেন। তিনি যেমন সাধারণভাবে পরিচিত ও স্বীকৃত

‘নাটক’ বলতে পাঠকরা যা বোঝেন, তা থেকে একটা প্রয়োগিক দূরত্ব সৃষ্টি করছেন ‘মঞ্চ’ শব্দটি জুড়ে দিয়ে, তেমনি তিনি সচেতনভাবে ‘জনপ্রিয়’ টিভি নাটক থেকেও একটা স্বতন্ত্র অবস্থানকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। তাঁর এই সচেতন প্রয়াসটা যুক্তিযুক্তভাবে অনুধাবন করা যায়। তিনি নিজেই টেলিভিশনে পরিবেশিত নানা নাটকের মাধ্যমে এক ধরনের পরিশীলিত জনরুচি এবং দর্শক-প্রত্যাশা সৃষ্টি করেছিলেন। এই গ্রন্থস্থিত নাটকসমূহ ঠিক তার সঙ্গে অভিপ্রেত যুগলবন্দি রচনা করতে পারে না। কিন্তু পরিবেশনাগত ব্যাপকরণ ও পরিকল্পনার দিক থেকে তা যে আবশ্যিকভাবে এবং চরিত্রগতভাবে ভিন্ন, আমি নিজে তা মনে করি না। কিন্তু গঠনপ্রক্রিয়ায় ভিন্নতাকে সহজেই শনাক্ত করা যাবে এবং রচয়িতার দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতাও এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশে, বিশেষত ঢাকা মহানগরীতে মঞ্চনাটকের দৃশ্যমান সফলতার পরও আমাদের মধ্যে এই গ্রন্থস্থিত নাটকের প্রযোজনা তেমন দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে ওঠেনি। অথচ তিনি নিজেই তো বাংলাবাজার এবং টেলিভিশন পাড়ায় বারবার নিজের জনপ্রিয়তার মাত্রা অতিক্রম করে যাচ্ছেন। মঞ্চনাটকের বেলায় যে তাঁর সবিশেষ ঘাটতি রয়েছে, তা পূরণে হুমায়ূন আহমেদ অন্তর্গতভাবে দৃষ্টিবোধ করেননি। অবশ্য তিনি একবার অন্তত তাঁর নাটকের মঞ্চ প্রযোজনার বিষয়ে বেশ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। এ বিষয়ে একটু পরে আলোচনা করব।

‘স্বপ্ন ও অন্যান্য মঞ্চ নাটক সমগ্র’ প্রবন্ধের জন্য হুমায়ূন আহমেদ একটা অতি-ক্ষুদ্র ভূমিকা লিখেছিলেন। সাহিত্য পর্যালোচনার বিচারে এটাকে ভূমিকা হিসেবে চিহ্নিত করা সমীচীন নয়। লেখক নিজেও তা করেন নি, আবার ‘লেখকের কথা’— এমন কোনো কিছুও বলেননি। অন্য অনেক রচয়িতার ভূমিকার ক্ষেত্রে যে হালকা একটা মেজাজ দ্রষ্টব্য, এখানেও তা আছে। হুমায়ূনের নিজস্ব ওই বাক্যকতিপয়ের বিচার-বিবেচনার মধ্য দিয়েই আলোচনায় আলোকপাত করা সহজ হয়ে উঠবে।

যশোহরে একবার নাটকের উপর একটি সেমিনার হলো। সেমিনারের বিষয়বস্তু ‘বাংলাদেশে মঞ্চনাটক : সংকট হিসাবে যে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করলেন তার একটি হচ্ছে—হুমায়ূন আহমেদ’। আমি মন খারাপ করে তাঁর বক্তব্য শুনলাম। তিনি যদি বলতেন, আমি নাটক লিখতে পারি না, যা লিখেছি সবই পা-ধোওয়া পানি, তা হলেও এতটা খারাপ লাগত না। আমি কেন মঞ্চনাটকে সংকট সৃষ্টি করব?

ঢাকায় একটি সেমিনার হলো। খুব নামি-দামি বক্তারা সেখানে অংশ নিলেন। সেই সেমিনারে বলা হলো, আমি টিভি নাটকে সঙ্কট সৃষ্টি করেছি। অতি হালকা জিনিসে দর্শকদের অভিযুক্ত করে ফেলেছি বলে দর্শকরা এখন আর ভালো নাটক গ্রহণ করছে না।

এই অবস্থায় মঞ্চনাটক সমগ্র বের করতে হলে দুঃসাহস লাগে। আমার তা নেই, তবে আমার প্রকাশকের আছে। সময় প্রকাশন-এর ফরিদ এই কাজটি করল। তাকে তার সাহসের জন্য ধন্যবাদ।

হুমায়ূন আহমেদের এই চটুল ভঙ্গির ব্যঙ্গনাকে বিশ্লেষণ করেই তার নাটক বিষয়ে আলোচনা মূল্যবান হয়ে উঠবে। তার আগে, প্রাসঙ্গিক সূত্রেই অন্য এক ধরনের অভিজ্ঞতার কথা এখানে সংযোজন করতে চাই। ঢাকাতে বেসরকারি উদ্যোগ ও সমষ্টিক প্রচেষ্টায় এক বছরের সময়সীমার একটি নাট্যপ্রশিক্ষণ কোর্স দেওয়া হয় একটি প্রতিষ্ঠানে। মঞ্চনাটকের সঙ্গে যুক্ত গুণী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির এখানে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পাঠ দান করেন। ব্যক্তিগতভাবে আমিও এখানকার একজন নিয়মিত শিক্ষক। প্রতিষ্ঠানটির নাম 'থিয়েটার স্কুল'। ভর্তির জন্য অনেক ছেলেমেয়ে আবেদন করে। তাই একটা নির্বাচনী পরীক্ষা নিতে হয়। সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয় বা এখরনের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা এই প্রশিক্ষণে আগ্রহ প্রদর্শন করে। বিভিন্ন প্রশ্নের মধ্যে প্রায় অনিবার্য একটা বিষয়ে তাদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়। যখন জিজ্ঞেস করা হয়, বাংলাদেশের একজন প্রধান নাট্যকারের নাম বলো বা কোনো নাট্যকারের নাটক দেখেছো, তখন একটা স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর পাওয়া যায়, হুমায়ূন আহমেদ। একথা

অনস্বীকার্য যে, ঠিক এই উত্তরটি আমাদের সন্তুষ্ট করে না ও নাটকের দ্রুপদী এবং আধুনিক উভয় সংজ্ঞায়নের দিক থেকে আমরা এই উত্তরকে যথাযথ বলে বিবেচনা করি না। বছরের পর বছর ধরে এই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ক্রমচলমান।

হুমায়ূন আহমেদকে 'নাট্যকার' হিসেবে চিহ্নিত করার উত্তরটাকে আমরা গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করি না, কারণ, তিনি প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য ও মঞ্চায়নের দিক থেকে নাট্যসৃজনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেননি। আর টেলিভিশন নাটক নামক একটি বিশেষ শাখায় তাঁর জনপ্রিয়তা। এতটাই শীর্ষে যে, শিক্ষার্থীরা নাট্যকার হিসেবে তাঁর নাম উচ্চারণে যথাযথভাবেই প্ররোচিত বোধ করে। যশোরে অনুষ্ঠিত সেমিনারে প্রবন্ধপাঠক যখন এমন কোনো মন্তব্য করেন এবং যেটাকে হুমায়ূন বলছেন বা মনে করছেন তার নিজের দ্বারা সৃষ্ট সঙ্কট, তখন থিয়েটার স্কুলে আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সেটাকে সমস্তকাল বলে বিবেচনা করতে হবে। সাধারণ ভাবে যখন টেলিভিশনে প্রচারিত কাহিনীকে 'নাটক' বলা হয়, আমরা তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক দিক থেকে তা মানতে পারি না। থিয়েটার বা মঞ্চ দৃশ্যসংস্থান, আলোকসম্পাত, মঞ্চ কুশীলবদের স্থানিক সংস্থাপন এবং বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর (props) পরিকল্পনা ও মঞ্চ তার বিন্যাস প্রভৃতি বিষয়ে একটা আলাদা সংগতি রচনা করতে হয়। টেলিভিশন নাটক

বলতে যা বোঝায় তার মধ্যে এসব বিষয়ের বিবেচনা অগ্রাধিকার পায় না। যাকে আমরা টিভিনাটক হিসেবে চিহ্নিত করি এবং বহুদিনের প্রাত্যহিক বহু অবলোকনে যেটা একটা আলাদা শাখার মর্যাদা লাভ করেছে, তার সঙ্গে নাটকের চেয়ে চলচ্চিত্রের যোগ বেশি। চলমানতার যে উপাদান স্বতন্ত্র নামের মধ্যেই বিধৃত, তা থেকে বিষয়টা বোঝা যাবে। মঞ্চনাটকে আমরা গাড়ি, বাস বা ট্রেন চলাচলের দৃশ্যের ওইটুকু সংযোজনই করতে পারি, যাতে ওই ক্রিয়া বা চলমানতা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া যায়। দৃশ্যান্তরে যানবাহনের গন্তব্যে একটি স্থান দেখাতে পারি। কিন্তু কয়েক মিনিট ধরে গাড়ি চলছে, অভিনেতারা তার মধ্যে কথোপকথন চালিয়ে যাচ্ছেন, এমন ব্যবস্থা চলচ্চিত্রের বেলায় মানিয়ে যায়, নাটকে সাংকেতিক উপস্থাপনা ব্যতীত তা বেমানান। আর পরিবেশনার দিক থেকে এমন চলমান ও গতিশীল এবং নাটকের অভ্যন্তরীণ সংঘাত ও স্থানগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি সততই উদাসীন উপস্থাপনাকে আমরা নাটক বলে বিবেচনা করব না।

টেলিভিশনে যে কাহিনীগুলোকে নাটক নামে প্রচার করা হয় তার মাধ্যমে ওই শাখার নিজস্ব প্রযোজনার চরিত্রে পরিবর্তন সূচিত হয় এবং ওই পরিবর্তিত সংজ্ঞাই ইলেকট্রনিক মাধ্যমের বিপুল আত্মসী শক্তির চাপে সমাজে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। নাটক তার আদি কৃতি ও চরিত্র নিয়ে টিকে থাকার জন্য হুমকির সম্মুখীন হয়। টেলিভিশনের জন্য যারা নাটক লিখেছেন তাঁরা এভাবেই টেলিভিশন নাটক বা মঞ্চ পরিবেশনার জন্য সঙ্কট সৃষ্টি করেছেন। একথা তো এখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, অনেকে শুধুই টিভি নাট্যকার। নাটক রচনায় তাঁদের প্রাথমিক বিবেচনা উপলক্ষ (সৈদ, রবীন্দ্র জয়ন্তী, ভালেন্টাইনস ডে), বিশেষ চ্যারেক্টার (যেখানকার কর্মকর্তা বা প্রযোজককে চিত্রনাট্যটি বিক্রি করা সহজ হবে) এবং চরিত্রাভিনেতা (কে কতটা জনপ্রিয়) ইত্যাদি। হুমায়ূন আহমেদ টেলিভিশনে প্রচারিত 'নাটক' রচনা ও নির্দেশনায় মানুষকে আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে প্রায় জাদুকরী সাফল্য প্রদর্শন করেছেন। এজন্য তাঁর গুণ ও নিষ্ঠার প্রশংসা করতেই হবে। এবং স্বাভাবিক কারণেই তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে টিভি নাট্যকারদের একটা প্রবল প্রজন্মই তৈরি হয়ে গেল, যারা চটুলতা, অনুসৃতিপ্রবণতা ও শিল্পসৃজনে আপোসকামিতায় প্রায় নেশাগ্রস্ত হয়ে উঠল। হুমায়ূন আহমেদ কথিত সঙ্কটের কথাটা এখন বোঝা যাচ্ছে বোধহয়। এর জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ক্যামেরা, কম্পিউটার ও ক্যাবল অপারেশন, সবকিছুরই দায় আছে, শুধু টিভি নাট্যকারবৃন্দের নয়। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বহু অঞ্চলে সিনেমার প্রেক্ষাগৃহের অস্তিত্বে মড়ক লেগেছে। বাড়িতে বসে টিভির ছোট পর্দায় সব ছবি দেখা যায়। আর ডিভিডি প্রযুক্তি সহজলভ্য ও স্বল্পমূল্য হয়ে ওঠার কারণে সিনেমা ব্যবসায় দুরারোগ্য ধস নেমেছে। থিয়েটারের জন্যও এটা একটা ধ্বংসপ্রবল হুমকি, যা মঞ্চনাটককে বিপন্ন করে তুলেছে। কিন্তু নাট্যকর্মীরা এমন প্রবল ইলেকট্রনিক আত্মসনের বিরুদ্ধে নিজেদের শক্তি দিয়ে লড়ে

যাচ্ছে। অস্তিত্বের সঙ্কটের মোকাবিলা করছে। তারা সমাজ ও শিল্পের প্রতি দায়বদ্ধতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং ভেতরে-বাইরে সর্বদা একটা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। একথাটাও স্বীকার করতে হবে।

এই আলোচনার জন্য আমার কাছে প্রাথমিক সূত্র হিসেবে হুমায়ূন আহমেদের যে বইটি রয়েছে, তার ভিত্তিতে নিশ্চিত করে বলতে পারছি না যে, ছোট-বড় মিলিয়ে এই ছয়টি নাটকের মধ্যে কোনটি কোন সালে লেখা হয়েছিল। তেমন কোনো তথ্য বা পরিচিতি দেওয়া নেই এই গ্রন্থে। সুতরাং নাট্যকার হুমায়ূনের বিবর্তন বিষয়ে কোনো অভিমত প্রকাশ করা যাচ্ছে না। লেখক যে কেন এগুলোকে আলাদা করে মঞ্চনাটক বলছেন, সে বিষয়ে আমার ভাবনা আগেই উল্লেখ করেছি। মঞ্চনাটকের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে যতটুকু প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ করতে পেরেছি তা হলো, 'মহাপুরুষ' এবং 'নৃপতি' এই দু'টি নাটক মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। তার মধ্যে প্রথমোক্ত নাটকটির সঙ্গে মঞ্চের যোগটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক গ্রহিত বা প্রকাশিত হওয়ার আগেই হুমায়ূন আহমেদ এই নাটকটি একটি দলের মঞ্চায়নের জন্য রচনা করেছিলেন। এই তথ্য আমাদের জন্য সত্যিই সদর্শক। নাটকটির প্রযোজনা করেছিল ঢাকার খ্যাতনামা একটি দল, নাট্যজন। নির্দেশনা দিয়েছিলেন একজন কৃতী অভিনেতা-পরিচালক কেরামত মাওলা।। নাট্যজনের প্রধান তবিবুল ইসলাম বাবু ও নির্দেশকের সঙ্গে আলাপচারিতায় যা জেনেছি তা বেশ স্বস্তি দায়ক ও আনন্দের। তারা দু'জনেই জানিয়েছেন যে, হুমায়ূন এই নাটকটির মঞ্চায়ন নিয়ে খুবই রক্ষণশীল ছিলেন। নাট্যজনের আর এক কর্ণধার মমতাজ উদ্দিন আহমদ কিছু কিছু জায়গায় পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন, তাতে তিনি সম্মতি দেন নি। নির্দেশক পাণ্ডুলিপির কাঠামোর মধ্যে রেখেই পরিবেশনায় পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছেন। এই নাটকে হুমায়ূন আহমেদ মনে করেছেন কালের নিয়মে বিভিন্ন বিরতিতে বিভিন্ন স্থানে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়; তিনি এমন একজন মানুষ যিনি সাধারণের চেয়ে বিশেষভাবে আলাদা এবং সমকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্ণে তাঁর জীবনের পরিণতিও প্রত্যাশিত চরিত্রের হয় না।

প্রচলিত নাটকের আদলে হুমায়ূন আহমেদ তাঁর নাটকের প্রারম্ভে কোনো চরিত্রলিপি প্রদান করেন না। 'মহাপুরুষ' নাটকটিতে সর্বমোট নয়টি দৃশ্য আছে। নাট্যকার যে মঞ্চের বিষয়টা বিবেচনায় রেখেছিলেন তা নাটকের শুরু থেকেই বোঝা যায়। একজন ভিখারি সুর করে ইসলামি গান গেয়ে মানুষের কৃপা প্রার্থনা করছে। সুরটা বেশ ছন্দময় ও পরিচিত এবং এমন শুরুতেই সাদা চাদর গায়ে দীর্ঘদেহী ব্যক্তি প্রবেশ করেন। তার জন্য কোনো নাম বরাদ্দ করেন না নাট্যকার। তিনি মহাপুরুষ। ওই ভিখারির একটা ৮/৯ বছর বয়সী মেয়ে আছে। তাদের কথোপকথনে নাটকীয়

সংলাপের মজাটা বেশ অনুভব করা যায়। প্রকৃতপক্ষে হুমায়ূন তাঁর কথাসাহিত্যের পাতায় অনুরূপ বহু বিনোদনময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন। এর পর রমিজ (বয়স ৪৫/৫০) প্রবেশ করে। সাদা চাদর পরিহিত ব্যক্তি নিজেই ঘোষণা করেন যে,, তিনি একজন মহাপুরুষ। রমিজের সঙ্গে তার সংলাপও বেশ নাটকীয় কিন্তু প্রধানত কৌতুককর। এই নাটকে অন্য যেসব চরিত্র আমরা দেখতে পাই, তারা হলো, ফরিদ, আধুনিক কালের এক যুবক, পরিস্থিতির শিকার হয়ে সে সহিংসতার পথ বেছে নিয়েছে, রমিজের পুত্র সে। আছে ফরিদের সমবয়সী জামিল, সেও ফরিদের মতো একই প্রকরণে ব্যাধিগ্রস্ত। দ্বিতীয় দৃশ্যে ফরিদ দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটা সুদীর্ঘ সংলাপ উচ্চারণ করে। তা থেকে বর্তমান সমাজের সঙ্কট ও সংশয় বিষয়ে আঁচ করা যায়। একটা পরিবারের দৃশ্য দেখতে পাই আমরা। বাবা, এক বিপথগামী পুত্র, দুই বোন-তার মধ্যে যে জন বিবাহিতা সে স্বামীগৃহের অত্যাচারে পিড়ালয়ে ফিরে আসে, অবিবাহিতা তরুণী লীনা মহাপুরুষের গল্প শুনে তাকে যে-কোনো মূল্যে তাদের বাড়িতে আনার জন্য হন্যে হয়ে ওঠে, আছে কাদের নামের এক গৃহভৃত্য। হুমায়ূনের কাহিনী সংগঠনের নিজস্ব অবয়বটা সহজেই আবিষ্কার করা যায়। মহাপুরুষ হিসেবে যাকে চূড়ান্তভাবে দেখা যায়, তিনি দরিদ্র শিক্ষক, টিউশনি করে দিনযাপনেই খুশি। কিন্তু ফরিদ আত্মরক্ষায় ও ঘৃণ্য কৌশলে তাকে জামিলের খুনি সাব্যস্ত করে দেয়। নাটকে এমন সব দৃশ্য আছে, যা বাস্তব ও প্রতীকাত্মক, কিন্তু এই বাস্তবতা খুব কুটিল। মঞ্চনাটক হিসেবে 'মহাপুরুষ' বেশ সফল হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, এই নাটকটি বেশ মঞ্চসফল্য অর্জন করেছিল। এই নাটকের ৫৬টি প্রদর্শনী হয়েছিল। ঢাকার মধ্যে প্রযোজনা হিসেবে খুবই দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছিল। পঞ্চাশতম রজনীর অভিনয় উপলক্ষে একটা বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। হুমায়ূনের বিশেষ ইচ্ছাপূরণে ওই সন্ধ্যার প্রধান অতিথি ছিলেন কবি শামসুর রহমান। মঞ্চনাটক থেকে আধুনিক দর্শকদের প্রত্যাশা বিবেচনা করে যদি 'মহাপুরুষ' কিছুটা পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে এই এখন প্রযোজনা করা হয়, তা কালের দাবি মেটাতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমার ব্যক্তিগত অভিমত হুমায়ূনের সবগুলো নাটকের মধ্যে 'নৃপতি'-তে মঞ্চনাটকের উপাদান সবচেয়ে বেশি। এই নাটকটিও অবশ্য ঢাকার মধ্যে প্রযোজিত হয়েছিল। নান্দনিক নাট্য সম্প্রদায় এটা মঞ্চায়ন করেছিল। এটা তেমন প্রতিষ্ঠিত দল নয় এবং সাংগঠনিক শক্তির ঘাটতি থাকার জন্যই সম্ভবত এই প্রযোজনা খুব বেশিদিন চলেনি। আমি এর কোনো প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলাম না। তাই সুনির্দিষ্টভাবে বলতে পারছি না, তবে নির্দেশনা ও সামগ্রিক পরিবেশনার যে চাহিদা, তা-ও হয়তো পূরণ করা হয়নি। 'নৃপতি'র কাহিনির প্রারম্ভিক দৃশ্য থেকেই বোঝা যায় ব্যঙ্গ রচনার মাধ্যমে নাট্যকার কাহিনি এগিয়ে নিতে চাইছেন। নেপথ্য কর্ত্তের মাধ্যমে প্রচলিত সূত্রধরের

একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে। মহিমগড়ের মহামান্য রাজা প্রজাদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার জন্য পথে নেমেছিলেন। সন্ধ্যার আগেই তাঁর রাজপ্রাসাদে ফেরার কথা তিনি ফিরলেন না। পথ হারিয়ে ভ্রমণ মাঠে বসে রইলেন। রাত বাড়তে লাগল। আমাদের আজকের গল্প মহিমগড়ের নৃপতির গল্প। গল্প শুরু করছি এইভাবে—এক দেশে এক রাজা ছিল। এরপর কিশোর-কিশোরীদের কণ্ঠে গান পরিবেশিত হবে। রাজা-প্রজার সংলাপে হুমায়ূনের স্বতন্ত্র বাকভঙ্গি ও রসবোধ শনাক্ত করা যায়। রাজা মজনু নামের চোরের পিঠে উঠে বসেন। বৃদ্ধ ও তরুণী সুর করে রাজাকে শুনিয়ে দেয়—‘রাজা সাবরে বলতে চাই। আমরা পেটে ভাত নাই, শীত পড়েছে আকাশ-পাতাল শীতে কষ্ট পাই। এমন পরিস্থিতির পরিবেশনায় বাস্তবতা ও অবাস্তবতাকে চমৎকারভাবে জুড়ে দেওয়া যায় এবং একই সঙ্গে নাটকের অন্তর্নিহিত বার্তাকে মূর্ত করে তোলা যায়। রানীকেও দেখতে পাই পরের দৃশ্যে। কাহিনীর গতি ও বিন্যাস একটা ধারায় চলতে থাকে, রানীর সহচরীদের ও একজন গানের গুস্তাদকেও দেখতে পাই। রানীর সঙ্গে তাদের কথোপকথনে রাজার শাসনে প্রজাদের দুর্গতির বিবরণ পাওয়া যায়। হুমায়ূনের এই নাটকে সত্যজিৎ রায়ের ‘হীরক রাজার দেশে’ ছায়াছবির একটা দূরগত প্রভাব আবিষ্কার করা যায়। নাট্যকার চটুল কিন্তু দ্ব্যর্থবোধক গান ব্যবহারের অনেকগুলো অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন। নির্দেশক ইচ্ছেমতো পাশাক পরিকল্পনা করতে পারেন, জাঁকজমক দিয়ে অতীতের নৃপতিদের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন এবং একই সঙ্গে বাংলাদেশের দুঃসময়ের কাহিনীটাও উপলব্ধি করে তুলতে পারেন। ছড়ার ঢঙে বাচনভঙ্গি সৃষ্টি করা যায়, তার সঙ্গে ভুল মিলিয়ে আবহসঙ্গীত তৈরি করা যায়, খুবই চমৎকারভাবে তবলার বোল ব্যবহার করা যায়। আলোকসম্পাতেও নানা নিরীক্ষা সম্ভব। মাঠ, রাজবাড়ি, দরবার কানাড়া, তা নিয়ে রসালো কৌতুক ইত্যাদির পরিবেশনায় মঞ্চের বিচিত্র কলাকৌশল প্রয়োগ করার অনেক অবকাশ আছে ‘নৃপতি’ নাটকে। চতুর্থ দৃশ্যের সবটাই গ্রাম; শীতকাল; কুশীলবরা সবাই গ্রামবাসী। এখানে আগের সেই চোর আছে, তরুণ-তরুণী আছে, শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচবার জন্য আগুন পোহানোর দৃশ্য আছে। দৃশ্যের এই বিপরীতধর্মী প্রতি তুলনাকে একজন দক্ষ নির্দেশক মঞ্চনাটকের জন্য চমৎকারভাবে তার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন। বাড়তি নাটকীয় ঝোঁক আনতে ব্রেস্টের বিচ্ছিন্নকরণ রীতি প্রয়োগ করাও সম্ভব। হুমায়ূন আহমেদ নাটকটাকে যেভাবে পরিণতির দিকে নিয়ে যান, তাতে বক্তব্য স্পষ্টতর হয়ে ওঠে, যদিও বুদ্ধিদীপ্ত দর্শক প্রথম দৃশ্য থেকেই তা অনুধাবন করতে পারেন। রাজা-রাণী-মন্ত্রী-গুস্তাদ-সহচরী এবং অন্যদিকে দরিদ্র দুর্গত মানুষ, এই বৈপরীত্য চরিত্রায়নে একটা দ্বন্দ্বিক অবস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করে। ‘নৃপতি’ নাটকটিকে নেহাতই একটা কমেডি হিসেবে বিচার করলে ভুল হবে, বক্তব্যের তির্যক চরিত্র বোঝা যাবে

নানা-সংলাপ থেকে প্রজাদের দুঃখে রাজার হঠকারী এবং স্বৈরাচারী প্রতিক্রিয়া আমাদের দেশের বিশেষ একটা সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। এবং তা থেকে বোঝা যায়, হুমায়ূন আহমেদ এমন নাটকের মধ্য দিয়েই নাট্যকর্মীদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন।

বিষয়বস্তু মুক্তিযুদ্ধ হিসেবে বারবার ফিরে এসেছে হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্যে, 'জোছনা ও জননীর গল্প' উপন্যাসে যার বিস্তৃত ও ইতিহাসনিষ্ঠ উপস্থাপনা দেখেছি আমরা। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে হুমায়ূনের সাহিত্যকর্ম খুব বেশি উচ্চকণ্ঠ নয় এবং সেজন্য এই মহান ঐতিহাসিক ঘটনা চমৎকার শৈল্পিক প্রকরণে তার লেখায় স্থান লাভ করেছে, উপন্যাস, ছোটগল্প ও অনেকগুলো টেলিনাটকে। 'স্বপ্ন ও অন্যান্য মঞ্চ নাটক' সমগ্র গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে একটি নাটক আছে, নাম '১৯৭১'। গ্রামে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রবেশ, মানুষের জীবনশঙ্কা ও সঙ্কট, রাজাকার, শান্তি কমিটি, ঘরবাড়ির দাহ, হিন্দুদের হত্যা, নারীলালসা ইত্যাদি মুক্তিযুদ্ধের প্রায় সব অনুষঙ্গই এখানে আছে। হুমায়ূনের সাহিত্য হিসেবে আলাদা করে শনাক্ত করা যায় তেমন চিত্রও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। নাটকে একজন গ্রামীণ কবি আছে, যে ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে বেশ পছন্দ করে, পাকিস্তানি মেজরের সঙ্গে সে ইংরেজিতে কথা বলে নির্ভয়ে, কিন্তু কিছুটা কৌতুকের ঢঙে, কৌতুক পরিবেশন করে। পাকিস্তানি বাহিনীর উপস্থিতির জন্য যে সামগ্রিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে, তার বিপরীতে পাগলামি, পাগল নিয়ে সংলাপ ইত্যাদি comic relief তৈরি করে। নাটকের একটা প্রধান চরিত্র রফিক। এই চরিত্রায়নে নাট্যকারের মুস্লিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। যে প্রকৃতপক্ষে মুক্তিবাহিনীর বা স্বদেশের পক্ষে কাজ করেছে, কিন্তু সে মুক্তিমান রাজাকার হয়ে পাকিস্তানি বাহিনীকে জনগোষ্ঠীর ব্যাপক সংহার থেকে বিরত করে। সম্ভাবনা থাকলেও এই নাটক মঞ্চের জন্য খুব উপযোগী বলে আমার মনে হয় না। কাহিনীর মধ্যে একরৈখিকতা আছে, সংঘাতের বিষয়টা তেমন প্রাধান্য পায় না। চরিত্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেও তেমন সংহতি নেই।

গ্রন্থভূক্ত একটি নাটকের নাম 'অসময়'। আমার বিচারে এই নাটকের বক্তব্য সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করলেও মঞ্চ নাটক পরিবেশনার বিষয়টি মাথায় রেখে কাজ করেননি। তাই বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা যা-ই থাকুক না কেন, মঞ্চনাটক একটি পৃথক শিল্পমাধ্যম হিসেবে যা দাবি করে তার প্রতি তো মনোযোগ দিতে হবে। কিন্তু টিভিনাটকের দর্শককে পর্দার সামনে ধরে রাখার কৌশলটার কাছে হুমায়ূন অনেকটা বন্দি হয়ে গেছেন। একটি পরিবার, সেই পরিবারে সাধারণ হিসাবের বাইরে একজন চাচা থাকেন (হুমায়ূন সাহিত্যের এক অতি পরিচিত রসদ)। তিনি

আশেপাশের মানুষের ভান (Pretence) পছন্দ করেন না, কিন্তু অন্যরা তো (এবং তার মধ্যে সেই চেনা বাড়ির কাজে সাহায্যকারী মেয়েটি আছে।) সমাজের সঙ্গে আপোষ করে চলতে চায়। চাচা একদিন আকস্মিকভাবে সিদ্ধান্ত নেন, তিনি আর মিথ্যা কথা বলবেন না। নানাভাবে সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনীটা যে এগিয়ে যায়, তাতে নিম্নমধ্যবিস্তৃ পরিবারের গতানুগতিক চালচলন, আশা, সহনীয় অসততা ইত্যাদির বিস্তৃতি আছে। কথোপকথনের প্রধান বোঁক কৌতুক সৃষ্টিতে। নাটকীয় সংঘাতের কোনো অবকাশ নেই। মঞ্চনাটক হিসেবে এটির প্রযোজনা সার্থক হবে বলে আমার মনে হয় না।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম নাটকটির নাম 'স্বপ্ন'। এই নাটক দিয়েই নাট্যকার তার গ্রন্থের শিরোনাম সাজিয়েছেন। আমার মনে হয়েছে, হুমায়ূন শিরোনাম নির্বাচন করতে গিয়ে সময় নষ্ট করতে চান নি, তাই অবহেলায় এই নাম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কারণ, এটি নাটক হিসেবে একাঙ্কিকা। তা-ও কিনা সন্দেহ থেকে যায়। হুমায়ূন যে বহুসংখ্যক টেলিভিশন ধারাবাহিক রচনা করেছেন, এটি তার একটা পর্ব হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, তা-ও খুব সংক্ষিপ্ত। রাতে গুনসীরা এক গ্রামের রেলস্টেশনে এক তরুণ-তরুণীর হঠাৎ নাটকীয় দেখা ও কিছু সংলাপ। ভীতি, রক্তের উল্লেখ, প্রবাসী নারীর উদ্বেগ এবং অবশেষে তরুণের জন্য সমাজের দুর্বলতা ইত্যাদির মধ্যে মঞ্চনাটকের উপাদান খুবই হ্রস্ব। নাট্যকার নিজেও তার সৃষ্টিতে অনুমান করি।

শেষ নাটকটিও খুব ছোট, নাম 'স্মৃতিচিহ্ন'। নাট্যকার এটাকে কিশোর নাটিকা হিসেবে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছেন। এমন নির্দিষ্টতার কোনো প্রয়োজন আছে কি না, জানি না। পড়তে গিয়ে তরুণের Parables-এর কথা মনে পড়ে। শিশুমন যে বয়স্কদের চেয়ে কতটা সংবেদনশীল হতে পারে, তা বোঝা যায়। সাধারণ দর্শকদের জন্য এই নাটকটির মঞ্চায়ন সার্থক করে তোলা কষ্টসাধ্য, তবে বিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠানে এমন প্রযোজনা অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে। তবে হুমায়ূন আহমেদের নিজের স্বপ্ন ও অর্ধে গড়ে তোলা নেত্রকোনার কুতুবপুরের 'শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ'-এ এটা অভিনীত হওয়া উচিত।

শকি আহমেদ

হুমায়ূন আহমেদের গান

হুমায়ূন আহমেদ চলে গেলেন। রেখে গেলেন স্বাবর-অস্বাবর কিছু সম্পত্তি, যা পরিবারের। বৃহত্তর পরিবার অর্থাৎ আমাদের জন্যে কালো অক্ষরের মায়ায় বন্দি কিছু লেখা, সেলুলয়েডে কয়েকটি চলচ্চিত্র ও কিছু গান। দিনে চলে গেলে পড়বেন তারা যারা লেখা পড়েননি। নতুন প্রজন্ম নতুন করে পাবেন তাঁকে। যারা তাঁর গান শোনেননি, নতুন করে উপলব্ধি করবেন তাঁকে। তাঁর লেখা গানের বেশ কয়েকটি সিডি প্রকাশ করেছেন সংগীতা কমপ্লেক্স, লেজার ভিশন, জি-সিরিজ এবং ফাহিম মিউজিক। গ্রামীণফোন ওয়েলকাম টিউনস, রবি গুনগুন ও বাংলালিংক আমার টিউনস গানগুলোকে মুঠোফোনে পৌঁছে দেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। এক লাইন বা দুলাইনের গান সিরিয়াস মিউজিকের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে না সত্যি, তবু সমসাময়িক গানের প্রতিনিধিত্ব করে। সংগীতের আরোহী অবরোহী যেমন একদিন আশ্রয় পেত গ্রামোফোন পিনের মাধ্যমে, লাউড স্পিকারের চোঙায় নৌকার গলুইয়ের ফাঁকে ঝংকৃত হতো গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, পরবর্তীতে ইথার তরঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যেত গ্রামের মেঠোপথে, ধানের ক্ষেতে, আলোর ফাঁকে, ছোট ছোট ট্রানজিস্টারে। টেলিভিশনের ফ্রন্ট সিটিভি ও পরে বিশটি চ্যানেল পেরিয়ে আজ দিনে রাতে জানান দেয় নতুনদের পদচারণা, নতুন সুর, নতুন কথা নতুন শিল্পীদের নতুন উচ্চারণ।

নাট্যকার-ঔপন্যাসিক-ছোটগল্পকার হুমায়ূন আহমেদের যে পরিচয় প্রকাশিত কয়েকটি চলচ্চিত্র ও নাটকের মাধ্যমে, ঘরে ঘরে গানগুলো বেজে উঠছে অডিও ক্যাসেটে ও মোবাইল ফোনের কল্যাণে। কয়েকটি গান আমার আগেই শোনা ছিল, বিশেষ করে সাবিনা ইয়াসমিনের কণ্ঠে 'আমার ভাঙা ঘরে', 'বরষার প্রথম দিনে', সুবীর নন্দীর কণ্ঠে 'একটা ছিল সোনার কন্যা'। মকসুদ জামাল মিন্টুর সুরে 'ঘুমিয়ে পড়েছে চাঁদ', 'হাবলঙ্গের বাজারে', 'যে থাকে আঁখি পল্লবে' ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে অনেকের কাছে।

শোনা গল্প। হুমায়ূন আহমেদ একজন গীতিকারকে তার বাসায় ডেকে আনলেন। জানতে চাইলেন কীভাবে গান লিখতে হয়। বাসায় গিয়ে গীতিকার দেখেন সেখানে আরও অনেকে উপস্থিত। হুমায়ূন বললেন, লিখুন, আমি শিখব। গীতিকার অবাক। সবার সামনে কি গান লেখা যায়? গীতিকার কিছু একটা লিখলেন, হুমায়ূন কিছু একটা শিখলেন। যে গানটি তার সবচেয়ে পপুলার সেটি রূপায়ণ করেছেন বাংলাদেশের ও ভারতের কোটি মানুষের নায়ক ফেরদৌস। আর গানটিতে পুকুরের পাশে তরুণী নায়িকার রূপসজ্জায় শাওন। গানটির রূপায়ণ অনেকবার দেখলাম এবং বোঝার চেষ্টা

করলাম হুমায়ূনের সবচেয়ে পপুলার গানটির মধ্যে কী কী আছে, যা গানটিকে তার লেখা গানের মর্যাদা দিয়েছে।

মন যে উড়ালপঞ্জী, বাসা বাঁধতে চায় নদী ও মেঘের ভেলায়। প্রতি মানুষের মনই যে বেজায় কষ্ট দিয়ে মোড়ানো। কিসের কষ্ট, কেন কষ্ট নিজেই জানে না। গান রেখে যায় সে কষ্টের রেশ। হুমায়ূনের মনেও হাহাকার। কার মনে নেই? হোক গীতিকার, সুরকার, শিল্পী, বাজিয়ে, শ্রোতা সবার। যে গানের পিঞ্জরায় যত হাহাকার, সে গান উড়বে তত। ছবিটিতে গীদাল ফেরদৌস। লাটাই ঘুরিয়ে ঘুড়ি আকাশে উড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা, পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েরাও সবুজ গায়ের ক্ষেতে ঘুড়ি নিয়ে দৌড়াচ্ছে। তাদের মনেও ওড়ার স্বপ্ন। আকাশ ছুঁতে চায় সকলেই। কী সুন্দর চিত্রায়ন। ঘুড়িটির তেমন করে ওড়া হয় নি, গীদাল সুতা কেটে দিল ঘুড়ির। গীদালের হলুদ চাদর যেন উড়ালপঞ্জীর দুই পাখা। উড়ালপঞ্জীর ওড়া থেমে গেল। পুকুরেই ঝাঁপ দেয় যেখানে কিছুক্ষণ আগেও ছিল কলসি কাঁখে নায়িকার স্বপ্ন। লেখক, চিত্রনির্মাতা, গীতিকার সব একাকার। এরই নাম হুমায়ূন। এবার শোনা যাক গানটি পুরোপুরি সুবীর নন্দীর সুমিষ্ট কণ্ঠে :

ও আমার উড়াল পঞ্জীরে/ যা যা তুই, উড়াল দিয়া যা/ আমি থাকব মাটির ঘরে/
আমার চোক্ষে বৃষ্টি পড়ে? তোর হইল মেঘের উপরে বাসা ॥ আমার মনে বেজায় কষ্ট/
সেই কষ্ট হইল পষ্ট/ দুই চোক্ষে ভর করি। আমার নিরাশা/তোর হইল মেঘের উপরে
বাসা ॥ মেঘবতী মেঘকুমারী মেঘের উপরে থাকে/ সুখদুঃখ দুই বোনের কোলের
উপরে রাখে/ মাঝে মইধ্যে কান্না করা মাঝে মধ্যে হাসা/ মেঘবতী আজ নিয়েছে
মেঘের উপরে বাসা ॥তোর হইল মেঘের উপরে বাসা ॥

হুমায়ূন প্রচলিত অর্থে গীতিকার নন। নাটক ও সিনেমার প্রয়োজনে লিখেছেন, সুরকারের হাতে পড়ে গান। পরবর্তীকালে আলোচনা করে মন দিয়ে গানগুলো শুনবেন ও চমৎকৃত হবেন এই ভেবে যে সংগীত কত সহজেই একজন শিল্পীর মনে এসে ধরা দেয়। যদি তিনি সুর রচনা করতে পারতেন তাহলে সহজেই সেগুলো বড় কবিদের রচনার মতো সবার অন্তরে স্থান করে নিত, যেমনটি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত। তবে এ কথাও ঠিক যে নতুন মিডিয়ার কল্যাণে সহজেই গানগুলো পৌঁছে যায় প্রজন্মের শ্রোতাদের কাছে, যা আগের কবিদের ক্ষেত্রে ঘটে নি। সে কারণেই গানগুলো নিয়ে আজ এত নাড়াচাড়া।

হুমায়ূন আহমেদের পাঠকদের মধ্যে আহমদ শরিফ, ইমদাদুল হক মিলনের মতো দুয়েক জন ছাড়া বড় মাপের বোদ্ধা পাঠক কিছুই বলেননি। লেখেননি যারা তাদের

মধ্যে হয়তো প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা। হুমায়ূনের সহজ সাবলিল ভঙ্গী তাদের উন্মাসিক মার্গালোকে আঘাত হেনেছিল। গানের ক্ষেত্রেও তাই। বারি সিদ্দিকী সহজেই তার কাছে ধরা দিয়েছিলেন এবং তাঁর সুরের মধ্যেই ইচ্ছে করলে হুমায়ূন আহমেদ আরও পঞ্চাশটি গান প্রবিশ্ট করাতে পারতেন। গান সবাই লিখতে পারে না, কারণ গানের মধ্যে শুধু ছন্দ আর কথার কারিগরি নেই, আছে কবির কিছু কথা, যা না হলে গানগুলো স্থায়ী হবে না। নজরুল যখন একটি গান লেখেন, তখন তা স্থায়ী হয় ভাবের, সুরের ও গায়কির কারণে। একশ বছর পরে গানগুলো যেন শক্ত সমর্থ হয়। রবীন্দ্রনাথের গান দিনে দিনে এত ভারী হয়ে উঠবে কে ভাবছিল। যত দিন যাচ্ছে তত মনে হচ্ছে একেকটি গানে কত কথা এসে জমা হয়েছে।

‘রবীন্দ্রনাথ : প্রেমের গান’ বইটি যখন লিখি, কবির ফেলে যাওয়া বেশ কয়েকটি প্রেমের গান গাইতে থাকি এবং তা আমার মনে যে রেখাপাত করে তাই বইতে লেখার চেষ্টা করেছি। সবার ক্ষেত্রে ভেমনটি হবে না। গানগুলোকে হৃদয়ে স্থাপন করেছেন তারা ও পরে লিখেছেন দু’য়েকটি কথা। পেশাদার সমালোচকের আলোচনার সঙ্গে এক করে দেখা যুক্তিযুক্ত নয়।

সাহিত্যিকদের মধ্যেই আছেন জীবনের অন্ধকার দিকটির দিকে যারা নজর দিতে ভালোবাসেন, অন্ধকার সময়ে মানুষ কোন অন্ধকার নিয়ে খেলা করে তারই কথা। অপরপারে কিছু মানুষ ওটি ভুলে যেতে চান। ‘নিহিলিজম’ কাজের কথা নয়, ভালো কি আছে তা বার কর, ওটুকু নিয়েই জীবন কেটে যাক, ওই ভালো লাগার স্পর্শটুকু তারা দিয়ে যান লাখ লাখ মানুষকে তাদের কাব্যে, উপন্যাসে, গানে। হুমায়ূন আহমেদের যে কটা বই পড়েছি তার মধ্যে ঈর্ষা পাই আলো, যা আমাকে আলোকিত করে, যে গান কটি শুনেছি চোখ বন্ধ করে পৌঁছে যাই প্রতীক্ষিত প্রেমের গহীনে, যে প্রেম ছাড়া জীবন অর্থহীন। জীবনের কোনো মানে নেই। রোমান্টিক হুমায়ূনের স্বপ্নসহচর আমি, গানের ক্ষেত্রেও তাই।

যে কটি গান হুমায়ূন আহমেদের লেখা তার মধ্যে আছে : আমার ভাঙা ঘরের, একটা ছিল সোনার কন্যা, বরষার প্রথম দিনে, কন্যা নাচিল রে, মাথায় পরেছি সাদা ক্যাপ, সোহাগপুর গ্রামে, আমার কুসুম রানীর, আমার শ্যাম যদি, হাবলস্কেবর বাজারে, যে থাকে আঁখি পল্লবে, ঘুমিয়ে পড়েছে চাঁদ, ওগো ভবিজান।

ইংরেজি ভাষায় লেখা তার গান আছে সেগুলো হলো : We must believe in magic. Such a feeling. Down the way.

চার বছর সেঙ্গর বোর্ডে কাজ করায় সময় শ’ দুয়েক ভালো-মন্দ ছবি দেখেছি। ছ’সাতটি গানের কোথায় কোথায় সুরারোপে অন্য সুরের প্রতিফলন তা যে কোনো

বালক নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। তাই সংগীত পরিচালকদের অনেকের গান নাকোচ করে দিলাম'। আবার তাদের অনুরোধের ঢেকি গিলে ছবি পাশ করতে হয়েছে। পল্লীগ্রাম থেকে এসে যারা টেলিভিশনে কাজ করেন তাদের মধ্যে গুণীশিল্পীর অভাব নেই। এর মধ্যে স্থান করে নেন বাঁশিয়াল, দোতরাওলা, ঢোলশিল্পী সবাই। এরা গুণি হলেও ঠিক বোঝেন না কোথায় থামতে হবে।

অনেকগুলো সিডির সঙ্গে সংযুক্ত, যা হুমায়ূন আহমেদের লেখা নয়। টিভি নাটক ও সিনেমায় ব্যবহৃত। এগুলো অবশ্যই হুমায়ূন আহমেদের পছন্দের গান। এর মধ্যে আছে গিয়াসউদ্দিনের : 'মরিলে, কান্দিস না আমার দায়', হাসন রাজার : 'লোকে বলে রে', 'নিশা লাগিল রে', 'একদিন তোর হইব রে মরণ', রাধারমণ দত্তের : 'ভ্রমর কইও গিয়া', শাহ আবদুল করিমের : 'আমি কুল হারা কলঙ্কিনী', 'তুই যদি আমার হইতি', সৈয়দ শাহনূরের লেখা : 'বন্ধু তোর লাইগা রে'।

টেলিভিশনে দীর্ঘকাল বাজাতেন বাঁশি, তার বাদনের প্রশংসা না করে পারা যায় না। বড় মার্কিন অফিসারের বাসায় গানের জলসা। গানের মধ্যে বাঁশির ফ্যাস ফ্যাসে আওয়াজ এসে জানান দিল দুই কারুকার্যই বাতাসের ভাবি নজরুল তাঁর প্রথম জীবনে বাঁশি বাজাতেন। এতে কণ্ঠটির সর্বনাশ সাধিত হয়, চেষ্টাতেও কণ্ঠটিকে পরে আর বশে আনতে পারেন নি। [পঠিতব্য : আমার লোকপুড়ির একাকী]। এ ক্ষেত্রেও তাই। বাঁশির সঙ্গে কারণবারি। শিল্পীকে উপস্থিত করা হলে এল নানা বাদ্যযন্ত্র, সবগুলোই পাশ্চাত্যের, একোডিয়ান, স্প্যানিশ গীটার, প্যাডিং সবই। এর সঙ্গে আমার দ্বিমত। যেন গুনতে পেলাম লোকসংগীতের আত্ম কান্না। বেদারউদ্দিন আহমেদ, মমতাজ আলী খান, আবদুল মজিদ জালুকদার, সোহরাব হোসেন, শেখ লুৎফর রহমান, শেখ মুহিতুল হক, নুরুদ্দিন আহমেদ, সাবদার আলী, আবদুল হক,, শেখ গোলাম মোস্তফা পিতার সঙ্গে গান করতেন। আমার সঙ্গে সাথী আজিজুল ইসলাম, বান্না, আবু বকর সিদ্দিক, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, কিরণচন্দ্র রায়, মলয় কুমার গাঙ্গুলী কারণবারি ও পাশ্চাত্য যন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত হননি কেউই। কণ্ঠযন্ত্রের সঙ্গে কারণবারির তুঙ্গ বিবাদের কারণে সুকণ্ঠ আবু বকর খান, আবদুল আলিম অল্প সময়েই বিদায় নিতে বাধ্য হন। হুমায়ূন নিভৃত পল্লীর অনেককেই যেমন বারি সিদ্দিকী, শাহনাজ বেলী, কুদ্দুস বয়াতি ও অন্যান্যকে তাঁর ছবিতে সুযোগ দিয়েছিলেন। সুন্দর সুন্দর সুর সংযোজিত হয়েছে যাদের কল্যাণে, এদের অবদানকে আমি স্বীকার করি।

সুর নিয়ে কয়েকটি কথা। তাঁর সবচেয়ে পপুলার গান কোনটি? 'একটা ছিল সোনার কন্যা'। সুবীর নন্দী জানাচ্ছেন যত অনুষ্ঠানে তিনি গান গেয়েছেন মকসুদ জামিল মিন্টুর সুর দেওয়া এই গানটির কথাই সবাই বলেছে। অনেকেই জানেন না যে

এটি হুমায়ূন আহমেদের লেখা। বাংলার হাটে মাঠে বাটে গানটি তুঙ্গ জনপ্রিয়তার শীর্ষে। কারণ কী? সবাই খুঁজছে মনের কন্যাকে। যে যেভাবে কন্যাকে খুঁজেছেন সেভাবেই সুখমা এঁকেছেন। আর নজরুল এঁকেছিলেন আমার পিতাকে আশ্রয় করে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গানটি, ভাওয়াইয়া-ভাটিয়ালিতে মিশ্রিত অপরূপ প্রেম সংগীত।

‘কুচবরণ কন্যারে তার মেঘবরণ কেশ/আমায় নিয়ে যাওরে কন্যা, সেই সে নদীর দেশ রে ...’

হুমায়ূনের গানটির কিছু অংশ :

একটা ছিল সোনার কন্যা মেঘবরণ কেশ/ ভাটি অঞ্চলে ছিল সেই কন্যার দেশ/
দুই চোখে তাঁর আহারে কি মায়া/ নদীর জলে পড়ল কন্যার ছায়া ॥ তাহার কথা বলি/
তাহার কথা বলতে বলতে/ নাও দৌড়াইয়া চলি ॥ কন্যার চিরল বিরল চুল/ মাথার
কেশে জবা ফুল/ সেই ফুল পানিতে ফেইল্যা/ কন্যা করল ভুল/ কন্যা ভুল করিস না/ ও
কন্যা ভুল করিস না/ আমি ভুল করা কন্যার লগে কথা বলব না।/ হাত খালি গলা
খালি/ কন্যার নাকে নাক ফুল/ সেই ফুল পানিতে ফেইল্যা কন্যা করল ভুল/ ও কন্যা
ভুল করিস না/ আমি ভুল করা কন্যার লগে/ কথা বলব না ॥ ...

দুটি ভার্শন, দুটোই সুন্দর। সুবীরকে বললি এক অনুষ্ঠানের শেষে : কুচবরণ কন্যাকে পরিস্ফুট করতে এখন আর সুর-কথায় কুলোচ্ছে না, প্রয়োজন হল কন্যাটিকে শনাক্ত করে চোখের সামনে স্থাপন করা, গাত্রবর্ণ যার স্বর্ণরেণু, তবী নয়নে বিদ্যুৎ বহি, দু'বেণীর কেশগুলো হুজুত ফুলের রেণু। যদি তিনি হন নির্মাতার চয়ন মেহের আফরোজ শাওন, শোভা ও দর্শক এক মুহূর্তে সনাক্ত করে ফেলবে। অডিও ভিজুয়াল মিডিয়া এভাবে সঙ্গীতিক কার্যকার্যকে দর্শকশ্রোতার চোখের সামনে এসে মূর্ত করে তোলেন তাদের স্বপ্নদোষ।

মকসুদ জামিল মিন্টু এ সময়ে সবচেয়ে মিষ্টি গানের সুরকার। সহজেই মানুষ তার সুর দেওয়া গানগুলো গাইতে পারে। এখানেই তার কৃতিত্ব। সবচেয়ে ভালো লাগে যখন মিন্টু ব্যবহার করে পরিচিত অনুশঙ্গে অন্য দু'য়েকটি গানের সুর। যেমনটি করেছিলেন সলিল চৌধুরী। তার সবচেয়ে নামকরা সংগীত পরিচালনা ‘মধুমতি’-তে নৃত্যপটীয়সী বৈজ্ঞানীমালার নৃত্যগীতের সঙ্গে পরিচিত একটি গান। সেখানে ছাড়ের সময় একটি মিউজিক রাতারাতি সবার মনে স্থান করে নেয়। এটি হলো ‘হলুদ গাঁদার ফুল রাঙা পলাশ ফুল এনে দে এনে দে, নইলে বাঁধব না বাঁধব না চুল’, চাড়ের সময় এই গানটির সুর সমস্ত ভারতে পৌঁছে যায়। এখনো যদি গানটি শোনা যায় বোঝা যাবে কত সুন্দরভাবে লোকসুর বাসা বাঁধে একটি সুসংগীতে। মিন্টুর ক্ষেত্রেও তাই। ‘দুই

চোখে আহারে কি মায়া, নদীর জলে পড়ল কন্যার ছায়া' সুরটি অপরূপ লালিত্বে পরিপূর্ণ। সুবীর নন্দী এত সুন্দর করে গেয়েছেন এ দু'টি লাইন, যা বারবার শুনতে ইচ্ছে করবে।

হুমায়ূন আহমেদের লেখা ১২টি গানের সিডি 'আমার আছে জল' নামে প্রকাশিত সুর ও সংগীত : এস. আই. টুটুল ও হাবিব ওয়াহিদের নামে, ফাহিম মিউজিক সিডিটি প্রকাশ করেছে। এর গানগুলোর মধ্যে একটি আধুনিক গেয়েছেন শাওন।

আমার আছে জল/ সেই জল যেন পদ্ম পুকুর/ মেঘলা আকাশে মধ্য দুপুর/ অচেনা এক বনবাসী সুর/ আমার আছে জল ॥ আমার একার সেই কালো দীঘি/ একাই আমি জলে নামি/ কেউ নেইতো কাছে ও দূরে/ অন্য ভুবনে থাকো তুমি/ আমার একার সেই দীঘিতে/ ফোটাই নীল কমল/ আমার আছে জল ॥ ...

গানটি শাওনের কণ্ঠে গীত এবং একই সঙ্গে জিপি ,রবি, সিটিসেল, বাংলালিংকে এক সেকেন্ডের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। 'আমার আছে জল' রবীন্দ্রনাথের একটি গানের পরের লাইন। প্রথম লাইন : 'আমার হল গুরু তোমার হলো সারা'। গানটির মধ্যে যা পাওয়া যাবে তা হল; উল্লাস, নৃত্য ও একলা মানুষের বৃষ্টির উৎসবে অবগাহন। সুর দিয়েছেন সম্ভবত এস. আই. টুটুল ও হাবিব ওয়াহিদ। মলাটে একটি মেয়ের পানির মধ্যে ভেসে থাকা। সম্ভবত সে ছুঁতে গিয়ে আবার ভেসে উঠেছে।

শাওনের কণ্ঠ মন দিয়ে শুনলে তার মধ্যে পাওয়া যাবে অনেক কিছু। তা কী? সারল্য, স্বচ্ছন্দগতি ও কণ্ঠের মধ্যে স্তম্ভিলিলা প্রেম মাধুর্য। এটি বোঝানোর জন্যে যেতে হয় হৈমন্তী গুরুর কাছে। ফরেক একদিন জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি জান তোমার কণ্ঠের কোন কোন পার্টস শ্রোতাদের মন ছুঁয়ে যায়? হৈমন্তী আমার প্রশ্নের উত্তর জানে। সে বলল, গা থেকে নি পর্যন্ত। যারা সুরকার তারাও এটি জানেন। হৈমন্তীর সবগুলো গানে যখন এই নোট ছুঁয়ে যায় তখন তা হয় সবচেয়ে বেশি হৃদয়গ্রাহী। শাওনের গান সামনা সামনি শুনিনি। এ গানটি এস. আই. টুটুলের ও হাবিব ওয়াহিদের যৌথ সুর অত্যন্ত মধুর করে কণ্ঠ প্রক্ষেপ করেছেন শাওন। মনোযোগী না হলেও গানটি হৃদয়ের তীরে এসে আছড়ে পড়তে বাধ্য। বাঁশির আলাপ সুন্দর। তার পরে শাওন এলেন। তার গলা মিষ্টি। এখানে মনে পড়বে জীবনানন্দ দাশের কবিতাটি : 'জলের থেকে ছিঁড়ে গিয়েও জল, মেশে যেমন আবার জলে গিয়ে'। শাওনের কণ্ঠে আছে বিদ্যুতের ধার।

'চল বৃষ্টিতে ভিজি' কণ্ঠে গীত। সবচেয়ে সুন্দর কণ্ঠ কনার। শুধু বেহালার ছড়ে ও পিয়ানোর টুংটাংয়ে গানটি ভরান। তার কণ্ঠটি যন্ত্র। 'চোখে চোখ রাখা, জলছবি আঁকা' সারাক্ষণ কণার সঙ্গে। একটি সুন্দর গান।

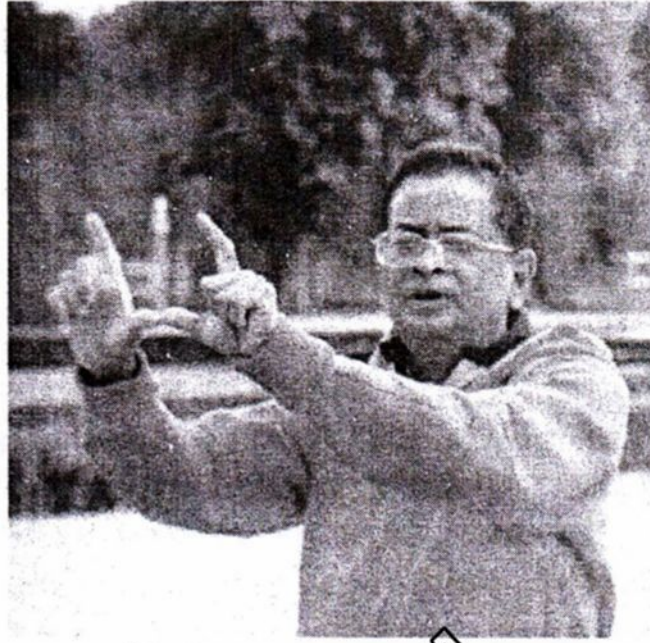
চল বৃষ্টিতে ভিজি/ বাদলা দিনে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান/ বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদে এলো বান/ যদি ডেকে বলি, এসো হাত ধরো/ চলো ভিজি আজ বৃষ্টিতে/ এসো
গান করি মেঘমাল্লারে/ করুণাধারা দৃষ্টিতে/ আসবে না তুমি, জানি আমি জানি/
অকারণে তবু কেন কাছে ডাকি?/ কেন মরে যাই তৃষ্ণাতে?/ এই এসো না চলো জলে
ভিজি/ শ্রাবণ রাতের বৃষ্টিতে।/ কত না প্রণয় ভালোবাসাবাসি/ অশ্রুসজল কত
হাসাহাসি/ চোখে চোখ রাখা/ জলছবি আঁকা/ বকুলগন্ধা রাতে।/ কাছে থেকেও তুমি
কত দূরে/ আমি মরে যাই তৃষ্ণাতে/ চলো ভিজি আজ বৃষ্টিতে।

শেষ লাইনটি অর্থবহ : কাছে থেকেও তুমি কত দূরে, আমি মরে যাই তৃষ্ণাতে।
এখানে লালন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

তৃতীয় গান 'নদীর নাম ময়ূরাক্ষী'। গেয়েছেন এস. আই. টুটুল। এখানে বলতেই
হয় অধর্মের প্রথম উপন্যাসের নাম 'হরিণাক্ষি', ময়ূরাক্ষীর কাছাকাছি। আমার রচিত
উপন্যাসের সঙ্গে এই গানের কোনো মিল থাকার কথা নয়। অথচ আজ ভেবে অবাক
হচ্ছি যে নদীটির কথা ভেবেছিলাম তারও ছিল কালো জল, ভালোবাসার ডুবুরি সেই
নদীর তলদেশ খুঁজে পায়নি। হুমায়ূন আহমেদ বেঁচে থাকলে তাকে আমার বইটি
পড়তে দিতাম। গানটির কথার মধ্যে আছে সখী ভালোবাসার অতল আহ্বান,
ময়ূরাক্ষীর আবরণে।

নদীর নামটি ময়ূরাক্ষী/ কাক কালো জল/ কোন ডুবুরি সেই নদীটির/ পায় নি
খুঁজে তল ॥ তুমি যাবে কি ময়ূরাক্ষীতে হাতে হাত রেখে জলে নাওয়া/ যে ভালোবাসার
রং জ্বলে গেছে/ সেই রংটুকু খুঁজে পাওয়া ॥ সখী ভালোবাসা করে কয়/ নদীর জলে
ভালোবাসা খোঁজার/ কোন অর্থ কি হয় ...

এই গানে সবচেয়ে সুন্দর কথা হল : ভালবাসা থাকে চোখের মাঝে। রবীন্দ্রনাথের
ছায়া আছে যেখানে কবি গাইছেন : 'সখী ভালবাসা করে কয়'। পরের লাইন : নদীর
জলে ভালোবাসা খোঁজা কোন অর্থ কি হয়। পরের গানটি গেয়েছেন সাবিনা ইয়াসমিন
তার মিষ্টি গলায়। গানটি যিনি একবার শুনবেন।



নন্দিত নরকের কথাকার দশ

তাকে বেশ কয়েকবার শুনতে হবে এবং ভিজিটে হবে কবির সাথে বৃষ্টিতে। কারণ কবি আহ্লান জানাচ্ছেন : চলো ভিজি আজ বৃষ্টিতে। সাবিনা ইয়াসমিনের কণ্ঠ প্রসঙ্গে এইটুকু বলতে চাই, যে কোন গানই তার কণ্ঠের আবেদনে নতুন মাত্রা পায়। হয়ত সুর সবসময়ই তার কণ্ঠপোষোগী হয় না, কিন্তু সুরকার সবসময় মনে রাখতে পারেন না কোন পর্দাগুলোতে সাবিনার কণ্ঠ হয়ে উঠে হৃদয় জাগানো, কোথায় মীড়সন্ধানী, কোথায় হৃদয়সমুদ্রের তলদেশে, সাজুয়া নিয়ে গবেষণা চলতে পারে। এই মুহূর্তে একটির কথা বলি।

সুরকার সলিল চৌধুরী স্ত্রীকে নিয়ে ট্যাক্সিতে করে কোথাও যাবেন। ট্যাক্সিতে চড়েই তার মধ্যে গুঞ্জরিত গানের দুটি কলি। আর সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন লতা মঙ্গেশকার। স্ত্রীকে বললেন, খানিকক্ষণ অপেক্ষা কর, ঘরে গিয়ে গানটির দু'লাইনের স্বরলিপি করে ফিরছি। গানটি : 'না যেয়ো না'। গানটি লতা ছাড়া আর কেউ গাইতে পারতেন না, আর ওই মুহূর্তে সুরটিকে বেঁধে না রাখলে সে পালিয়ে যেত কি না। এবার আমার অনুরোধ, হুমায়ুনকে যারা ভালোবাসেন সাবিনার গানটি মন দিয়ে শুনুন। নিশ্চিত জানি গানটিতে আছে হুমায়ুনের মনের কথা।

আসবে না তুমি, জানি আমি জানি/অকারণে তবু কেন কাছে ডাকি?/কেন মরে যাই তৃষ্ণাতে? /এই এসো না চলো জলে ভিজি/শ্রাবণ রাতের বৃষ্টিতে।/কত না প্রণয় ভালোবাসাবাসি/অশ্রুসজল কত হাসাহাসি/চোখে চোখ রাখা/জলছবি আঁকা/বকুলগন্ধা

রাতে।/কাছে থেকেও তুমি কত দূরে/আমি মরে যাই তৃষ্ণাতে/যদি ডেকে বলি, এসো
হাত ধরো/চলো ভিজি আজ বৃষ্টিতে/এসো গান করি মেঘমাল্লারে/করুণাধারা দৃষ্টিতে ॥

বৃষ্টিতে ভিজতে হুমায়ূনের কী যে ভালো লাগত তা তাঁর পাঠক মাত্রই উপলব্ধি
করেছেন নানা লেখায়। তাঁর লেখা ‘ছবি বানানোর গল্প’ আমার হাতের কাছেই।
অনেকে জানেন না, বইটিতে এক জায়গায় আছে আমার প্রশংসা, কিন্তু এখন জানাচ্ছি
হুমায়ূনের বৃষ্টির প্রতি ভালোবাসার কথা।

সর্বশেষ গুটিং হলো মতিনউদ্দিন সাহেবের বাড়ির উঠোনে। দৃশ্যটা এরকম— হঠাৎ
বৃষ্টি নেমেছে। রাত্রির খুব বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে করছে। সে উঠোনে নেমে গেল।
বৃষ্টিতে ভিজছে। একা ভিজে সে তেমন আনন্দ পাচ্ছে না। ছোটবোন অপলাকেও
ডাকল। অপলা টিয়া পাখির খাঁচা হাতে উঠোনে নেমে গেল। সে নিজেও স্নান করবে,
টিয়া পাখিকেও স্নান করাবে। তাদের সঙ্গে যুক্ত হলো কাজের মেয়ে বিত্তি। তারা
মহানন্দে বৃষ্টিতে ভিজছে ব্যাকখাউন্ডে গান হচ্ছে।

শেষ দৃশ্যের জন্যে যতটুকু বৃষ্টি প্রয়োজন তারচেয়ে অনেক বেশি বৃষ্টির ব্যবস্থা
আমি করে রেখেছিলাম।

পরিকল্পনা হলো—দৃশ্য গ্রহণ শেষ হবে কিন্তু বৃষ্টিপাত থামবে না। বৃষ্টি পড়তেই
থাকবে—আমি সবাইকে নিয়ে সেই বৃষ্টিতে নেমে পড়ব।

দৃশ্য গ্রহণ শেষ হলো। আমি বৃষ্টিতে নেমে পড়লাম। বললাম, আসুন আপনারাও
আসুন। সকলেই হতভম্ব। ভালো কথা পড়চোপড় পরে সবাই এসেছে—বৃষ্টিতে ভিজলে
উপায় হবে কি? আমার আহ্বানের সাড়া জাগল না। কেউ নামল না। আমি একাই
ভিজছি। সম্ভবত আমাকে একা ভিজতে দেখে আমার ছোট মেয়ে বিপাশার মায়া
লাগল। সে বৃষ্টিতে নেমে এসে আমার হাত ধরল।

নেমে এলেন আমার বন্ধু আর্কিটেস্ট করিম। কেউ একজন ধাক্কা দিয়ে মোজাম্মেল
সাহেবকে পানিতে ফেলে দিলেন। তিনি জাপ্টে ধরে নামালেন ক্যামেরাম্যান আখতার
হোসেনকে। তারপর একে একে সবাই বৃষ্টিতে নেমে এলেন। নকল বৃষ্টি আমাদের
মাথায় মুষল ধারে পড়ছে। মহিলারা শুরুতে ইতস্তত করছিলেন—তারা তাদের দ্বিধা
কাটিয়ে পানিতে নামলেন। আনন্দিত গলায় বলতে লাগলেন—আরও বৃষ্টি। আরও বৃষ্টি।
একজন অতিথি স্যুট পরে এসেছিলেন, তিনিও গম্ভীর মুখে নেমে পড়লেন। দুটি বড়
বড় স্পিকারে গান হচ্ছে।

এসো নীপবনে ছায়াবীথি তলে

এসো করো স্নান নবধারা জলে

উঠানে সবাই নাচতে নাচতে ভিজছে। তাদের উল্লাসে গানের কথা চাপা পড়ে যাচ্ছে।

একসময় আমার চোখে পানি এসে গেল। বিরাট একটা দায়িত্ব হাতে নিয়েছিলাম, সেই দায়িত্ব শেষ করেছি। প্রবল বৃষ্টিতে আমার চোখের পানি কেউ দেখল না। না দেখাই ভালো।

আমার ছোট মেয়ে আমার হাত ধরে গানের তালে তালে খুব নাচছে। তার মা দাঁড়িয়ে ডাকছে, বিপাশা উঠে এসো। সে উঠবে না।

আমি মুগ্ধ হয়ে আমার কন্যার নাচ দেখতে দেখতে মনে মনে বললাম—

আমি অকৃতি অধম বলেও তো তুমি/ কম করে কিছু দাও নি।/ যা দিয়েছ তার অযোগ্য ভাবিয়া/ কেড়েও তো কিছু নাও নি।/ তব আশিষ কুসুম ধরিয়া এ শিরে/ পায়ে দলে গেছি চাহি নাই ফিরে/ তবু দয়া করে কেবলি দিয়েছ/প্রতিদান কিছু চাও নি ...

[হুমায়ূন আহমেদের 'ছবি বানানোর গল্প' থেকে]

কবির মূল কথাটি এই গানে আছে। তা হলো, 'আছে থেকেও তুমি কত দূরে, আমি মরে যাই তুমিগাতে।

গান গেয়েছেন এস. আই. টুটুল। গানটির নাম হলো : আঁধারি রাত ছিল

আঁধারি রাত ছিল/ বইছিল পৌষের পাগলা বাতাস/ আমরা কয়েকটি প্রাণী অকারণে অভিমানী/ কিছুটা হতাশ।/ ওহো ওহো ওহো ওহো ॥ আগুনের ভিতর পাখির নিস্তব্ধ নীরব/ তাকে নিয়ে আমরা মৃত্যু উৎসব/ একটু আগুনের ছোঁয়া বুনকা বুনকা ধোঁয়া/ সেই ধোঁয়া মিশিতেই আকাশেরও গায় ॥ আগুনের ভেতরে পাখি/ নেই তার ডাকাডাকি/ ঝলসানো পাখি কাঁপে গাঢ় বেদনায় ॥ কিছু গল্প কথা অর্থহীন কথকতা/ টুংটাং গাঁটারের সব, নাচিতেছে মৃত পাখি।

পরের গান গেয়েছেন কথা। গানটির নাম : চলো বৃষ্টিতে ভিজি। একই গান গেয়েছিলেন সাবিনা ইয়াসমিনও হাবিবের কণ্ঠে। তেমনি 'আমার আছে জল' আরেকবার গেয়েছেন সুমনা বর্ধন। 'আমরা যাব বহুদূরে' একটি সুন্দর গান, গেয়েছেন আগুন। এটি একটি আধুনিক রচনা যার মধ্যে আছে অচেনার আহ্বান। সবচেয়ে ভালো লাগে যেখানে ছেলে ভুলানো ছড়া এসে আশ্রয় নেয় : রেলগাড়ি বামাবাম পা পিছলে আলুর দম'। সুরের মধ্যে আর একটি বৈচিত্র্য এলে রেলগাড়িতে ভ্রমণ আরও আকর্ষণীয় হত। আগুনের সুন্দর আগুন-ঝরা কণ্ঠ গানটিকে আরও স্মৃতি দিতে পারত।

এখানেই মনে পড়ে যায় মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের কথা। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আবদুল আহাদের সঙ্গে সময় দিয়েছেন। তাই শত শত গানের মাধ্যমে হতে

পেরেছিলেন শ্রেষ্ঠ গীতিকারদের একজন। শামসুর রাহমান মোটেও সময় দেননি, যদিও দীর্ঘকাল রেডিওতে কাজ করেছেন। সমর দাস, আবদুল আহাদ তাঁর কাছ থেকে জোর করে গান আদায় করতেন ঠিকই, কিন্তু গীতিকার সুরকারের সাজু্য হয় নি। ফররুখ আহমদ ছিলেন এদিক থেকে খুবই ব্যতিক্রমী। আবদুল আহাদের সঙ্গে বসে তিনি সেই সময়ে রচনা করেছেন শ্রেষ্ঠ কিছু গান।

হুমায়ূন আহমেদ সে সময় পান নি। তিনি ব্যস্ত ঔপন্যাসিক, ব্যস্ত গল্পকার, ব্যস্ত নাটকার, ব্যস্ত চিত্রনির্মাতা। তা সত্যেও যখন নতুন প্রজন্মের শ্রোতা তার সামনে এসে দাঁড়ান এবং ভালো ভালো শিল্পীরা এ গানগুলো পরিবেশন করেন, তখন গানগুলো পায় নতুন মাত্রা। এখন শুনুন আগুনের গাওয়া গান।

আমরা যাব বহুদূরে যাব/ অচেনার দেব পাড়ি/ শহর নগর কিছু বন্দর/ পিছু ফেলে রেলগাড়ি। হেই ছুটেছে ছুটেছে ঢাকা ঘুরছে/ খুঁজছে ইস্টিশন আমরা হাসছি/ কি মজা পাচ্ছি উঠু দুঠু মন/ অচেনা ইস্টিশন, অচেনা ইস্টিশন/ রেলগাড়ি ঝামাঝম পা পিছলে আলুর দম/ ইস্টিশনের মিষ্টি কূল/ শখের বাগান গোলাপ ফুল ॥ ছোট্টে রেলগাড়ি কম ঝামা ঝম ঝম/ গতি তার মনে প্রাণে/ আমরা যাচ্ছি দূরে বহুদূরে/ অচেনা ইস্টিশনে ॥ আমরা যাব বহুদূরে যাব/ অচেনায় দেব পাড়ি/ বন, জঙ্গল, খাল, জল/ পিছু ফেলে রেলগাড়ি/ আমরা হাসছি এবং কাঁদছি/ মন উদাসী মন অচেনা ইস্টিশনে ॥

গানের পুরনো ফরম বদলে ফেলেছেন হুমায়ূন। যদি নিজে সুরকার হতেন তাহলে হত এক রকম, সেটি হতো তার একটি সৃষ্টি। সুরকার হয়তো তাঁরই ইচ্ছেমতো সুর ফেঁদেছেন। তা কখনো শ্রোতার মনে এসে আঘাত করেছে আবার কখনো পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। সত্যজিৎ রায় তাঁর ছবিতে নিজেই সংগীত পরিচালকের ভূমিকায়। এই কারণে যে তাতে সিনেমার চরিত্রের মধ্যে যে নাটকীয়তা তা আরও খানিকটা এগিয়ে গেছে গানের তালে তালে এবং সুরে সুরে। তাঁর বেশ কয়েকটি ছবিতে তাঁর সাংগীতিক মুগ্ধীয়ানা পরিস্ফুট। এক্ষেত্রে ‘আমরা যাব বহুদূরে’ গানটিতে আগুন যেভাবে শুরু করেছে গানটি সেভাবে শেষ হয় নি। রেলগাড়ির ছুটে চলা তার মধ্যে অচেনা স্টেশনগুলো ছুটে চলা এবং তার সঙ্গে ‘রেলগাড়ি ঝামাঝম পা পিছলে আলুর দম’ ছন্দটি মেলানোর যে সুন্দর প্রচেষ্টা তা সুরে ছন্দে তেমনটি খেলেনি। তাই শেষ কথায় যখন কণ্ঠশিল্পী গাইছেন : আমরা হাসছি এবং কাঁদছি, মন উদাসী মন, অচেনা স্টেশন, তখন তা অচেনা স্টেশনের গন্তব্যে নিয়ে যায় না।

এর পরের গানটি এক বরষায়। রবীন্দ্রনাথের ছায়া পড়লেও রোমান্টিক এ গানটি আধুনিক মনস্করা গাইবেন বলে আমার ধারণা। এটির একটি ভিডিও প্রস্তুত হয়েছে এবং ইন্টারনেটে তা জনপ্রিয়। গানটি হলো :

যদি মন কাঁদে/ তুমি চলে এসো এক বরষায়।/ এসো ঝরঝর বৃষ্টিতে,/ জলভরা দৃষ্টিতে / এসো কোমল শ্যামল ছায়।/ যদিও তখন আকাশ থাকবে বৈরী, কদমগুচ্ছ হাতে নিয়ে আমি তৈরি/ উতলা আকাশ মেঘে মেঘে হবে কালো/ কালকে ঝলকে নাচিবে বিজলী আলো।/ নামিবে আঁধার বেলা ফুরাবার ক্ষণে, মেঘলার বৃষ্টির মনে মনে।/ কদমগুচ্ছ খোঁপায় জড়িয়ে দিয়ে,/ জলভরা মাঠে নাচিবো তোমায় নিয়ে।

এর মধ্যে হুমায়ূনের রোমান্টিক ভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে বলে আমার ধারণা। বজ্রধ্বনি, বৃষ্টির ধ্বনির সঙ্গে গানটি মিশে আছে। ‘ফেইসবুক’-এ বন্ধুদের একজন নাদিয়া নাতাশা লিখেছেন :

‘আমার অনেক পছন্দের গানটি। বৃষ্টি হলেও শুনি। অদ্ভুত এক মাদকতা গানটিতে’। দেলোয়ার হোসেন লিখেছেন :

‘ক্ষণিকের জন্যে ভালো লাগে, কারণ গানের কথা’। রওশান আরা লিখেছেন : ‘আমার ভালো লাগা গানের একটি’ রূপকথার পরী, অসীম ভৌমিক, আফরোজা খন্দকার লিখেছেন : ‘অপরূপ’। ৩৩ জন শ্রোতার মধ্যে কয়েকজনের কথা বললাম।

সম্পাদক তাগাদা দিচ্ছেন। তাই এখানেই শেষ করতে হলো। আমার ধারণা হুমায়ূনের গান নিয়ে অনেক হইচই হবে। হয়ত আমার পঁচাত্তরতম জন্ম দিবসে গাইব : ‘আমরা হাসছি এবং কাঁদছি, মন উদাসী মন অসুস্থ ইন্সটিশন’। এবারে সুর দিয়েছি আমি নিজে। জয়তু হুমায়ূন।

মোস্তাফা জামান আব্বাসী

আমাদের স্বপ্নের কারিগর

হুমায়ূন আহমেদ আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখকদের কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিলেন। সেটা ১৯৯০ সালের কথা। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি একটা বই লিখেছিলেন, মে ফ্লাওয়ার। বইটি কাকলী প্রকাশনী ১৯৯১ সালে প্রকাশ করে। হুমায়ূন স্যার জন্মগ্রহণ করেছেন ১৯৪৮ সালে। ১৩ নভেম্বর। আমি জন্মেছি, যত দূর আকা-আম্মার সূত্রে জেনেছি, ১৯৬৫ সালে। মানে হুমায়ূন স্যারের সতের বছর পরে। আমি হুমায়ূন স্যারের আইওয়া গমনের প্রায় বিশ বছর পরে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের একই কর্মসূচিতে অংশ নিতে যাই।

তাতে কিছু আসে যায় না। রবীন্দ্রনাথও তার নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির আগে আমেরিকার এইসব জায়গা ভ্রমণ করেন। তখনই তার কবিতা অনূদিত হয়ে আমেরিকা থেকে প্রকাশিত হয়। সেটা বোদ্ধামহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং পরবর্তীকালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। স্কুল পালালেই রবীন্দ্রনাথ হওয়া যায় না, তেমনি আইওয়া গেলেই হুমায়ূন আহমেদ হওয়া যায় না।

যদিও আমাদের কাছে আইওয়াকে আকর্ষণীয় করে রেখেছেন আসলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তাঁর ছবির দেশে কবিতার দেশে ও 'সুদূর ঝর্ণার জলে' বইয়ের মাধ্যমে এবং শব্দ ঘোষ তার 'ঘুমিয়ে পড়া' অ্যালবাম বইটির মাধ্যমে।

আমি গেলাম ২০১০ সালে। আইওয়ার পাবলিক লাইব্রেরিতে আমাকে একটা বক্তৃতা দিতে হয়েছিল। আমার বক্তৃতার বিষয় ছিল : হোয়াই ডু আই রাইট দি ওয়ে আই রাইট। আমি কেন এই রকম লিখি!

আমি আমার বক্তৃতা শুরু করেছিলাম বাংলাদেশের দুই লেখকের কথোপকথন দিয়ে।

একবার হুমায়ূন আহমেদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। সৈয়দ শামসুল হক তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান। সৈয়দ শামসুল হক তাঁকে বলেন, হুমায়ূন, তোমাকে সেরে উঠতে হবে। কারণ তুমি সাধারণ মানুষ নও। সাধারণ মানুষের হাতে আঙুল থাকে পাঁচটি। কিন্তু তোমার ডান হাতে আছে ছয়টি আঙুল। ষষ্ঠ আঙুলটি হলো তোমার কলম। তোমাকে সেরে উঠতেই হবে, কারণ তুমি লেখক, তোমার কাজ হলো স্বপ্ন নির্মাণ করা।

আমি বললাম, আমি বাংলাদেশের লেখক, আমারও হাতে ছয়টি আঙুল দেখো।

আমাদের ওপরে একটা দায়িত্ব পড়েছে। কেউ দেয়নি, আমরা নিজেরাই নিয়ে নিয়েছি। সেটা হলো, ১৬ কোটি মানুষের জন্য স্বপ্ন নির্মাণ করা।

আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবির কাজ সম্পর্কে 'পুরস্কার' কবিতায় লিখেছেন

কবিসার-মাঝে কয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর ...

তার পরে ছুটি নিব।

সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল,

সুন্দর হবে নয়নের জল,

স্নেহসুধামাখা বাসগৃহতল

আরও আপনার হবে।

প্রিয়সী নারীর নয়নে অধরে

আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে,

আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ-'পরে

শিশিরের মত রবে।

না পারে বুঝতে, আপনি না বুঝে
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে...
কোকিল যেমন পঞ্চমে কুজে
মাগিছে তেমনি সুর।
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দু-চারিটা কথা
রেখে যাব সুমধুর।

শিশুর হাসি সুন্দর, কিন্তু কবি লিখে লিখে সেই হাসিকে আরও মধুর করে
তোলেন, তখন আরও কিছু স্নেহ শিশুর মুখে শিশিরের মতো জমে ওঠে। হুমায়ূন
আহমেদ তাই করেছেন। তিনি বিগত ৪০টি বছর ধরে সাড়ে সাত কোটি মানুষ থেকে
১৬ কোটি মানুষের জন্য স্বপ্ন নির্মাণ করেছেন। আমাদের জ্যেৎশ্রী চিরটা কাল সুন্দর
ছিল, কিন্তু হুমায়ূন আহমেদ লিখে লিখে তা আরেকটু সুন্দর করে গেছেন। আমাদের
বৃষ্টি চিরকালই সুন্দর ছিল, কিন্তু হুমায়ূন লিখেছেন যেন তা আরেকটু সুন্দর হয়েছে।
আমাদের রবীন্দ্রসংগীত আগেও মধুর ছিল, কিন্তু তিনি লিখে লিখে, তিনি নাটকে
রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহার করে আমাদের রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি আরেকটু বেশি অনুরাগী
করে তুলেছেন।

আমরা বড় হয়েছি হুমায়ূন আহমেদের কালে। আমরা যখন স্কুলে পড়ি তখন
বেরুচ্ছি তার প্রথম দিকের বইগুলো। আমরা যখন কলেজে পড়ি, তখন জনপ্রিয় হতে
শুরু করেছে তার টেলিভিশনের এক ঘণ্টার নাটকগুলো। আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে
পড়ি, তখন টেলিভিশনে শুরু হলো তার জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'এইসব দিনরাত্রি'।

আমি হুমায়ূন আহমেদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ করি যে, তিনি আমাদের
বেড়ে ওঠার কালটাকে আনন্দপূর্ণ করে তুলেছিলেন। তিনি আমাদের মন গড়েছেন,
তিনি আমাদের রুচি গড়েছেন এবং তিনি আমাদের গদ্যভঙ্গির ওপরে প্রভাব
ফেলেছেন। আমরা দল বেঁধে সিনেমা হলে ফিরে গেছি তার 'আগুনের পরশমণি' কিংবা
'শ্রাবণ মেঘের দিন' দেখবার জন্য।

হুমায়ূন আহমেদ 'বল পয়েন্টে' লিখেছেন, তিনি টেলিভিশন নাটকে সচেতনভাবেই
পূর্ব বাংলার ভাষা ব্যবহার শুরু করেন। আগে সংলাপে লেখা হতো, আসুন, বসুন,
হুমায়ূন আহমেদ সেখানে লিখতে শুরু করেন 'আসেন',

‘বসেন’। তিনি বাংলাদেশের প্রকাশনা জগৎকে প্রায় একাই তার জাদুকরী শক্তি বলে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। আজকে যে বইমেলা এত বড়, আজকে যে এত বিচিত্র ধরনের বই বেরুচ্ছে। তার পেছনে তার একটা বড় অবদান আছে।

হুমায়ূন আহমেদের লেখার কতগুলো বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি ছোট ছোট বাক্য লিখতেন। তার সেন্স অফ হিউমারের কোনো তুলনা নেই। পরিমিতিবোধ অসাধারণ। খুব অল্প আঁচড়ে একটা চমৎকার ছবি আঁকতে পারতেন ... সেটা মানুষের বর্ণনা হোক, পরিবেশের বর্ণনা হোক, তুলির অল্প কটা টানই তার লাগত জিনিসটাকে সম্পূর্ণ করতে। তাঁর চরিত্র তৈরির ক্ষমতা অতুলনীয়।

তার লেখা পড়লে মনে হয়, তিনি সবকিছু পরিমিত পরিমাণে দিয়েছেন। আবেগ, সহানুভূতি, হাস্যরস, নাটকীয়তা, করুণরস ... সবকিছু মাপা। কিন্তু তিনি প্রায় অটোমেটিক রাইটার ছিলেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই লিখতেন। তার প্রতিভা বোধকরি সহজাত এবং এই প্রতিভার কোনো তুলনা হয় না।

তার প্রতিভা যে সহজাত, তাঁর প্রমাণ ‘নন্দিত নরকে’। বই হয়ে বেরিয়েছিল ১৯৭৩ সালে। তার আগে এটি প্রকাশিত হয় ‘মুখপত্র’ নামের একটি পত্রিকায়। এটি লিখিত হয়েছে ১৯৭০ সালে। তখন তার বয়স মাত্র বাইশ। তখনো তিনি ছাত্র। মুহসিন হলে থাকেন। বলা হচ্ছে, নন্দিত নরকে তখন দ্বিতীয় উপন্যাস। আসলে তিনি প্রথমে লেখেন ‘শঙ্খনীল কারাগার’। ২২ বছর বয়সে মানুষের গদ্য তৈরি হয়? দেখার চোখ তৈরি হয়? উপলব্ধি করার মতো বেশ ও বোধি? ‘শঙ্খনীল কারাগার’ ও ‘নন্দিত নরকে’ এখন পড়তে বসলে মনে হবে, এটা একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের রচনা?

‘নন্দিত নরকে’ প্রথম পঙ্ক্তি থেকেই বিস্ময়কর।

‘রাবেয়া ঘুরে ঘুরে সেই কথা কটিই বলছিল।

রুন্নুর মাথা নিচু হতে হতে খুতনি বুকের সঙ্গে লেগে গিয়েছিল। আমি দেখলাম তার ফরসা কান লাল হয়ে উঠেছে। সে তার জ্যামিতি খাতায় আঁকিঝুঁকি করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ‘দাদা আমি একটু পানি খেয়ে আসি’ বলে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল।

রুন্নু বারো পেরিয়ে তেরতে পড়েছে। রাবেয়ার অশ্লীল কদর্য কথা না বুঝার কিছু নেই। লজ্জায় সে লাল হয়ে উঠেছিল। হয়তো সে কেঁদেই ফেলত। রুন্নু অল্পতেই কাঁদে। আমি রাবেয়াকে বললাম, ছিঃ রাবেয়া, এসব কথা বলতে আছে? ছিঃ! এগুলি বড় বাজে কথা। তুই কত বড় হয়েছিস!”

রাবেয়া কী বাজে কথা বলল, সেটা এই বইয়ে কখনোই বলা হবে না।

এই পরিমিত বোধ তিনি বাইশ বছর বয়সেই অর্জন করেছিলেন।

তার গদ্যও ওই বাইশ বছর বয়সেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

‘মা দুধের বাটি টেবিলে নামিয়ে রাখলেন। কাল রাতে তার জ্বর এসেছিল। বেশ বাড়াবাড়ি রকমের জ্বর।’

এই যে একটা বিশেষণকে প্রথম বাক্যে ব্যবহার না করে পরের বাক্যে ব্যবহার করা, এটা তার গদ্যের স্থির বৈশিষ্ট্য। এই কায়দায় তিনি চিরটাকাল লিখে যাবেন। তার অনুকরণকারীরাও পরবর্তীকালে বহুবার এটাকে নকল করবে।

হুমায়ূন আহমেদের পরিমিতবোধের কোনো তুলনা হয় না।

‘নন্দিত নরকে’ গল্পে মন্টু খুন করে মাস্টার কাকাকে।

সেই বর্ণনাটা শুনুন।

‘বারোটীর দিকে ফিরে এলেন মাস্টার কাকা। সঙ্গে শহর থেকে আনা বড় ডাক্তার। আর মন্টু ... দিনে-দুপুরে অনেক লোকজনের মধ্যে ফালা ফালা করে ফেলল মাস্টার কাকাকে একটা মাছকাটা বাঁটি দিয়ে। পানের দোকান থেকে দৌড়ে এল দু তিনজন। একজন রিকশাওয়ালা রিকশা ফেলে ছুটে এল। ডাক্তার একটা মোটা ধারা গাড়িয়ে চলেছে নালায়। মন্টু আমার দিকে তাকিয়ে ফেলল, দাদা, ওকে আমি মেরে ফেলেছি।’

আমার মনে পড়ল হাসানাহেনা গাছের নিচে মন্টু একটা সাপ মেরেছিল।’

এরপরে সেই সাপ মারা বর্ণনা। মন্টু খুন করার বর্ণনা আর নাই। আশ্চর্য নয় কী?

আর মানুষের মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা গাঢ় অন্ধকারের খবর ওই বয়সেই হুমায়ূন আহমেদ পেয়েছিলেন বা কোথায়? মাস্টার কাকার মতো ভালো মানুষটি যে একজন প্রতিবন্ধী মেয়েকে যৌন-হয়রানি করতে পারে, এটার ইঙ্গিত তিনি কোথাও দিয়ে রাখেন নি। হুমায়ূন চিরকাল আমাদের এই খবরই নিয়েছেন, মানুষ কেবল সাদা বা কালো হয় না, মানুষের মন আসলে ধূসর।

মন্টুর ফাঁসির পর তার লাশ নেওয়ার জন্য খোকা তার বাবা, মা, বোনকে নিয়ে জেলখানায় যায়। সেইসব বর্ণনা অপূর্ব।

যদিও থিমটা হয়তো হুমায়ূন পেয়েছিলেন ‘জাগরী’ থেকে। জাগরীর মতো চমৎকার উপন্যাস বাংলা ভাষায় খুব কমই লেখা হয়েছে।

কিন্তু হুমায়ূনের বর্ণনা হুমায়ূনের মতো :

‘গাছের নিচে ঘন অন্ধকার। কী গাছ এটা? বেশ ঝাঁকড়। অসংখ্য পাখি বাসা বেঁধেছে। তার সাড়াশব্দ পাচ্ছি। পেছনের বিস্তীর্ণ মাঠে স্নান জোছনার আলো।’

কিছুক্ষণের ভেতরই চাঁদ ডুবে যাবে। জেলখানার সেন্ট্রি দুজন সিগারেট খাচ্ছে। দুটি আঙনের ফুলকি ওঠানামা করছে দেখতে পাচ্ছি।'



হুমায়ূন আহমেদের সাহিত্যিক চর্চা

কথাসাহিত্যিক কাজ করে মানুষের মন নিয়ে। মানুষের মনের বর্ণনা দেওয়ার জন্যই তাকে প্রকৃতির বর্ণনা দিতে হয়, অন্তত কখনো কখনো। বাংলা সাহিত্যে এই কাজটা সবচেয়ে সুন্দরভাবে আমরা করতে দেখেছি রবীন্দ্রনাথকে।

পোস্টমাস্টার গল্পের এই অনুচ্ছেদটি খেয়াল করলেই আমরা সেটা বুঝতে পারব, 'যখন নৌকায় উঠলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল।'

হুমায়ূন আহমেদ তাঁর কুড়ি বাইশ বছরে লেখা 'নন্দিত নরকে' বইয়ে সেই কাজটিই করলেন। মন্টুর ফাঁসি হয়েছে। তার লাশ আনতে স্বজনেরা গেছে জেলগেটে। সেখানে তিনি প্রকৃতির বর্ণনা, পরিবেশের বর্ণনা দিচ্ছেন নিপুণ ভঙ্গিতে।

উপন্যাস মানে যে কেবল গল্প বা কাহিনী বলে দেওয়া নয়, একটা ভূগোল নির্মাণ করা, একটা জগত তৈরি করা, এটা হুমায়ূন জানতেন। তাঁর উপন্যাস '১৯৭১'-এ আমরা সেই কাজটা তাঁকে করতে দেখব :

‘রুবাইল বাজারকে পেছনে ফেলে আরও মাইল ত্রিশেক উত্তরে মধুবন বাজার। যাতায়াতের একমাত্র ব্যবস্থা গরুর গাড়ি। তাও শীতকালে বর্ষায় হাঁটা ছাড়া অন্য উপায় নেই। উজান দেশ। নদীনালা নেই যে নৌকো চলবে।

মধুবন বাজার পেছনে ফেলে পূর্ব দিকে সাত-আট মাইল গেলে ঘন জঙ্গল। স্থানীয় নাম মধুবনের জঙ্গল-মাঠ। কাঁটা-ঝোপ, বাঁশ আর জারুলের মিশ্র বন। বেশকিছু গাব ও ডেফল জাতীয় অন্ত্যজ শ্রেণীর গাছও আছে। জঙ্গল-মাঠের এক অংশ বেশ নিচু। সেখানে মোরতা গাছের ঘন অরণ্য। শীতকালে সেইসব মোরতা কেটে এনে পাটি বানানো হয়।...

‘জঙ্গল মাঠের পেছনে নীলগঞ্জ গ্রাম। দরিদ্র, শ্রীহীন ত্রিশ-চল্লিশ ঘরের একটি বিচ্ছিন্ন জনপদ। বিস্তীর্ণ জলাভূমি গ্রামটিকে কান্তের মতো দুদিকে ঘিরে আছে। সেখানে শীতকালে প্রচুর পাখি আসে।...’

এই বর্ণনা আরও দীর্ঘ, আরো বিশদ।

পরবর্তীকালের উপন্যাসে হুমায়ূন আহমেদ এই ডিটেইলের কাজ আর করেছেন কিনা, আমার জানা নেই। আমার একটা দুঃখ হয় বাংলাদেশের লেখকদের নিয়ে, আমরা লেখালেখির কাজটা মনপ্রাণ দিয়ে নিবিষ্টচিত্তে করতে পারি না অনেকেই, আমাদেরকে অনেক কাজ একসঙ্গে করতে হয়। আশির দশকে এসে হুমায়ূন আহমেদ টেলিভিশনের জন্য নাটক লিখতে শুরু করলেন, আরেকটু পরে নাটক নির্মাণ করতে লাগলেন ... নাট্যপরিচালনা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ কাজ ... এবং বাংলাদেশের কোটি কোটি তরুণের পাঠতৃষ্ণা মেটানোর জন্য তাঁকে সুপ্রচুর লিখতে হলো, গণদাবি তাঁর মতো বিস্ময়কর সহজাত প্রতিভাকে বেশি কাজ করিয়ে নিয়েছে, বিচিত্র কাজ করিয়ে নিয়েছে, যার ফলে তিনি কোনো একটা উপন্যাসকে খিত্ত হওয়ার জন্যে যে সময়টা দেওয়া দরকার, তা দিতে পেরেছেন খুব কম ক্ষেত্রেই।

শেখরপাড়ার কথায় :

My candle bums at both ends;

It will not last the night;

But, ah, my foes, and, oh, my friends
it gives a lovely light.

... Edna St. Vincent Millay 'First Fig'

হুমায়ূন আহমেদের মোমবাতির দুই দিকেই আমরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলাম, তিনি বিরামহীনভাবে লিখেছেন, নাটক পরিচালনা করেছেন, গান রচনা করেছেন, সিনেমা বানিয়েছেন, বইমেলায় তাকে প্রতিবছর অনেকগুলো বই লিখতে হয়েছে প্রতিবছর তিনি আমাদের আলো দিয়েছেন, মনোরম আলো, প্রীতিময় আলো, কিন্তু নিজের আয়ু যে তিনি ধ্বংস করছেন, সেদিকে আমরা খেয়াল করি নি এবং ‘নন্দিত নরকে’ যিনি লিখতে পারেন, তার প্রতিভার একমাত্র তুলনা তো আমি দেখি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, যে-মানিক অতি অল্প বয়সে ‘দিবারাত্রির কাব্য’ লিখেছিলেন, সেই হুমায়ূন আহমেদকে দিয়ে ঈদের হাসির নাটক নির্মাণ করিয়ে নিয়ে আমরা আমাদের ঈদের সন্ধ্যাগুলোকে আনন্দপূর্ণ করে তুলেছি। হুমায়ূন আহমেদ তাঁর ক্যানসার ধরা পড়ার পরে তার নিকটজন লেখকদের কাছে এই দুঃখ করেছেন যে, নাটক পরিচালনায় সময় কম দিয়ে তার হয়তো উপন্যাস লেখার দিকে বেশি সময় দেওয়া উচিত ছিল।

আমি বলব না যে, হুমায়ূন আহমেদ নাট্য পরিচালনা উপভোগ করেন নি। বা তিনি এসব না করলেও পারতেন। কিন্তু এটা আমি বলবই যে, এটা তিনি কেবল নিজেই করেন নি, আমরা তাকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছিলাম। এই হতভাগা দেশে একজন লেখক তো কেবল নিজের খেয়ালে চলতে পারেন না, সমাজের দেশের অনেক দাবি যে আছে তার ওপরে। এটা তার বিধিলিপি ছিল।

হুমায়ূন আহমেদ নেই। এই ক্ষতি আমাদের প্রকাশনা জগৎ কীভাবে সামলাবে, বলা খুব মুশকিল। তার পাঠকেরা বহুকাল তার অভাব অনুভব করবে।

আমি ২০১২ সালের বইমেলাতেই তার অনুপস্থিতি অনুভব করেছি। সামনের বইমেলায় হয়তো তার পুরনো বইগুলো নিয়েই তিনি সগৌরবে মহাসমারোহে উপস্থিত থাকবেন? কিন্তু তারপর? পাঠকেরা তার নতুন হিমু, নতুন মিসির আলী, নতুন গুদ্রর জন্য অপেক্ষা করবে। এই শূন্যতা পূরণ হওয়ার নয়।

আনিসুল হক

হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে কিছু কথা

হুমায়ূন আহমেদ বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ভুবনে লোকপ্রিয় লেখক। খ্যাতির শীর্ষে তাঁর অবস্থান। বাংলাদেশের কোনো লেখকের বোধকরি এত অধিক পাঠক নেই। তাঁর যে-কোনো গ্রন্থই বহুল পঠিত ও আলোচিত হয়ে থাকে। বিশেষত নবীনদের মধ্যে তিনি ব্যাপকভাবে পঠিত হন। সেদিক থেকে তাঁর জনপ্রিয়তা ঈর্ষণীয়। একুশের বইমেলায় তিনি হয়ে ওঠেন প্রধান আকর্ষণ। নবীনরা খুঁজে পান নিজেদের জগৎ, বেদনা ও দুঃখকষ্ট তাঁর লেখনীর মধ্যে পেয়ে যান বলে তিনিই হয়ে ওঠেন নবীনদের আইডল। বাংলাদেশের নবীনদের মধ্যে তাঁর এই জনপ্রিয়তা উপন্যাস পাঠের দিগন্তকে ও সাহিত্যের রুচি নির্মাণকে ত্বরান্বিত করেছে, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

তাঁর লেখনীর মধ্যে এক জাদুকরী বিষয় থাকে। তিনি তাঁর রচিত উপন্যাসের মধ্যে এমন এক পরিবেশ এবং চরিত্র নির্মাণ করে থাকেন, যা খুব চেনা তো বটেই অনেক পাঠক এতে আশ্চর্য সাযুজ্যবোধ করেন।

বিশেষত মধ্যবিস্তের মনোজগৎ হুমায়ূনের লেখনীতে বলে তিনি এই জগতের মানুষজনের দুঃখ ও বেদনাকে নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করেন। বৃহত্তর পাঠক এর মধ্যে নিজেদের বারবার আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারই তাঁকে এদেশের নন্দিত লেখক করে তুলেছে।

হুমায়ূন আহমেদের এই সফলতা একদিনে অর্জিত হয়নি। তাঁকে নিরন্তর পরিশ্রম করতে হয়েছে। তাঁর সৃষ্ট বিশাল বৈচিত্র্যময় উদ্যানের দিকে দৃষ্টিপাত করলে খুব সহজেই উপলব্ধি করা যায় লেখনীর জন্য তিনি নিশ্চিতই এক শৃঙ্খলা মেনে চলতেন। যে-কোনো সৃষ্টিশীল মানুষ অন্তঃপ্রেরণা ও আনন্দের জন্য যে লেখনীর দায় স্বন্ধে নিয়ে নিরন্তর লেখালেখি করেন, হুমায়ূন আহমেদও ছিলেন সেই ধারারই লেখক। আমরা মুগ্ধ হয়েছি তাঁর ক্ষমতায়, স্বাচ্ছন্দ্যে তাঁর জীবন রূপায়ণের কৌশলে। রীতিমতো সাধনা করে তিনি এ অর্জন করেছেন। সেজন্যই বোধকরি লেখালেখির ভুবনটি যখন তাঁর ব্যক্তিত্ব ও লেখক সত্তায় প্রধান হয়ে উঠল এবং নিজে অনুধাবন করলেন বৃহত্তর বোধ ও বুদ্ধির মধ্য দিয়ে সাহিত্যের জগতে তাঁর দেবার আছে তখনই শিক্ষকতায় চাকরি থেকে সরে এসে সাহিত্যকেই ধ্যান জ্ঞান করেছিলেন। মধ্যবিস্তের জীবন অনুষঙ্গী ঘটনাবলি তাঁকে দারুণভাবে আলোড়িত ও পীড়িত করে বলে তাঁর গল্প-উপন্যাসের উপজীব্য হয়ে ওঠে মধ্যবিস্তের ভূবন। উদীয়মান মধ্যবিস্তের দুঃখবিস্ত বিকাশোন্মুখ ছিল। তাঁর ভাবনার স্বপ্নও সীমিত ছিল। গতির মধ্যে আর্থনীতিক কষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। আর ষাটের

মধ্যবিত্ত সকল দিক থেকে হয়ে উঠেছিল আরো প্রসারিত। স্বাধীনতা-উত্তরকালে আশি ও নব্বইয়ের দশকে এই মধ্যবিত্তই রাষ্ট্রের আনুকূল্যে কেমন করে উচ্চবিত্তে পরিণত হয়েছিল এ কথা সকলের জানা। এই সময়ের মধ্যবিত্তের উঠতি সন্তানের উচ্চাশা, স্বপ্ন-বেদনা-কষ্টই আশ্চর্য এক সংবেদন ধরা পড়েছে এই লেখকের নানা রচনায়। যেখানে দুঃখকষ্ট, হাসি-কান্নার সঙ্গে মিশে আছে আনন্দ-বেদনার আশ্চর্য এক জগৎ এবং নিত্যদিনের টানাপোড়েন।

তঁার প্রথম উপন্যাস 'নন্দিত নরকে' পাঠ করবার পর আমাদের মানসদিগন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। মানবিকবোধের উজ্জ্বল প্রকাশে আমরা চমৎকৃত হয়েছিলাম। দ্বিতীয় উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে তার মানসযাত্রা খর প্রবাহিনী হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে 'জোছনা ও জননীর গল্পে' তঁার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচিত উপন্যাসে জীবনবোধ ও যুদ্ধকালীন দিনগুলোর অসহায়তা প্রত্যক্ষ করেছি। মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করে বাংলাদেশে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প রচিত হলেও খুব বেশি উপন্যাস রচিত হয় নি। হুমায়ূন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাসটি সেদিক থেকে আমাদের সাহিত্যে উজ্জ্বল ও ব্যতিক্রমী সৃষ্টি বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। হুমায়ূন আহমেদ কত জনপ্রিয় লেখক ছিলেন এবং দুটি প্রজন্মের সদ্য যৌবনে পদার্পণ করেছেন এমন লাখ লাখ পাঠকের হৃদয়কে কীভাবে তঁার অনুরাগী পাঠক করেছিলেন, আমরা তঁার মৃত্যুর পর নতুন করে অনুধাবন করেছি।



বইমেলায় এক বিশেষ মুহূর্তে বাবার সাথে নুহাশ, আরেক জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন ও হুমায়ূন আহমেদ

বইমেলা কিংবা সমাবেশে তাঁর স্বাক্ষর সংগ্রহ এবং কখনো উপস্থিতির সময় নবীন-নবীনাদের উপচেপড়া ভিড় আমাদের অনেকের কাছে মনে হয়েছিল এ ক্ষণিক আবেগ, সাময়িক উত্তেজনা। কিন্তু আমরা তলিয়ে দেখতে চাই নি হুমায়ূন এই নবীন পাঠকদের স্বপ্নমঞ্জরি, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং দুঃখ-বেদনাকে নিয়ে যে জগৎ সৃষ্টি করেছেন এ কত দিক থেকে ছিল প্রাণময় ও তাৎপর্যময়। তিনি সে-সময়ে তাঁর সৃজন নিয়ে এবং মধ্যবিস্তের যে স্বপ্নময় ভুবন নির্মাণ করেছেন তা এই নবীনদের মধ্যে এক চেতনা সঞ্চার করেছিল। হুমায়ূন-সমালোচক অনেকেই এ ধারণা পোষণ করেন যে, তাঁর সৃষ্ট জগৎ মায়াময়। প্রতিবাদ নেই এইটুকু, না বিদ্রোহী করে তোলে না পাঠকের হৃদয়। বাস্তবের সঙ্গে এ ভুবনের এতটুকু মিল নেই। এ জগৎ সৃষ্টি করে হুমায়ূন তাঁর পাঠকদের স্বপ্নবিলাসী করে তুলেছিলেন। আমি এ প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বলতে চাই। এই লেখক নবীনদের স্বপ্নবিলাসী করে তুলেছিলেন, সে কথা ঠিক। কিন্তু তিনি তাদের অনুভূতির জগৎকে করেছিলেন মানবিক।

তাঁর সৃজনকালের উজ্জ্বল সময়ে নবীনদের মানবিকতার সাধনা খুবই প্রয়োজন ছিল। নিম্ন মধ্যবিস্ত, মধ্যবিস্ত ও উচ্চবিস্ত সমাজের এই নবীন পাঠক মানবিক চৈতন্যে বলীয়ান হয়েছে তাঁর বই পড়ে। একটু একটু করে উপলব্ধি করেছে সমাজের অসংগতি কোথায়। সমাজের সবধাসী হতাশা, বেকারত্ব, গণতন্ত্রহীনতা, বঞ্চনা, স্বৈরাচারীর উত্থানপীড়ন, যুব সমাজের এই বৃত্ত ঘেঁষে বেরিয়ে আসার আকুলতার পটভূমিতে হুমায়ূন আহমেদের সৃজন। তাঁর সৃজন এই সময়ে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হয়েছিল। এই সময়ের কোনো উজ্জ্বল ছাপ দী প্রতিবাদ ছিল না বটে তাঁর সৃষ্টিতে, তা কিন্তু তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছিল। উচ্চবিস্তের অন্তঃসারশূন্যতায় হুমায়ূন আহমেদ কখনো যে কষাঘাত করেন নি তা নয়। বেশ তীব্র ও জোরালোভাবে আক্রমণ করেছেন। আবেগ ছিল মানুষের জন্য, সহমর্মিতা নবীন বোধে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। পাঠক একাত্মতাবোধ করেছে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে। এই অনুষ্ণই তাঁর সৃজনে নতুন মাত্রা দান করেছিল। মানুষের দুঃখকষ্ট, বেদনা ও স্বপ্নের সম্মিলনে তিনি পাঠকদের যে অনুভূতির জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, এই জগৎই তাঁকে লোকপ্রিয় করে তুলেছিল। উপন্যাস ও গল্প রচনার পর তিনি এমন কিছু নাটক রচনা করেন যেখানে পাঠক সাযুজ্যবোধ করেছেন সৃষ্টি চরিত্রের সঙ্গে, যে চরিত্র কিছুটা খাপছাড়া দিশাহীন নিঃসঙ্গতাভিত। হুমায়ূন আহমেদ আমাদের এই চেনা জগৎকে এমন এক ভাষায় তুলে এনেছিলেন, যে ভাষা হয়ে উঠেছিল পাঠকের নিজস্ব। ছোট ছোট বাক্য ও শব্দবন্ধ, সংলাপের প্রত্যুৎপন্নমতিতা, কথার পিঠে কথা বলার ধরন এ সাহিত্যককে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। এই বৈঠকে গ্রন্থটি পাঠ শেষ হবার পর কিছুক্ষণ এক ঘোরলাগা হাহাকার ওঠে বুকে। আমার একটি প্রিয় গ্রন্থ মধ্যাহ্ন।

এই সময়ের এমন কিছু তরুণ-তরুণীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে আমরা জেনেছি, কেমন করে হুমায়ূন পাঠের পর একটু একটু করে বই পড়ার অভ্যাস তাঁদের গড়ে উঠেছিল। পাঠই তাঁদের ক্রমে সাহিত্যের বৃহত্তর পরিমণ্ডলে প্রবেশে সহায়তা করেছে। বাংলা সাহিত্যিকদের সাড়া জাগানিয়া গল্প-উপন্যাস পাঠ করতে বা রস গ্রহণ করতে তাঁদের কোনো অসুবিধা হয় না।

এই একটি গ্রন্থ ‘মধ্যাহ্ন’ পাঠ করে তাঁর সৃজনধারা যে কত তাৎপর্যসম্ভারী এবং জীবন-অনুষঙ্গী হয়ে উঠছে আমরা নতুন করে তা উপলব্ধি করেছি। এ যে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে লেখা এবং অখণ্ড মনোযোগসহকারে তা মধ্যাহ্নের ঘটনাপ্রবাহ থেকে উপলব্ধি করা যায়। সময় তার হাতে কীভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এ যেন তারই মনোমাহী রূপায়ণ। ইতিহাস নয়, ইতিহাস-আশ্রিত প্রভাব ও অভিঘাত, কখনো পরিপার্শ্ব এবং একটি জনপদ যেন জেগে উঠল তাঁর হাতে। বাঙালির জীবনযুদ্ধ ও স্বপ্নকে বৃহৎ ক্যানভাসে তুলে ধরবার জন্য তিনি হয়ে উঠলেন শ্রদ্ধেয়। তিনি যে শুধু মধ্যাহ্ন জীবনের রূপকার নন, বৃহত্তম জীবন-অনুষঙ্গী ভাবনাও যে তাঁকে হনন করেছে এই উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের বিশ্বস্ত রূপায়ণে তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

হুমায়ূন উপন্যাসে বর্ণিত একটি অঞ্চলের বাঙালির জীবন পরিধির শাস্বত ও চিরায়ত ধারাকে বৃহত্তর ও মহত্তর অনুষঙ্গে ধরে নিয়ে চলেছেন। কাল পরিধির দিক থেকে বিবেচনা করলে শতবর্ষের অধিক সময়কে তিনি ধরেছেন অখণ্ড মধ্যাহ্নে। একটি জনপদের মানুষজনের জীবনের দুঃখ-বেদনা উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। এই জনপদের দুই সম্প্রদায়ের সমন্বিত ধারার যেমন সন্ধান পাই, তাঁর রচিত ক্যানভাসের চরিত্র চিত্রণে তেমনি আছে শতবর্ষের রাজনৈতিক ঘটনাবলির স্পর্শে জেগে ওঠা মানুষজনের মনোভঙ্গি। ব্রিটিশ রাজত্বে তৎকালীন বৃহত্তর বাংলার রাজনীতি ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক, গ্রামীণ সমাজের বাস্তবতা। জমিদারি ব্যবস্থায় গ্রামীণ মানুষের দুরবস্থা এবং মুসলমানদের অন্তঃপুরে নারীর অবস্থান। তালাক ও বহুবিবাহের ফলে তৎকালে নারীর জীবন হয়ে উঠত নরকতুল্য। এও বর্ণনায় উঠে এসেছে। আবার কখনো দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার মানবিক সম্পর্কও আমরা দেখতে পাই। হিন্দু-মুসলমানদের সম্পর্কের মধ্যে দুষ্টর ব্যবধান সত্ত্বেও এক সমন্বিত প্রবহমান ধারার সন্ধান পাই। এই উপন্যাসটি পাঠ করবার পর ধনু শেখ, শশাঙ্ক, হরিচরণ, লাবুস, জুলেখা, মওলানা ইদ্রিস, বিপ্লবী জীবন লালের মতো অসাধারণ চরিত্র পাঠকের চेतনার দিগন্তকে প্রসারিত করবে বলেই আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছে।

এই উপন্যাসে হুমায়ূন আহমেদ অনিন্দ্যসুন্দরী, সুধা কণ্ঠের অধিকারী গ্রামীণ রমণী জুলেখা চরিত্রটি আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে নির্মাণ করেছেন। বিসংবাদী দুটি চরিত্রের

দাম্পত্য জীবন সুখের হয় নি। ভেঙে গেছে আকস্মিক তার সংসার। যে-কোনো পাঠক খেয়ালি অথচ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে দৃঢ় এই চরিত্রটির সঙ্গে একাত্মবোধ করেন। আকস্মিক সংসার বিতাড়িত বঙ্গের বহু নারীর বঞ্চিত বিড়ম্বিত জীবনের শেষ ঠাঁই হতো নিষিদ্ধ পল্লীতে। বেঁচে থাকার জন্যও গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র উপায় ছিল দেহ। বহু গুণের অধিকারী সরল অথচ বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল গ্রামীণ রমণী জুলেখার ঠাঁই হলো জনপদ সংলগ্ন পতিতালয়ে। আমরা বিস্মিত হয়ে লক্ষ করি, পতিতালয়ে যে হারিয়ে যায় নি, বিলীন হয় নি।

হিন্দু ও মুসলমানের জীবনদৃষ্টি, কুসংস্কার ও জীবনাচরণের অনুপূজ্য এবং তুচ্ছাতুচ্ছ ঘটনাবলি, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ও স্বাধীনতার স্বপ্ন, স্বদেশি আন্দোলনের কোনো কোনো ঘটনাও 'মধ্যাহ্নে' অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে। হুমায়ূন আহমেদ একটি জনপদের মানুষজনের আশা আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরার পাশাপাশি একটি কাল-চেতনাও ভিন্নমাত্রা সঞ্চার করেছে। উপন্যাসটি শেষ হয়েছে '৪৬-এর ভয়াবহ দাঙ্গা ও দেশভাগের অনিবার্য আভাস দিয়ে। তিনি সার্থকতা অর্জন করেছেন বৃহৎ কলেবরের এই উপন্যাসে। এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আমরা হুমায়ূনের শক্তিমত্তা, উদ্ভাবনী কৌশল, জীবনের বৃহত্তর পরিসরকে ধরবার আকাঙ্ক্ষার নব রূপায়ণ দেখেছি। এতদিন তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত জীবনের অতলস্পর্শী বোধকে ছুঁয়ে গেছেন। এই উপন্যাসে স্বপ্ন দেখতে দেখতে একটি জনপদের লোকসাধারণকে। তিনি জীবনের জটিলতাকে যেমন ধরেছেন, তেমনি উন্মোচন করেছেন বৃহত্তর জীবনবোধ। যেখানে একটি অধ্যবসায়ী মানুষজনের জীবন সংগ্রাম নতুন মাত্রা পেয়েছে। অমোঘ ও নিবিড়ভাবে ধরা পড়েছে 'মধ্যাহ্নে'।

মাহমুদ আল জামান

পাঠকপ্রিয় হুমায়ূন আহমেদ

হুমায়ূন আহমেদ কেন নিজের নাম উ-কার দিয়ে লিখতেন-এ বাংলাদেশের বিখ্যাত একজন লেখক হাসি-ঠাট্টা করেছেন। সাধারণত হাসি-ঠাট্টার মধ্যে নির্মল আনন্দ থাকে, কিন্তু সেই লেখকের হাসি-ঠাট্টা ছিল মর্মভেদী। তিনি কখনো কখনো হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাসকে তামাশাচ্ছলে 'উপ-নাশ'ও বলেছেন। 'উপ-নাশের' আবার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিনি। বলেছেন, উপমহাদেশ মানে ক্ষুদ্র মহাদেশ, তেমনি 'উপ-নাশ' মানে সামান্য ক্ষতি। হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস যাঁরা পড়েন, তাঁদের বড় ক্ষতি না হলেও 'উপ-নাশ' তো অবশ্যই হয়। আবার অন্য আরেক ওপন্যাসিক হুমায়ূনের উপন্যাসকে অপরিপক্ক পাঠকের পাঠ্য বলে দাবি করেছেন। বলেছেন, পাঠকদের বয়স কৈশোর ছাড়িয়ে গেলে তারা আর হুমায়ূনের উপন্যাস পড়বে না। তাঁর এই কথাটি কতটুকু অসত্য, তা হুমায়ূনের পাঠকদের বয়স নিয়ে একটা জরিপ চালালে বোঝা যাবে। আমি নিজে অনেক বয়স্ক পাঠককে হুমায়ূনে নিমগ্ন থাকতে দেখেছি। হুমায়ূনের মৃত্যুর পর শেষোক্ত ওপন্যাসিক নানা চ্যানেল ও পত্রপত্রিকায় হুমায়ূনের ভূয়সী প্রশংসা করে বক্তব্য দিতে কার্পণ্য করেননি বা করেননি।

'উপ' উপসর্গ ব্যবহার করে বা বালক-বালিকাদের আনন্দ প্রদানকারী লেখক হিসেবে হুমায়ূন আহমেদের প্রতিভাকে যতটুকু হেলা-অবহেলা তাঁরা দেখান না কেন, বাঙালি পাঠককে ওই হুমায়ূন আহমেদের তাসিয়েছে, ভাবিয়েছেন, কথাসাহিত্যে মগ্ন করিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পর একমাত্র হুমায়ূন আহমেদই বাঙালি পাঠকের ঘুম কেড়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেক উপন্যাস পড়তে পড়তে অর্ধেক পড়া থামিয়ে দিই। আবার কিছু কিছু বই দু'চার বিশ পৃষ্ঠা অশেষ কষ্টে পড়ে আর এগোতে পারি না। তবে এমন উপন্যাসও আছে যা একবার পড়া শুরু করলে, সে যত মোটা বই-ই হোক না কেন, আমাকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে। যেমন সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের 'অলীক মানুষ', রবিশংকর বল-এর 'দোজখনামা', প্রেম চন্দ্রের 'গোদান', মল্লিকা সেনগুপ্তের 'কবির বউঠান', হাসান আজিজুল হকের 'আগুন পাখি', মাহমুদুল হকের 'খেলাঘর' ইত্যাদি।

এসব বইয়ের এক ধরনের মাহাত্ম্য আছে। এঁরা ছাড়াও আমাকে আরেকজন লেখক দখল করে আছেন। তিনি হুমায়ূন আহমেদ। তাঁর সব উপন্যাস যে মহত্ত্বভাষ্য ভরা, উপন্যাসের অভুঙ্গ বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত-এমন নয়। সাধারণ শব্দে, সাধারণ বাক্যে তৈরি মধ্যবিস্তৃত জীবনের সাধারণ ঘটনার সমন্বয়ে তাঁর উপন্যাসগুলো লিখিত। সাধারণ বাঙালি জীবনের আমাদের প্রিয়তর হয়েছে। তাঁর অনেক উপন্যাসে বাক্যগঠনে ভুল

আছে, শব্দের ভুল প্রয়োগও দেখা যায় কোনো কোনো উপন্যাসে। কিন্তু পাঠক ওইসব ভুলত্রুটিকে এড়িয়ে কাহিনীর কাঁধে ভর করে পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছেন। আজ কী এক আশ্চর্য জাদুমন্ত্র বলে পাঠকরা সেদিকে ভ্রক্ষেপ করেন নি। তাঁদের লক্ষ্য থেকেছে হুমায়ূনের জাদুকরী কাহিনীর স্বাদ নেওয়াতে। নাওয়াখাওয়া ভুলে পাঠক হুমায়ূনস্বাদে মগ্ন থেকেছেন। তাঁর কোনো কোনো উপন্যাস পড়ে হতাশ হয়েছি। তারপরও পড়ে গেছি। পড়ে গেছি এজন্য যে, যদি তাঁর সাধারণ মানের উপন্যাস পড়তে পড়তে 'গৌরীপুর জংশন'-এর মতো অসাধারণ তৃপ্তিদায়ক উপন্যাস পেয়ে যাই।

অনেক প্রকাশকের চাপে হুমায়ূন অধিকাংশ সময় দায়িত্বশীল ঔপন্যাসিকের পথ থেকে সরে এসেছেন। সেটা তিনি স্বয়ং অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। গত বছরের নভেম্বর মাসে অন্যপ্রকাশের প্রধান নির্বাহী মাজহারুল ইসলাম এক সাক্ষাৎকারে যখন হুমায়ূন আহমেদকে তাঁর সেরা উপন্যাসের নাম বলতে বললেন, তিনি 'জোছনা ও জননীর গল্প' আর 'মধ্যাহ্ন' উপন্যাসের নামবলে খেমে গেছেন। আমরা তাঁর সেরা উপন্যাস হিসেবে যে 'নন্দিত নরকের কথা' বলি, সেই উপন্যাসকেও তিনি তাঁর সেরা উপন্যাস হিসেবে মেনে নিতে রাজি হলেন না ওই সাক্ষাৎকারে। বললেন, ওই বইয়ের অনেক দুর্বলতা।

উপন্যাসের চেয়ে গল্পের জায়গায় হুমায়ূন আহমেদ শ্রেয়তর বলে আমার মনে হয়। আমার কাছে ঔপন্যাসিক হুমায়ূন যত না প্রিয়, তার চেয়ে অধিক প্রিয় গল্পকার হুমায়ূন। এক শয়ের কাছাকাছি তিনি গল্প লিখেছেন। তাঁর লেখা গল্পগুলোর মধ্যে আমি এখানে দুটো গল্পের নাম উল্লেখ করতে চাই, যা আমাকে মুগ্ধ করেছে এবং উপর্যুক্ত কথাগুলো বলতে সাহসী করে তুলেছে। দুটো হলো— 'নিশিকাব্য' এবং 'জলিল সাহেবের পিটিশন'।

পৌনে সাত পৃষ্ঠার গল্প 'নিশিকাব্য'। সাড়ে চারটা নারী চরিত্র আর তিনজন পুরুষ চরিত্র। পরী, রুনু, বুনু আর মা।

'হুমায়ূন আহমেদ বাংলাদেশের হামিলনের বংশীবাদক। বংশীবাদক ঘরের কোনা থেকে বের করে ইঁদুরগুলোকে নদীজলে আত্মহুতি দিতে বাধ্য করেছিল। তেমন মাদকতাময় ছিল বংশীওয়ালার বাঁশির সুর। হুমায়ূনের সাহিত্য-মাদকতা ও বংশীওয়ালার চেয়ে কম না। হুমায়ূনের আহবানে ঘুমন্ত, অলসতায় নিমগ্ন বাঙালি বইমুখী হয়েছে বাঙালি নিজেকে আত্মহুতি দিয়েছে হুমায়ূনে।'

আর আছে পরীর শিশুকন্যা টুকুন। পুরুষেরা হলো— আনিস, আজিজ আর তাদের বাপ। একরাত্রির ঘটনা। শহর থেকে আনিস এসেছে তার গাঁয়ের বাড়িতে, না জানিয়েই এসেছে। গাঁটি তখন জোছনায় ভেসে যাচ্ছিল। জোছনাপাগল পরী খাওয়াদাওয়ার পাট

চুকিয়ে জোছনা-উৎসবে মগ্ন হয়েছে। নিশ্চিতি রাত। ননদ রুনুকে নিয়ে পরী জোছনা-ধোয়া রাতের জামগাছ, কুয়োতলা, শিরীষ গাছের নিচের ঘন আঁধারকে উপভোগ করছিল। ওই সময় আনিস উপস্থিত হয় পরীর সামনে। স্বামী আনিসের আবির্ভাব অপ্রত্যাশিত। আনিসের আগমনকে ঘিরে ওই বাড়ির মানুষজনদের মধ্যে আনন্দ-বিষাদের কাব্য রচিত হতে থাকে। রুনুর বিয়ে, মায়ের সুখের কান্না-এসব মিলেমিশে গ্রামজীবনের একটা অসাধারণ চিত্র হুমায়ূনের এই গল্পে অঙ্কিত হয়েছে। আত্মীয় ঘেরা আনিস থেকে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে পরী স্বামীর অস্তিত্বকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে অনুভব করতে থাকে। আনিস যখন বলে যে, এখানে তার অবস্থান শুধুমাত্র আজ রাতের জন্যে, তখন পরীর অনুভবে বিষাদ লাগে। শেষ রাতের দিকে সামান্য সময়ের জন্যে পরী কাছে পায় তার স্বামীকেই কিন্তু সে সময়টুকুও ব্যয় হয় কন্যা টুকুনের প্রসঙ্গে। বিয়ের শাড়ি পরে পরী আনিসকে নিজের কাছে পেতে চায়। কিন্তু স্বামীসান্নিধ্য পরী পায় না। যাত্রার সময় ঘনিয়ে আসে। আনিসের আঁকা ডাক দেয়, 'এখন রওনা না দিলে ট্রেন ধরতে পারবি না, বাবা।'

স্বপ্নের এই আহ্বান পরীর সান্নিধ্যসুখকে ভেঙে ছিন্নমার করে দেয়। নিশিতে যে গল্পের শুরু, রাত শেষ হবার আগেই সেই গল্পের সমাপ্তি ঘটে।

স্বামীসঙ্গ বঞ্চিত একজন নারীর হৃদয়কে অসাধারণ দক্ষতায় ঝাঁকেছেন হুমায়ূন আহমেদ। ছোটগল্পের কারিগর বলেই হুমায়ূন আহমেদ 'নিশিকাব্যে'র মতো একটা গল্প লিখতে পেরেছেন।

প্রত্যেক বাংলাদেশির অন্তরে একবার পড়া উচিত হুমায়ূন আহমেদের 'জলিল সাহেবের পিটিশন' গল্পটি। পড়া পড়তে পড়তে আমার মধ্যে দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছে। প্রথম দিকে মনটা বিষাদে ছেয়ে গেছে। স্বাধীনতায়ুদ্ধে দু-দুজন পুত্র হারানো জলিল সাহেবের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহের ব্যাপারটা আমাকে যতটুকু উদ্দীপিত করেছে, তার চেয়ে বেশি বেদনাক্রান্ত করেছে। উদ্দীপিত করেছে এজন্যে যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় নিরপরাধ ত্রিশ লক্ষ মানুষের হত্যাকারীদের বিচারের দাবি বাংলাদেশে অন্তত একজন মানুষ করছেন। পরিসমাপ্তি যাই হোক, অপরাধের বিচার তো চাইতে শুরু করেছেন জলিল সাহেব। আর বেদনা এজন্যে যে, স্বাধীনতার পরে এত বছর কেটে গেল, অপরাধীদের শাস্তি হলো না। আমার মতো জলিল সাহেবের কথাতেও সে বেদনা ফুটে উঠেছে, 'আপনি কি মনে করছেন আমি ছেড়ে দেব? ছাড়ব না। আমার দুই ছেলে ফাইট দিয়েছে। আমিও দেব। মৃত্যু পর্যন্ত ফাইট দেব। দরকার হলে বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের সিগনেচার জোগাড় করব। ত্রিশ লক্ষ লোক মারা গেল আর কেউ কোনো শব্দ করল না?' শব্দ করা শুরু হয়ে গেছে, বিচার

হচ্ছে যুদ্ধাপরাধীদের। গল্পটা যখন লিখেছিলেন হুমায়ূন আহমেদ, তখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করে শুধু একজনই সোচ্চার হয়েছিলেন, তিনি জলিল সাহেব। কিন্তু আজ লক্ষ কোটি কণ্ঠ থেকে জোর দাবি উঠেছে- 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই'।

জলিল সাহেব যে কাজ অসমাপ্ত রেখে মারা গিয়েছিলেন, সেই অসমাপ্ত কাজের পুনরায় শুধু হয়তো ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকটি দিয়ে সম্ভব হয়নি। জলিল সাহেবের স্বপ্নের মৃত্যু ঘটেছিল সেদিন কিন্তু আজকের বাংলাদেশের কোটি কণ্ঠ জলিল সাহেবের কণ্ঠে রূপান্তরিত হয়েছে।

'নিশিকাব্যের চেয়ে আকারে সামান্য বড় 'জলিল সাহেবের পিটিশন' গল্পটি। বড়জোর চৌদ্দশ' শব্দে রোপণ করেছেন। জলিল সাহেবের স্বপ্ন আজ সার্থক হচ্ছে।

বলা হয়ে থাকে-সাহিত্যিকরা ভবিষ্যৎ-দ্রষ্ট। হুমায়ূন আহমেদ 'জলিল সাহেবের পিটিশন' গল্পটি লিখে সেই কথারই প্রমাণ দিয়েছেন। এই দেশের প্রকৃত দেশপ্রেমিকের কাছে এই গল্পটি শেষ পর্যন্ত আর নিছক গল্প থাকে না, জীবন-বাস্তবতার দলিলে রূপান্তরিত হয়।

হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যু আমাদের শোকাহত করেছে সত্যি, তবে তাঁর মৃত্যু যাতে বাঙালি পাঠককে স্থবির না করে।

একজন হুমায়ূনের পথ ধরে আরও অনেক হুমায়ূনের যেন আবির্ভাব ঘটে এই বাংলাদেশে।

হরিশংকর জলদাস

হুমায়ূন আহমেদের ধর্মচেতনা

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে হুমায়ূন আহমেদ ইতোমধ্যেই প্রবাদ পুরুষতম এবং এক জীবন্ত কিংবদন্তী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে রেখে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই যে এই স্বীকৃতি এসেছে এমনটা নয়, বরং জীবিত থাকাকালীনই দুই বাংলার কথাসাহিত্যে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী হিসেবে তাঁর আবির্ভাবকে সকলেই বিশ্বয়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন।

হুমায়ূন আহমেদ বাংলা সাহিত্যে এমন একটা স্তরে প্রবেশ করেছিলেন যে, তাঁর সৃষ্টি-জগৎ নিয়ে বহুবিধ তত্ত্বালোচনা ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচার প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠবে। বিশেষ করে ধর্মান্দর্শ ও স্রষ্টা চেতনা তাঁর সৃজনশীল রচনা সমগ্রের অন্যতম স্পর্শকাতর বিষয় হিসেবে সমালোচকদের সামনে চলে এসেছে।

সকল সৃষ্টিশীল মানুষের জন্যই অবশ্য সব সময় একটা সমস্যা এসে দাঁড়ায় যে, পাঠক স্রষ্টা অথবা ধর্মমতে শিল্পীর অবস্থান কোথায় তা পরখ করে দেখতে চায়। সৃজনশীলদের জন্য এ সমস্যা দুনিয়া জোড়া। সাধারণ মানুষ অনেক সময় সরাসরি এ সম্পর্কে শিল্পীর মতামত প্রত্যাশা করে। সাধারণ কখনো কখনো তাঁর লেখালেখি বা দর্শন থেকে এর উত্তর খুঁজে নেয়। সেজন্য দেখা যায়, লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী কিংবা সংস্কৃতিসেবী অথবা সমাজনেতা তাঁর নিজস্ব কাজের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন ধর্ম সম্পর্কে তাঁর নীতিবাদিতার প্রকাশটিতে। মানুষ অনেক সময় এমনিতেই তার প্রিয় লেখক, শিল্পী অথবা বিজ্ঞানীকে ধর্ম সম্পর্কে সন্দেহ করে থাকে অথবা তাঁর সম্পর্কে প্রচারিত তথ্যে বিভ্রান্ত থাকে। অনেক সময় শিল্পী নিজেও তাঁর ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে পর্যন্ত এ থেকে মুক্তি পেতে দেখি না। এই বিজ্ঞানী মনীষীকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন? আইনস্টাইন উত্তর দিচ্ছেন, 'আমি নিরীশ্বরবাদী নই। কিন্তু সমস্যাটা এতই জটিল যে আমাদের সীমিত বুদ্ধিতে তা কুলায় না।'

তবে হুমায়ূন আহমেদের সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত ভাবনা ও ধর্মানুভূতি অন্যরকম। এখানে কোনো রাখঢাক নেই। আলাদা কোনো দর্শন নেই। একেবারেই চিরপ্রচলিত 'ট্রাডিশনাল' সৃষ্টিকর্তাকেই তিনি সামনে রেখেছেন। তবে তাঁর সৃষ্টিকর্তা ও ধর্ম সম্পর্কিত চেতনা খানিকটা বুদ্ধিবৃত্তিক ও উদার জাগতিক মানুষের। স্রষ্টার প্রতি তাঁর ভালোবাসা চিরসবুজ এবং অনেকটা লোকজ আন্তরিকতায় পূর্ণ।

হুমায়ূন আহমেদের ধর্মচেতনা বিষয়ের এই নিবন্ধে তাঁর কথাসাহিত্যকে বাদ রাখা হয়েছে এই জন্য যে, লেখক-কবির মানস চেতনা তাঁর সৃজনশীল কর্মে কখনো কখনো আবেগ ও কাহিনীর পরিবেশকে মূর্ত করতে ফুটে উঠে। লেখক-কবির একান্ত ব্যক্তিগত চেতনা প্রকৃতপক্ষে এখানে প্রতিফলিত হয় না। বরং চরিত্রগুলোর স্বতঃস্ফূর্ত প্রণোদনাই এক্ষেত্রে বেশি ক্রিয়াশীল থাকে।

এ ব্যাপারে লেখক-শিল্পীদের মধ্যে মতদ্বৈততা আছে। কেউ মনে করেন, লেখকের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের নানা রকম কথা কে উপস্থাপন করেন। এ ব্যাপারে কথাসাহিত্যিক ইমদাদুল হক মিলন বলেন, একজনের লেখা পড়ে আমরা কি বুঝতে পারব না, সে কোন ধরনের মানুষ ...

একজন লেখক জীবনের নানা রকম কথা তাঁর লেখার বিভিন্ন চরিত্রের মধ্য দিয়ে বলেন।

অন্যদিকে হুমায়ূন আহমেদ মনে করেন না, লেখকের লেখা থেকে তাঁর প্রকৃত মানসচেতনা বোঝা যেতে পারে। লেখালেখিতে জীবনবাদী হয়েও অনেক লেখক-কবি নিজেরাই আত্মহত্যা করেছেন। এ ব্যাপারে হুমায়ূন আহমেদ বলেন,

হেমিংওয়ের লেখা পড়ে আমরা কখনোই বুঝতে পারি না যে, হেমিংওয়ে নিজেকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারেন। তিনি আসলে জীবনবাদী একজন লেখক তাঁর লেখা পড়ে যদি তাঁকে আমরা বিচার করতাম, তাহলে কিন্তু আমরা একটা ধাক্কা খাব। মায়কোভস্কি পড়ে কখনোই বুঝতে পারব না যে, মায়কোভস্কি আত্মহত্যা করার মানুষ। আমরা কাওয়াবাতা পড়ে কখনোই বুঝতে পারব না যে, কাওয়াবাতা হারিকিরি করে নিজেকে মেরে ফেলবেন। ঐরা প্রত্যেকেই জীবনবাদী লেখক। জীবনবাদী লেখকদের পরিণতি দেখা গেল ভয়ংকর। তার মানে কী? তার মানে কী দাঁড়ায়? লেখকরা কি সত্যি সত্যি তাঁদের লেখায় নিজেকে প্রতিফলিত করেন? নাকি তাঁদের শুদ্ধ কল্পনাকে প্রতিফলিত করেন।

তবে লেখকের ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা, ডায়েরি, চিঠিপত্র এবং এ জাতীয় পদ্যরচনা যা লেখকের ব্যক্তিগত অনুভূতিজাত হয়ে থাকে তা লেখক বা কবির প্রকৃত মানসচেতনাকে খুঁজে পেতে সাহায্য করে। হুমায়ূন আহমেদের এরকম ৫টি গদ্যগ্রন্থ, যাতে কিছুটা স্মৃতিকথামূলক রচনার প্রাধান্য রয়েছে এবং রয়েছে সামাজিক কর্মকাণ্ডের ছবি, এখানে তাঁর মানস চেতনার ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এই নিবন্ধ রচনায় তাই এ গ্রন্থগুলোকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থগুলো নিম্নরূপ :

১. বলপয়েন্ট, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা ২০০৯

২. কাঠপেন্সিল, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা ২০১০

৩. রঙ পেন্সিল, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা ২০১১

৪. ফাউন্টেনপেন, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা ২০১১

৫. নিউইয়র্কের নীলাকাশে বকবকে রোদ, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা ২০১২।

উপরিউক্ত গ্রন্থগুলোতে হুমায়ূন আহমেদের সৃষ্টা কল্পনা ও ধর্মভাবনা অত্যন্ত আন্তরিক ও তক্ত হৃদয়ের। কোথাও এ চেতনা সংযত ও পরিশীলিত, আবার কোথাও তা বিমুক্ত দৃষ্টির। সৃষ্টা এবং তাঁর প্রতিনিধির বাণী তিনি নির্বিবাদে ব্যবহার করেছেন তাঁর (হুমায়ূনের) অন্তর্নিহিত বিশ্বাস থেকে। এ পটভূমিতে তাঁর উল্লিখিত গ্রন্থগুলিতে তাঁর ধর্মচেতনা নিম্নোক্তভাবে ধরা পড়ে।

১. শৈশবে-কৈশোরের পরিবেশ পরিমণ্ডলে লেখকের ধর্মানুভূতির উন্মোচন
২. বয়োজ্যেষ্ঠাদের আচার-আচরণে প্রকাশিত ধর্মবোধ লেখকের পর্যবেক্ষণ
৩. বহিরাগত ধর্মবোধ থেকে নিজের অভিব্যক্তি
৪. সৃষ্টা সম্পর্কে সরাসরি তার আকৃতি
৫. কোরান-হাদিস থেকে সরাসরি তত্ত্বকথা ব্যবহার

‘মানুষ অনেক সময় এমনিতেই তার প্রিয় লেখক, শিল্পী অথবা বিজ্ঞানীকে ধর্ম সম্পর্কে সন্দেহ করে থাকে অথবা তাঁর সম্পর্কে প্রচারিত তথ্যে বিভ্রান্ত থাকে। অনেক সময় শিল্পী নিজেও তাঁর ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে পর্যন্ত এ থেকে মুক্তি পেতে দেখি না। এই বিজ্ঞানী মনীষীকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন? আইনস্টাইন উত্তর দিচ্ছেন, ‘আমি নিরীশ্বরবাদী নই। কিন্তু সমস্যাটা এতই জটিল যে আমাদের সীমিত বুদ্ধিতে তা কুলায় না।’

৬. ইসলামের সুফিবাদে তার আগ্রহ
৭. ধর্মীয় বিষয় নিয়ে হাস্যরস
৮. বেহেশত নিয়ে অনুভূতি
৯. জ্বিন-ভূত সম্পর্কিত ধর্মীয় দলিল ব্যবহার
১০. মাজার ও মন্দির নিয়ে উদার উচ্ছ্বাস
১১. দোয়ায় আস্থা
১২. দুনিয়া-আখেরাত সম্পর্কে উপলব্ধি
১৩. কবরস্থান প্রীতি
১৪. বিভিন্ন ধর্মের উদার-অনুদার নীতি প্রসঙ্গ
১৫. আস্তিক্য-নাস্তিক্যবাদ প্রসঙ্গ।

হুমায়ূন আহমেদের বিশাল রচনাসমগ্রের আত্মস্মৃতিমূলক গণ্যরচনা থেকে উপরিউক্ত বিষয়সমূহের একটি অনুপুঞ্জ বিশ্লেষণ অপেক্ষিত। এখানে উল্লেখ প্রয়োজন যে, বাংলাদেশে ফতোয়ার রাজনৈতিক ব্যবহারের শিকার একসময় হুমায়ূন আহমেদও হয়েছিলেন। তাঁকে রাজনৈতিক-আলেমরা ‘মুরতাদ’ খেতাবও দিয়েছিল। এ নিয়ে তৎপর মধ্যে একটা কষ্টবোধ দেখতে পাই, .

...এমন কিছু লিখে ফেললাম যা ধর্মগ্রন্থ স্বীকার করে না তাহলে মহাবিপদ। ... আমাকে মুরতাদ ঘোষণা করা হতে পারে। অতীতে আমাকে একবার মুরতাদ ঘোষণা করা হয়েছে। বারবার মুরতাদ হওয়া কোনো কাজের কথা না।

শৈশব-কৈশোরের পরিবেশে ধর্মানুভূতির উন্মেষ

হুমায়ূন আহমেদের ধর্মীয় চেতনার বিকাশের পটভূমিতে রয়েছে তাঁর কৈশোর-শৈশবের পরিবেশ। এ পরিবেশের বেড়া জালে প্রোথিত রয়েছে তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনার শেকড়। তাঁর নিজস্ব বয়ানে শোনা যেতে পারে:

আসলে আমি মানুষ হয়েছি অদ্ভুত পরিবেশে। একা একটি বাড়ির অগুনতি রহস্যময় কোঠা। বাড়ির পেছনে জড়াজড়ি করা বাঁশবন। দিনমানেই শেয়াল ডাকছে চারদিকে। সন্ধ্যা হব-হব সময়ে বাঁশবনের একাঙ্গী-ওখানে জ্বলে উঠছে বেতের আগুন। দোতলার বারান্দায় পা ছড়িয়ে বিচিত্র সুরে কোরআন পড়তে শুরু করেছে কানবিধি। সমস্তই অবিমিশ্র ভয়ের।

এখানে ‘বিচিত্র সুরে কোরআন’ এবং ‘দূলে দূলে কোরআন-পাঠ’ শুনলেই বুকের ভেতর ধক্ করে উঠার বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। লেখকের শিশুমনে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়েছিল। কোরআনের পর কালেমা পড়ার বিষয়টিও তাঁর শৈশবের ঘটনাবলিতে দাগ কেটেছিল,

আমি এসেছি অতি কঠিন গোড়া মুসলিম পরিবেশ থেকে। আমার দাদা মাওলানা আজিমুদ্দিন আহমেদ ছিলেন মাদ্রাসা শিক্ষক। তাঁর বাবা জাহাঙ্গির মুন্সি ছিলেন পীর মানুষ। আমার দাদার বাড়ি ‘মৌলবিবাড়ি’ নামে এখনো পরিচিত।

একবার বড় ঈদ উপলক্ষে দাদার বাড়িতে গিয়েছি। আমার বয়স ছয় কিংবা সাত। দাদাজান ডেকে পাঠালেন। বললেন, কলেমা তৈয়ব পড়। আমি বললাম, জানি না তো। দাদাজানের মুখ গম্ভীর হলো দাদিজান আমার তাত্ক্ষণিক শাস্তি পক্ষে। তিনি বললেন, পুলারে শাস্তি দেন। শাস্তি দেন। ধামড়া পুলে, কলেমা জানে না।

দাদাজান বিরক্তমুখে বললেন, সে ছোট মানুষ। শাস্তি তার প্রাপ্য না। শাস্তি তার বাবা-মার প্রাপ্য।

বোঝা যায়, ‘অতি কঠিন গোড়া মুসলিম পরিবেশ’ থেকেই তিনি এসেছিলেন। কিন্তু পেয়েছিলেন উদার পরিবেশ। কারণ ‘কালেমা’ না বলতে পারায় তাঁর কোনো শাস্তি হয় নি। বরং বলা হয়েছে, সে ছোট মানুষ। শাস্তি তার প্রাপ্য না।

নানারকম ধর্মবোধের মানুষ থেকে সতর্ক মন এই ধর্মীয় চেতনাসমৃদ্ধ জ্ঞানী পরিবেশ হুমায়ূন আহমেদের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল এবং ধর্মের প্রকৃত ভাব ও চেতনা সম্পর্কেও তিনি পূর্ব থেকেই জ্ঞান-সমৃদ্ধ ছিলেন। তার রেখাপাতটি দেখতে পাই, যখন কেউ তাকে ধর্মীয়ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে এসেছে, তখন তিনি কখনো বিব্রত, কখনো দ্বিধা-সংকটে ভুগেছেন,

প্রতি রবিবার আরেক যজ্ঞণা। বুড়ি আমাকে চার্চে নিয়ে যাবে।

আমি বললাম, আমি মুসলিম। আমি কেন চার্চে যাব?

বুড়ি বলল, গডের চার্চে সব ধর্মের লোক যেতে পারে।

শুধু এতেই নয়, ব্যথিত হয়েছে তাঁর মন, যখন দেখেছেন ধর্ম নিয়ে সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষমূলক কর্মসূচি হচ্ছে :

গুত্রবার মুসলমানদের জন্যে পবিত্র একটি দিন। খ্রিস্টানদের রবিবার, ইহুদিদের শনিবার। সপ্তাহের তিন দিন, তিন ধর্মাবলম্বীরা নিয়ে নিয়েছে।

গুত্রবার মুসলমানদের পবিত্র দিন। কেই কি আমেরিকানরা ‘কালো গুত্রবার’ আবিষ্কার করল?

তাঁর বেদনাটা এখানে অস্বীকার্য মানুষ হিসেবে। আমেরিকানরা সমগ্র দুনিয়াকে গণতন্ত্রের বুলি শেখায় এবং ফে-কতখানি ধর্মীয় ঔদার্য দেখাতে পেরেছে, দেশ বার্ষিক সনদ বিবরণী ধরে ধরে তৈরি করে তারা। অথচ তাদের ভেতরে কী গরল অবস্থা। হুমায়ূন আহমেদ তা পর্যবেক্ষণ করেছেন গভীর বেদনার সঙ্গে।

কোনো বিষয়ে লক্ষ করা যায়, তা যদি হয় ইসলাম ধর্মের মধ্যেই যা তাঁর কাছে যখন খটকা লেগেছে, তখন তিনি তাঁর ঔচিত্যবোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কিন্তু প্রশ্নটি তুলেছেন ইতিবাচকভাবে,

আমাদের অতি পবিত্র স্থান মক্কা শরীফে অমুসলমানদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। আমাদের নবীজি (সঃ)-র জীবদ্দশায় অনেক অসুসলমান সেখানে বাস করতেন। কাবার কাছে যেতেন। তাদের উপর কোনোরকম বিধিনিষেধ ছিল বলে আমি বইপত্রে পড়ি নি। ধর্ম আমাদের উদার করবে। অনুদার করবে কেন?

এখানে ‘অতি পবিত্র স্থান মক্কা শরীফ’ এবং ‘নবীজি (সঃ)’ শব্দ ও বাক্য দুটি একনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণের দাবি রাখে। গভীর মমত্ববোধ থেকেই তিনি ‘অতিপবিত্র’

এবং 'নবীজি' উচ্চারণ করেন। যে বিষয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, সে বিষয়ে তথ্য জানার ঘাটতি থাকতে পারে, এর হয়তো একটি ইসলামি-ব্যাক্তাও আছে, কিন্তু তাঁর প্রশ্নের মধ্যে ধৃষ্টতা নেই। বরং তিনি মনে করেছেন, ধর্ম মানুষকে উদারই করার কথা, অনুদার নয়।

স্রষ্টার প্রতি অগাধ আস্থা

হুমায়ূন রচনাবলী অনুপূজ্যভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ধর্ম এবং স্রষ্টার প্রতি তাঁর ছিল বরাবর অগাধ আস্থা। সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর মহত্ত্ব ও বড়ত্ব প্রকাশে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। বিভিন্ন রচনার ফাঁকে ফাঁকে এসেছে এমন অনেক বাক্য :

আমার সেই মহান ম্যাজিসিয়ানের স্বরূপ জানতে ইচ্ছে করে, যিনি আমাদের সবাইকে অন্তহীন ম্যাজিকে ডুবিয়ে রেখেছেন।

এসব মন্তব্য ও সংলাপে রয়েছে স্রষ্টার প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা। এতে তাঁর ধর্মপ্রাণতার প্রবণতাকে প্রকাশ করে। সকল ক্ষেত্রেই এরকম একজন আন্তিক মানুষের ছায়া ঘুরে বেড়ায় হুমায়ূন রচনাবলির পরতে পরতে।

কোরআন-হাদিসের স্মৃতিস্তম্ভ প্রচার

পবিত্র কোরআন ও হাদিস সম্পর্কে হুমায়ূন আহমেদের অগাধ পাণ্ডিত্য যে-কোনো ধর্মবেত্তাকে বিস্মিত করবে। তিনি তাঁর বিভিন্ন লেখায় কোরআন-হাদিসের বিভিন্ন উদ্ধৃতি অকাতরে ব্যবহার করেছেন। এই অকাতর ব্যবহারের আধিক্য দেখে অনুমিত হয়, পাঠকমহলে প্রচার করতে চেষ্টা করেছেন। এতে তাঁর ধর্মপ্রাণতার দ্বায়ী (দ্বীনের কথার প্রচারক অথবা তবলিগ) স্মৃতিস্তম্ভ উদঘাটিত হয়। এটা তিনি করেছেন স্বচ্ছন্দে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে। যেমন, একটি গদ্য রচনায় 'বিগ ব্যাং' সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি কোরআনের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন,

আমাদের পবিত্র কোরআন শরিফে সৃষ্টির শুরু ঘটনা ঠিক এভাবেই উল্লেখ করা আছে। সূরা আশ্বিয়ায় বলা হয়েছে— 'অবিশ্বাসীরা কি দেখে না যে, সকল আকাশ এবং ভূমন্ডল একটি একক ছিল এবং আমরা তাকে বিচ্ছিন্ন করলাম?'

গাছপালা ও বৃক্ষরাজি সম্পর্কে হুমায়ূন আহমেদের আগ্রহ বহুল প্রচারিত। বৃক্ষ দিয়ে বিশাল বনমালা গড়ে তোলার প্রচেষ্টাও বাস্তব জীবনে তিনি করে দেখিয়েছেন। এ সম্পর্কে তাঁর একটি বিশেষ আগ্রহ লক্ষণীয় :

গাছপালা বিষয়ে নবীজী (দঃ)-র একটি চমৎকার হাদিস আছে। তিনি বলছেন, মনে করো তোমার হাতে গাছের একটি চারা আছে। যে-কোনোভাবেই হোক তুমি জেনে ফেলেছে পরদিন রোজ কেয়ামত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপরেও গাছের চারাটি তুমি মাটিতে লগিয়া।

এ প্রসঙ্গে প্রচলিত নানারকম 'ভ্রান্তিমূলক হাদিস' সম্পর্কেও তাঁর সতর্কতা লক্ষ্য করি এবং সেগুলো সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করতেও তিনি ভুলেন না :

নবিজী (দঃ) বলেছেন, 'বিদ্যা শিক্ষার জন্যে সুদূর চীনে যাও ।' আমি বলছি, ভাষা শিক্ষার জন্যে শিশুদের কাছে যাওয়া যেতে পারে ।

এখানে বিদ্যা শিক্ষার জন্য সুদূর চীনে যাওয়া প্রসঙ্গের হাদিসটি সম্পর্কে ওলামা হযরতদের মন্তব্য স্মর্তব্য । এ প্রসঙ্গে মুফতি মাহমুদুল আমীন বলেন,

হুমায়ূন আহমেদের এ বিষয়ক অনুসন্ধানটি সঠিক । এটি আসলে একটি ভুয়া হাদিস । সহি হাদিস গ্রন্থগুলোতে এ রকম কোনো হাদিসের উল্লেখ পাওয়া যায় না । [সাক্ষাৎকার মুফতি মাহমুদুল আমীন, পরিচালক, মাহাদুল বুহসিল ইসলামিয়া উচ্চতর ইসলামি শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, চরওয়াশপুর, বসিলা, ঢাকা] ।

বেহেশত প্রসঙ্গে তাঁর আশ্রয় ও ধারণা

জান্নাত অথবা বেহেশত প্রসঙ্গে হুমায়ূন আহমেদের আশ্রয়কে আমরা লক্ষ্য করি । তবে এ ব্যাপারে তার ধারণায় একটা নিজস্ব দর্শন আছে, কিন্তু ধর্মের সঙ্গে তা সাংঘর্ষিক হয়নি,

পবিত্র কোরআন শরিফের একটি আয়াতে আল্লাহপাক বলেছেন, 'এবং বেহেশতে তোমরা প্রবেশ করবে ঈর্ষামুক্ত অবস্থায় ।'

এর সরল অর্থ, শুধু বেহেশতেই মানুষ ঈর্ষামুক্ত, ধূলা কাদার পৃথিবীতে নয় । বিস্ময়কর হলেও সত্যি, ঈর্ষা এক অর্থে আমাদের চালিকাশক্তি । মানব সভ্যতার বিকাশের জন্যে ঈর্ষার প্রয়োজন আছে । বেহেশতে যেহেতু সভ্যতা বিকাশের কিছু নেই, ঈর্ষার প্রয়োজন নেই ।

বেহেশতে গিয়েও তিনি বই পড়তে চেয়েছেন,

আমি নানা ধর্মগ্রন্থ ঘেঁটেছি একটা বিষয় জানার জন্যে-বেহেশত বা স্বর্গে কি কোনো লাইব্রেরি থাকবে? সুখাদ্যের বর্ণনা আছে, অপূর্ব দালানের কথা আছে, উৎকৃষ্ট মদ্যের কথা আছে, রূপবতী তরুণীর কথা আছে, বহুমূল্য পোশাকের কথা আছে, সঙ্গীতের কথা আছে । লাইব্রেরির কথা নেই ।

লাইব্রেরি হচ্ছে মানুষের চিন্তা এবং জ্ঞানের ফসল । বেহেশতে হয়তো মানুষের চিন্তা এবং জ্ঞানের প্রয়োজন নেই । সেখানকার চিন্তা অন্য, জ্ঞান অন্য । বিপুল চিন্তা, বিপুল জ্ঞান ।

অনেক সময় দেশের প্রতি প্রবল ভালোবাসায় তিনি নিজ দেশকে বেহেশতের সঙ্গে তুলনা করেছেন । এটা এক ধরনের আবেগ থেকে জাত । প্রকৃতপক্ষে বেহেশতের সঙ্গে তুলনা নয়—

নোভা চোখ বড় করে শোনে। একদিন সে বলল, আমাদের দেশটা a piece of paradise', তাই না বাবা?

আমি বললাম, অবশ্যই তাই। তবে একটু ভুল করেছে। আমি নিশ্চিত, paradise এত সুন্দর না।

আমি অতি ভাগ্যবান, আমি আমার জীবন paradise-এ কাটিয়ে দিতে পারছি। আমার মেয়েটা ভাগ্যবতী না। তার জীবন কাটছে আমেরিকায়। সে এবং তার স্বামী নাকি ঐ দেশের নাগরিকত্বও পেয়েছে।...

‘তবে হুমায়ূন আহমেদের সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত ভাবনা ও ধর্মানুভূতি অন্যরকম। এখানে কোনো রাখঢাক নেই। আলাদা কোনো দর্শন নেই। একেবারেই চিরপ্রচলিত ‘ট্রাডিশনাল’ সৃষ্টিকর্তাকেই তিনি সামনে রেখেছেন। তবে তাঁর সৃষ্টিকর্তা ও ধর্ম সম্পর্কিত চেতনা খানিকটা বুদ্ধিবৃত্তিক ও উদার জাগতিক মানুষের। স্রষ্টার প্রতি তাঁর ভালোবাসা চিরসবুজ এবং অনেকটা লোকজ আন্তরিকতায় পূর্ণ।’

এরকম আরও দেখি জ্যোৎস্নারাত নিয়েও। তাঁর প্রিয় ছিল জ্যোৎস্নারাত। এখানে এই নিয়ে বেহেশতের প্রসঙ্গও এসেছে। ব্যাপারটা এই নয় যে, বেহেশতেও এটা পাওয়া যাবে না, আসলে রাতের মাধুর্য বড় করে দেই এই অলংকারের ব্যবহার,

এক সন্ধ্যায় হাসিমুখে আমাকে বলল, ও আইজা ব্যাটা, আইজা যে পুরা চান্নি হেই খিয়াল আছে? চান্নি দেখতে যাবা না? যত্নসহকারে দেইখ্যা লও। এই জিনিস বেহেশতেও পাইবা না।

কবরস্থানস্রীতি

মানুষের স্থায়ী ঠিকানা হল কবরস্থান। এ নিয়ে মানুষের কৌতূহল কম, ভীতি বেশি। মানুষ কবর নিয়ে, মৃত্যু নিয়ে বেশি ভাবতে চায় না। হুমায়ূন আহমেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে দেখি ঠিক এর বিপরীত। তিনি কারণে-অকারণে কবরস্থানে গিয়ে হাজির হয়েছেন :

আমার বৈকালিক ভ্রমণে পিরোজপুর গোরস্থান একটি বিশেষ জায়গা দখল করে ফেলল। প্রায়ই সেখানে যাই, কবরের গায়ে রেখা নামগুলি পড়ি। বৃদ্ধ কেয়ারটেকারকে দেখি কবর পরিষ্কার করছেন। ঝোপঝাড় কাটছেন তিনি আর কখনো নামাজ পড়তে পারেননি। তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তা তেমন হতো না। একদিন শুধু বললেন, আপনার কোনো আত্মীয়স্বজন কি এখানে আছেন?

আমি বললাম, না।

তাহলে রোজ আসেন কেন?

আমি চুপ করে রইলাম। জবাব দিতে পারলাম না। বৃদ্ধ বিড়বিড় করে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাপাকের কোনো ইশারা আছে বইল্যাই আপনে আসেন। -মোহাম্মদ হান্নান

হুমায়ূন, কান পেতে শুনছি আপনার 'অন্ধকার গান'

প্রিয় ঔপন্যাসিক।

কাল মাঝরাতে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছিল সদ্য ছেড়ে যাওয়া আপনার এই প্রিয় শহরে। বৃষ্টির তুমুল শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বৃষ্টিভেজা বাতাসের ঝাপটায় কেঁপে কেঁপে উঠেছিল জানালার শার্সি। ঘুমভাঙা চোখে আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম রাতের বৃষ্টিকে, বাতাসে ভর করে তার ওড়াউড়ি আর নাচানাচিকে। এই বর্ষায় এমন অঝোর বৃষ্টি এর আগে আর নামেনি। চুপচাপ অন্ধকারে বসে এই বৃষ্টির গান শুনতে শুনতেই মন পড়ে গেল আপনার 'অন্ধকারের গান' উপন্যাসটির কথা। হঠাৎ করে যে মনে পড়ে গেল—তা নয়। আসলে তা মনের মধ্যেই ছিল। ঘুমের আচ্ছন্নতা কেটে যেতেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠল। কেননা গতকাল সারা দিন আমি আপনার এই উপন্যাসটির মধ্যেই মুখ গুঁজে ছিলাম।

১০৪ পৃষ্ঠার একটা উপন্যাস শেষ করতে সারাদিন জাগার কথা নয়। কিন্তু রাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আমি আপনার এই বইটির মধ্যেই মগ্ন হয়েছিলাম। মাঝখানে কিছুক্ষণের ঘুম। তারপর হঠাৎ করে ঘুম ভাঙানিয়া শ্রাবণধারার শব্দে জেগে উঠে বৃষ্টির নাচন দেখতে দেখতে, তার চক্ৰময় সংগীত শুনতে শুনতে আবার সেই 'অন্ধকারের গান'-এর বিষণ্ণ জগতে ফিরে যাওয়া। ফিরে যাওয়া-উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বীণা ও তার পরিবারের কষ্ট-সেখানে এখন আর সেই সপ্রতিভ তরুণ বুলু নেই। পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় দুঃখ এবং পায়ের ক্ষত নিয়ে সে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু আর ফিরে আসেনি। অলিক চলে গেছে সাগরপারে। নিঝুম দুপুরে কুয়োতলায় একা একা বসে আছে বীণা। গতকাল থেকে আমার জন্যও সেখানে একটা আসন পাতা হয়ে গেছে। কাল থেকে আমিও হয়ে পড়েছি তার জীবনকাহিনীর একজন সমব্যথী পাঠক। শ্রোতা এবং দর্শক। আপনি আপনার গল্প-উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের সমুদয় সুখ-দুঃখকে এমনভাবে পাঠকের বোধ-বিচার ও উপলব্ধির সঙ্গে একীভূত করে দেন যে এক অচ্ছেদ্য আত্মীয়তাসূত্রে তখন তাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া ছাড়া আমাদের গতান্তর থাকে না। আপন সৃষ্ট চরিত্রের সঙ্গে লেখক থাকেন নাড়ির বাঁধনে বাঁধা আর তাঁর লেখনীর জাদুমন্ত্রে পাঠক হয়ে পড়েন মায়ার ঘোরে আচ্ছন্ন। অতএব আপনি, আমি এবং বীণা গতকাল থেকে তাদের বাড়ির বহু পুরনো কুয়োতলাতেই অবস্থান করছি। কথা বলছি। পায়চারি করছি। এবং আপুত হচ্ছি একই হৃদয় বেদনার সিক্ত অনুভবে। তবে আমি সেখানে যোগ দিলাম আপনার ২৩ বছর পর—মাত্র গতকাল। মাঝখানে নিঃশব্দে ঘুমিয়ে আছে ২৩ বছরের অলিখিত উপাখ্যান।

‘এমনি বরষা ছিল সেদিন’-২৩ বছর আগের এক মস্ত আষাঢ়-সন্ধ্যায় কাকভেজা অবস্থায় আপনি এসে দরজায় কড়া নেড়েছিলেন। আজকের সকালের মতো সেদিনের সেই বিদ্যুৎ শিখা ভরা সন্ধ্যায় কাচের জানালার সামনে বসে আমি বাইরের মেঘ-বৃষ্টি-বাতাস আর সৌদামিনীর নাচ দেখছিলাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো সেই কবেই এমন দিনে সকলকে ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করে গেছেন। কিন্তু সেই নিষেধ আমার মতো ঘরকুনো মানুষের জন্য শিরোধার্য হলেও হুমায়ূন আহমেদের মতো সৃষ্টিপাগল গানপাগল আর বৃষ্টিপাগল মানুষের জন্য নিশ্চয়ই নয়। বরং ঝড়-বৃষ্টি-মেঘ, আরও বেশি বেশি করে তাদের ঘরের বাইরে বের হওয়ার উৎসাহ যোগায়। অতএব এমন সন্ধ্যায় সৃষ্টি সুখের উল্লাসে ভরা হুমায়ূন আহমেদ অথবা তাঁর মতো কেউ ছাড়া আমার মতো গৃহবাসীর দুয়ারে আর কেইবা করাঘাত করবে! আমি তখন থাকি ইস্কাটন গার্ডেনের নিউ সার্কিট হাউসে। পাঁচতলায় ৭৬ নং স্যুটে আমার বসবাস। অস্থির কড়া নাড়ার শব্দে সচকিত হয়ে দরজা খুলেই দেখি- যা ভেবেছি তা-ই। মোটা ফ্রেমের চশমার আড়ালে চোখের কোণে কৌতুক মেশানো হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি-হুমায়ূন আহমেদ। কী আশ্চর্য! আমার স্ত্রী শাহীন তাড়াতাড়ি এসেই শুকনো তোয়ালে নিয়ে এসে আপনার হাতে তুলে দিল- গা মাথা মুছে নেওয়ার জন্য। আপনি হাত বাড়িয়ে তোয়ালেটা নিলেন। কিন্তু নিজের ভেজা মাথা কিংবা চোখ মুখের দিকে তা এগিয়ে না নিয়ে বাঁ হাতে আগলে রাখা একটা বই তুলে করে মোছার জন্য উদ্যোগী হলেন। মুখে বললেন, ‘আমি ভিজলে কোনো ক্ষতি হই। বরং আরেকটু তাজা হব। কিন্তু বইটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই এর পরিচর্যা এই আগে দরকার।’

‘আপনারা বসুন। আমি একটু আদা-চা করে নিয়ে আসি’- বলে শাহীন দ্রুত পায়ে রান্নাঘরের দিকে যায়।

তোয়ালেটা আমার হাতে দিয়ে আপনি বসলেন। ডান চোখের চশমার কাছে তখনো বৃষ্টির দাগ। আমার নিজের চশমাও অনেক পুরু লেন্সের। আপনার চেয়েও। সামান্য বৃষ্টির ফোঁটাও সেখানে কী ধরনের সমস্যা জাগায় আমি তো তা ভালো করেই জানি। তাই তোয়ালেটা আবার আপনার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলি, “চশমাটা ভালো করে মুছে নিন। নইলে আপনার সেই ‘সাদা গাড়ি’ গল্পের সাক্ষিরের মতো অবস্থা আপনার নিজেরই হবে।”

সাক্ষিরের নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিষাদছোঁয়া হাসি ফুটে উঠল আপনার মুখে। বললেন, ‘সাক্ষিরের কথা আপনার মনে আছে দেখছি!’

‘শুধু আমি কেন, আমার মতো যারা হাই-মায়োপিয়ার ভুগছেন অন্তত তাদের কেউই সাক্ষিরকে কখনো ভুলবে না।’

শাহীন চা নিয়ে এল। সেই সঙ্গে একটা 'অ্যাশট্রে'। আমি সিগারেট খাই না। কিন্তু আমার চার প্রিয়বন্ধু আহমদ ছফা, জামাল ভাই, সবুজ ভাই এবং আপনার কাছে সিগারেটই প্রধান খাদ্য। ছাইদানি না থাকার কারণে চায়ের খালি কাপগুলোই হয়ে উঠত অস্থায়ী ছাইদানি। সমস্যাটি সমাধান করার জন্য শাহীন সপ্তাহখানেক আগে কয়েকটা বাজার ঘুরে একটা বেশ সুন্দর ছাইদানি কিনে এনেছে। যে-কোনো সুন্দর জিনিসই তো আপনার চোখ ছুঁয়ে যায়। সেই বাদল সন্ধ্যাতেও তার কোনো ভিন্নতা দেখি নি। তাই মুহূর্তেই সেটা আপনার হাতে উঠে গিয়েছিল। বেশ কয়েকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার পর নিজের মুগ্ধতা প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'বাঃ বেশ তো দেখতে! কিন্তু একজন অধূমপায়ীর ঘরে এটা এল কী করে?'

আমি কিছু বলার আগেই সারামুখে একরাশ হাসি ছড়িয়ে শাহীন বলে, 'হুমায়ূন ভাই, এটা আমি আপনার জন্য কিনে এনেছি।'

'তাই! তাহলে তো বেশি করে সিগারেট খেতে হবে।'

'এবং বেশি বেশি করে আমাদের বাসায় আসতেও হবে।' শাহীন বলে। আমরা তিনজনেই হেসে উঠি একসঙ্গে।

চা খেতে খেতে এবং গল্প করতে করতে আপনি একটু আগে তোয়ালে দিয়ে যত্ন করে মুছে হাতের যে বইটি টেবিলের ওপর রেখেছিলেন, তা আবার হাতে তুলে নিলেন। প্রিয় সন্তানের দিকে যেভাবে স্নেহে তাকায় একজন পিতা, ঠিক সেইভাবে কয়েকটি মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বইটি আমার হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন, 'এটা আপনার জন্য।'

আমি বইটির দিকে তাকলাম। ঝকঝকে সুন্দর প্রচ্ছদ। কালো রঙের পটভূমির ওপর চারটি সুন্দর রঙের বিন্যাস— দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়, মন খুশি হয়। তার ওপর মানানসই গোল গোল অক্ষরে লেখা 'অন্ধকারের গান।'

এর আগেও এমনটি ঘটেছে একাধিকবার। সদ্যপ্রকাশিত নতুন বইয়ের একটি কপি হাতে নিয়ে আপনি চলে এসেছেন আমাদের বাসায়। তাই আঘাটের সেই বৃষ্টিমাতাল সন্ধ্যায় সদ্য প্রকাশিত 'অন্ধকারের গান'-এর কপি হাতে পেয়ে খুব বেশি বিস্মিত হই নি। আর আমার তখনকার আনন্দ কিংবা বিস্ময়ের মাত্রা পরিমাপ করতে মোটেই দেরি হয় না আপনার। গল্প-উপন্যাস-নাটকে আপনি চমকের পর চমক সৃষ্টি করেন। ব্যক্তিগতভাবেও আপনি আপনার প্রিয় কিংবা পরিচিতজনদের চমকের দিতে পছন্দ করেন। ভালোবাসেন বিস্ময়ের আনন্দে তাদের সারাক্ষণ আপ্ত করে তুলতে। এবং এত নিপুণভাবে সেই কাজটি সম্পন্ন করেন যে তা নিজেই হয়ে ওঠে একটা শিল্প। কিন্তু সেই বিস্ময়বোধ প্রবলভাবে আমার মধ্যে কাজ করছে না দেখে আপনি বোধহয়

মনে মনে একাই হাসলেন। কেননা আমার জন্য কখন একটা বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে, তখন পর্যন্ত তা শুধু আপনারই জানা। ব্যাপারটিকে তার নির্দিষ্ট পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একইসঙ্গে আহ্নি ও উদাসীনতার এক অসাধারণ যুগলবন্দি কণ্ঠে ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'এই বইয়ের প্রথম কপিটি সকলের আগে আপনার হাতে তুলে দেব বলেই বৃষ্টি উপেক্ষা করে চলে এলাম।'

'এটা আপনার বাড়াবাড়ি হুমায়ূন ভাই।' মৃদু অনুযোগের সুরে শাহীন বলল, 'বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বই হাতে নিয়ে চলে আসা। বৃষ্টি ছাড়লে কিংবা কাল দিলেও একই ধরনের আনন্দ হতো।'

'তা হয়তো হতো। সেটা সাধারণ উপহার দেওয়ার এবং পাওয়ার আনন্দ। কিন্তু উৎসর্গের আনন্দকে কিছুতেই বাসি করা যায় না। তাকে পেতে হয় হাতে হাতে, ভাগ করে নিতে হয় তখন তখনই।'

মানে? প্রায় একই সঙ্গে শাহীন এবং আমি উচ্চারণ করি। আপনার চোখ দুটো তখন রহস্যময় হাসিতে ভরা। কণ্ঠে নির্লিপ্ততা। বললেন, 'বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠাটি ওলটান। তাহলেই বুঝতে পারবেন।'

পাতা উল্টালাম। বেরিয়ে এল উৎসর্গের পাতা। মাত্র দুটি লাইন সেখানে। কিন্তু আমার দৃষ্টি যেন একেবারে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। আসন পেতে বসে পড়ল। ওই জায়গাটুকু ছেড়ে যেন তা আর অন্যত্র দৃষ্টিই চায় না। পাঁচটি শব্দের মাত্র দুটি লাইনে যে বিপুল বিস্ময়ভরা মায়ালোক সেখানে আপনি সৃষ্টি করে রেখেছেন তা ছেড়ে আমার সমগ্র দৃষ্টি, সস্তা, মন ও মনোযোগের অন্য কোথাও যাওয়ার তো সামান্যতম শক্তিও ছিল না। আমি তাই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। দাঁড়িয়ে থাকলাম বইয়ের ওই পৃষ্ঠাটির দিকে পলকহীন দৃষ্টিতে। কৌতূহল দমন করতে না পেরে শাহীন উঁকি দিল সেখানে। এবং তারপরই ওর উচ্ছ্বাসভরা উচ্চারণ-দারুণ ব্যাপার তো সরদার আবদুল সান্তার এবার তাহলে সেই ভাগ্যবান মানুষদের তালিকাভুক্ত হলো— যাদের নামে হুমায়ূন আহমেদের বই উৎসর্গীত হয়েছে।'

কিন্তু কোনো কথা ফুটেছে না আমার মুখে। চোখও তুলতে পারছি না। সেখানে অশ্রুর ঝিকিমিকি। নোনা জলের জোয়ার।

আপনার সৃষ্ট অনেক চরিত্রকেই আনন্দে কাঁদতে দেখেছি। এবার আমি নিজেও তাদের দলভুক্ত হলাম। নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে তাকালাম আপনার দিকে। এক অপূর্ব স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আপনি তখন আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন। এবং কী আশ্চর্য! সেখানেও অশ্রুর মুক্তাবিন্দু। চোখের জলে তাকিয়ে আছেন। চোখের জলে রূপালি উপহার। আমাদের দুটি হাত পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হলো— উষ্ণ আন্তরিকতায়। আমি

নতুন করে আপনার দানের মহিমায় অভিভূত হলাম। কৃতজ্ঞ হলাম। সমৃদ্ধ হলাম। এবং জীবনের চারপাশের সবুজ বেষ্টনীকে আরও প্রগাঢ়, আরও অপরূপ হয়ে উঠতে দেখলাম।

শৈশবে আমার একটা ভারি অভ্যাস ছিল। আর পাঁচটা বাচ্চার মতো আমিও বড়দের কাছ থেকে চকলেট পেতে এবং খেতে পছন্দ করতাম। বলা যায় পাওয়া মাত্রই সেগুলো খেয়ে আমি সাবাড় করে দিতাম। কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটত রহমান ভাইয়ের দেওয়া উপহারের বেলায়। আমার ছোটবেলায় তিনি ছিলেন আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। তাঁর কাছ থেকেও আমি চকলেট উপহার পেতাম। কিন্তু সেই চকলেট আমি কিছুতেই তাৎক্ষণিক ভাবে খেতে পারতাম না। সেগুলো দীর্ঘসময় হাতে এবং পকেটে নিয়ে ঘুরতাম। মাঝেমধ্যে চোখের সামনে ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতাম। তারপর আবার রেখে দিতাম। মুখে পুরতে গেলেই মনে হতো—আহা চকলেটটা তো তাহলে এখনই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু রহমান ভাইয়ের দেওয়া কোনো উপহার ব্যবহারের মাধ্যমে মলিন কিংবা নিঃশেষ হয়ে যাক মন তাতে মোটেও সায় দিত না। আমি তাকে অক্ষত এবং আনকোরা রাখতে চাইতাম। তাই মাঝে মাঝে একটা তালা খোলা ট্রাংকের মধ্যে সেগুলো লুকিয়ে রাখতাম। সেই ছোটবেলায়ই পিছে ফেলে এসেছি অনেক আগে। কিন্তু শৈশবের কিছু অভ্যাস আজও সঙ্গী আছে। তাই আমাকে উৎসর্গ করা আপনার ‘অন্ধকারের গান’ উপন্যাসটি বইবার ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখেছি। যত্ন করে আলমারিতে তুলে রেখেছি। আবার সেখান থেকে বের করে এনে তার সমগ্র অবয়বে আদরের স্পর্শ বিলিয়েছি। পৃষ্ঠাগুলোতে আঙুল বুলিয়েছি। কিন্তু প্রচণ্ড আগ্রহ জন্মানো সত্ত্বেও উপন্যাসটির প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম ২০১২-এর আঘাট, এই তেইশটি বছর নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছি এক নিঃশ্বাসে উপন্যাসটি পড়ে ফেলার স্বপ্নিল আকাঙ্ক্ষা থেকে। কেননা সব পাতা পড়ে ফেলা উপন্যাসের মধ্যে আর কোনো রহস্য থাকে না। কৌতূহল থাকে না। এবং একই সঙ্গে থাকে না নতুন করে তার অন্দরমহলে প্রবেশের অনিবার আগ্রহ। মুখে পুরে ফেলা চকলেটের মতোই তা যেন গলে গলে নিঃশেষ হয়ে যায়। অথবা অস্তি ত্বহীন না হলেও তা হয়ে পড়ে আকর্ষণহীন। কিন্তু আপনার এই অমূল্য উপহারের ক্ষেত্রে তা হোক—সেটা তো আমি কিছুতেই চাই না। তাই ছোটবেলায় অতিপ্রিয় রহমান ভাইয়ের কাছ থেকে পাওয়া চকলেটগুলোকে যেমন আমি মুখে না পুরে অক্ষত অবস্থায় তা সংরক্ষণের চেষ্টা করতাম, চেষ্টা করতাম তার রঙ-রূপ-রস-গন্ধ ও সৌন্দর্যের সামান্যতম অংশকেও না হারাতে—‘অন্ধকারে গান’-এর ক্ষেত্রে আবার সেই ইচ্ছেটা ফিরে এল। তাই ‘সব পাতা পড়ে ফেলা উপন্যাস’-এর সারিতে তাকে সাজিয়ে রাখতে পারি নি। বরং গত ২৩ বছর ধরে অনস্রোতা ফুলের মতোই তা তার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য, রহস্য এবং আনন্দময়তা নিয়ে কখনো আমার পড়ার টেবিলে, আবার কখনো বইয়ের

আলমারিতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে আসছে। কিন্তু ২০১২-র এই মৃত শ্রাবণে এসে কত কী-ই না ঘটে গেল। কোটি মানুষ আপনার রোগমুক্তির প্রার্থনা জানাল। অগণিত মানুষ তাদের বেদনাহত হৃদয় নিয়ে শহীদ মিনার চত্বরে ভিড় জমালো। কিন্তু আমরা কেউই আপনাকে ধরে রাখতে পারলাম না। সেই মহাকালের সোনার তরী এসে কুলে দাঁড়াল। আপনার বিস্ময়কর বিপুল সৃষ্টিসম্ভারের কোনোকিছুই সে গ্রহণ করল না। শুধু একা আপনাকে নিয়ে সে চলে গেল কালান্তরের উদ্দেশ্যে। আর আপনার সারা জীবনের সাধনার ফসল 'রাশি রাশি ভারি ভারি' সোনার ধান পড়ে রইল 'শূন্য নদীকূলে। মত্যাভূমে। আর এখনো এখানে আমরা যারা বসবাস করছি— তাদের ওপরই রয়ে গেল তা ঘরে তোলার কাজ। তাই আপনার বিদায়ের এই শ্রাবণে কান পেতে শুনতেই হচ্ছে 'অন্ধকারের গান'-এর বিষণ্ণ সুর। দৃষ্টিনিবদ্ধ করতে হলো ২৩ বছর আগে দেওয়া আপনার সেই অমৃত-উপহারের অন্দরমহলে—যেখানে ভীষণভাবে একা হয়ে যাওয়া তরুণী বীণার হাতে লাগানো চাঁপাগাছটি শ্রাবণধারার মতোই অকাতরে বিলিয়ে যাচ্ছে গন্ধধারা। বীণার উচ্চারিত 'লুবু' হারিয়ে গেছে অনন্ত অন্ধকারে।

পড়তে বসে উপন্যাসটির তৃতীয় পৃষ্ঠাতেই একটা অবাধ করা বিষয়ের ওপর আমার দৃষ্টি আটকে গেল। মিজান সাহেবের পরিবার ও একটি কেনা বাড়িকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'অন্ধকারের গান'-এর কাহিনীপট। আর এই কাহিনীবৃত্তের সময়কাল সম্পর্কে আপনি লিখেছেন, 'এক শ্রাবণ মাসের মেঘলা দুপুরে তিনি এই বাড়িতে ঢুকেছিলেন। আজ আরেক শ্রাবণ মাস। মাঝখানে চব্বিশ বছর পার হয়েছে। আপনার হাত থেকে 'অন্ধকারের গান' পাঠ্য পূর্ব আমার জীবন থেকে পার হয়ে গেছে তেইশ বছর। আর এই উপন্যাসের প্রথম চরিত্রের জীবন থেকে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে চব্বিশ বছর। বর্ণিত কাল-পরিধিতে মিজান সাহেবের জীবন একটি পর্যায় থেকে পৌঁছে গেছে আরেকটি পর্যায়। উপমহাদেশের রাজনীতি এবং জনজীবনে ১৯৪৭ সাল একটি বহুমুখী প্রভাবসঞ্চারী বছর। বহুমুখী পাওয়া না-পাওয়ার বিচিত্র দোলায় এই সালটি আমাদের ইতিহাসকে আন্দোলিত করেছে। নতুন স্বপ্ন কল্পনায় উদ্দীপ্ত করেছে। রক্তে ভাসিয়েছে। অশ্রুতে ডুবিয়েছে। দ্বিখণ্ডিত করেছে অখণ্ড বাংলাকে। ফলে পশ্চিমবঙ্গ বিহার-পাঞ্জাব এবং পূর্ববঙ্গ থেকে আকস্মিকভাবে সংখ্যালঘু হয়ে পড়া বিপুলসংখ্যক মানুষ দেশান্তরিত হতে বাধ্য হয়। এসব বাস্তবত্যাগী মানুষের ছেড়ে যাওয়া বিষয়-আশয় কিংবা ঘরবাড়ি ও তাদের দখলদারিত্ব নিয়ে শুরু হয় এক নতুন ধরনের খেলা। শুধু আমাদের সামাজিক ইতিহাসে নয়, সাহিত্যেও তার নানামাত্রিক পরিচয় ধরা আছে, এবং হুমায়ূন— আপনার 'অন্ধকারের গান'-এর কাহিনী যাত্রাও শুরু হয়েছে এই তরঙ্গশুক্ল কালসীমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে। মিজান সাহেবের পুরনো আমলের যে বাড়িটি এই উপন্যাসের মূল কেন্দ্রভূমি, সেটিও ওই সময়ে সংখ্যালঘু হয়ে পড়া এক স্বচ্ছল হিন্দু

পরিবারের পরিবারকর্তা ঢাকা ছেড়ে কলকাতা চলে যাওয়ার প্রাক্কালে একেবারে 'জলের দরে' বাড়িটি বিক্রি করে দেন বলেই মিজান সাহেবের মতো এক নিম্নবিত্ত মানুষের পক্ষে তা কেনা সম্ভব হয়েছিল। তবে অতি সস্তায় বাড়িটি কিনতে পারলেও দখল নেওয়ার সময় নানান অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা ও অভিজ্ঞতার মুখোমুখি তাকে দাঁড়াতে হয়। সবকিছু জয় করতে পেরেছিলেন বলেই ওই বাড়িতে তার গৃহপ্রবেশ ঘটেছিল ২৪ বছর আগে প্রথম সন্তান বুলুর বয়স যখন দুই বছর। এখন সে ২৬ বছরের যুবক এবং ব্যর্থ জীবনের গ্লানিভারে মৃত্যুপথযাত্রী।

মিজান সাহেবের গৃহপ্রবেশকালে পাকিস্তান আমলের প্রথমদিকে মিরপুর ছিল ঢাকা শহরের প্রান্তবর্তী জনপদ। দ্রুত বর্ধনশীল ঢাকা শহর ও শহরবাসীর আবাসিক চাহিদা মেটাবার জন্য তখন শহর-সন্নিহিত যেসব এলাকায় নিত্য নতুন ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট গড়ে উঠছে, মিরপুর ছিল তাদেরই অন্যতম। কিন্তু শহরতলীর মর্যাদা পেলেও তার সারা শরীরে তখন গ্রামের এঁদো ডোবা ও কাদামাটির ছড়াছড়ি। আবার গ্রামের শিথিল মমত্ব এবং প্রশান্তিটুকু থেকেও তা বঞ্চিত। তাই সপরিবারে গৃহপ্রবেশের সময় মিজান সাহেবের স্ত্রী ফাতেমা হতাশ এবং চিন্তামগ্ন হয়ে তার স্বামীকে বলেছিলেন, 'কোথায় নিয়ে এলে? এ যে সাপ-খোপের আড্ডা। চারদিকে একটা বাড়িঘর নেই। ডাকাত মেরে রেখে গেলেও কেউ জানবে না।'

সে মিরপুর এখন জনারণ্য, আলোহুস্তালোয় শোভাময়। সে মিরপুর এলাকা-গত শতকের ষাটের দশকেই ছিল অনেকটাই জনহীন প্রান্তর-বিষয়টা ভাবতেই এখন আমাদের বেশ মজা লাগে। কৌতুক লাগে আজ থেকে ৫০/৬০ বছর আগে মিরপুর অঞ্চলের চালচিহ্নটি চোখের সামনে মেলে ধরতে। সামান্য কিছু তথ্য বা ইঙ্গিত পেলেও আমরা মনের মধ্যে তার একটি নিখুঁত দৃশ্যকলা তৈরি করে ফেলতে পারি। আমাদের সেই প্রত্যাশা অপূর্ণ রাখেন নি আপনি। ছবির মতো সাজিয়ে রেখে গেছেন সেই সময়ের বর্ণনা। লিখেছেন, 'শ্রাবণ মাসের এক মেঘলা দুপুরে মিজান সাহেব, তার স্ত্রী এবং দু'বছর বয়সী বুলুকে নিয়ে কল্যাণপুরের এই বাড়িতে এসে উঠেছিলেন। শ্যাওলা ধরা প্রাচীরের নোনা লাগা বাড়ি, চারদিকে ঝোপঝাড়। বাড়ির বাঁ দিকে ডোবার মতো আছে। ডোবার চারপাশে ঘন কচুবন। তাদের চোখের সামনেই ডোবার পানি কেটে একটা খয়েরি রঙের সাপ চলে গেল।'

এখনো শহর হয়নি কিন্তু গ্রামের আদল ভেঙেছে। এমন এক রঙছট পরিবেশে বুলুদের সেই ক্রয়কৃত বাড়িটি কিন্তু বেশ খানিকটা গাষ্টীর্থ এবং প্রাচীনকালের গৌরব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই বর্ণনাটাও একটা ছবি। অতীতের গন্ধমাখা বিকেলের ধূসর আলোয় আঁকা এক মন কেমন করা ছবি। যে মানুষগুলো একদিন ছিল, কিন্তু এখন নেই

ছবিটিতে তাদের সেই সময়ের ক্রিয়াকর্ম এবং সরব উপস্থিতি অতি অল্প আয়োজনেই চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। পুরনো আমাদের হিন্দু বাড়ি। তুলসি মঞ্চ আছে। ছোট একটা ঠাকুরঘর আছে। ঠাকুরঘরের দক্ষিণে গহীন একটা কুয়ো। বাড়ির গেটে সিংহের দুটি মূর্তি।

'৪৭ পরবর্তী সময়ে 'নিজ বাসভূমে' পরবাসী হয়ে পড়া যে বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তু মানুষের দীর্ঘ পদযাত্রা চলেছিল দুই বাংলা জুড়ে তাদের কোথাও পরিত্যক্ত আবার কোথাও বা দু'হাতে প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরা বাড়িঘরের কথা বাংলা সাহিত্যে অদৃষ্টপূর্ব নয়। বিশেষ করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'একটি তুলসী গাছের কাহিনী' এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোঁয়ারি' গল্প দুটির তো কোনো তুলনাই চলে না। দেশবিভাগের ক্ষতচিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তেমনই একটি পুরাতন হিন্দু-বাড়ি আপনার এই উপন্যাসেও একটা নিজস্ব অবস্থান গড়ে নিয়েছে। একটা হিন্দু-বাড়ি যখন মুসলমান-বাড়ি, অথবা একটা মুসলমান-বাড়ি যখন হিন্দু-বাড়িতে পরিণত হয়— তখন তো তার কিছু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এখানেও হয়েছে। ফলে প্রবেশ দুয়ার থেকে তুলসি মঞ্চ কিংবা ঠাকুরঘরের কিছু রদবদল হয়েছে। কিন্তু অপরিবর্তিত ও অক্ষত রয়েছে। আগের বাড়ির গহীন কুয়োটি। এবং আগের দরদি দৃষ্টির ছোঁয়ায় একটু একটু করে তা হয়ে উঠল এই উপন্যাসের একটি অপরিহার্য চরিত্র। সহমর্মিতায় ভরা সজীব আত্মার প্রতিনিধি।

তবে মিজান সাহেবের কাছে এই পুরাতন এবং বিশাল কুয়ো কোনো অপরিহার্য গৃহসামগ্রীর মর্যাদা পায়নি। বরং সেটি তার কাছে আনন্দের পরিবর্তে ভীতির উৎস হিসেবেই গণ্য হয়েছে। তাই একসময় তিনি এটির মুখ বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে শেষাবধি সেটি কার্যকর থাকেনি। বরাবরই তিনি নিরাবেগ ধরনের মাথা গরম মানুষ। এই কুয়াকে ঘিরেও তার কোনো আবেগ নেই। কিন্তু পরিবারের অন্য সদস্যদের অবস্থান এর সম্পূর্ণ বিপরীতে। গৃহপ্রবেশের প্রথম দিনেই দুই বছরের শিশুপুত্র বুলু বাড়ির মধ্যে এতবড় একটা কুয়ো দেখে খুশি হয়ে উঠেছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই সে কুয়োটিকে তার খেলার সঙ্গী করে তুলেছিল। তার পরবর্তী ভাইবোনেরাও ছিল তারই অনুসারী। ছোট বোন বীণা এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে কুয়ের পাশে একটা চাঁপা গাছ লাগিয়ে কুয়োটলাটাকে একই সঙ্গে চাঁপাতলাও করে তুলেছিল। মিজান সাহেবের বৃদ্ধ এবং অসহায় পিতা শহরের ঘেরাটোপে বন্দি তার শেষ দিনগুলোতে এই কুয়োটলাতে বসেই মুক্ত বাতাসের সঙ্গে একটু কোলাকুলি করতে পেরেছিলেন। বীণার একমাত্র বান্ধবী অলিক সারারাত ধরে কুয়োটলায় বসে বীণার সঙ্গে গল্প করার লোভে তাদের বাড়িতে রাত কাটিয়েছে। উপন্যাসে বর্ণিত দিনরাতগুলোর মধ্যে এই রাতটিই বিশেষভাবে ছায়া ফেলে যায় আমাদের মনে। সঙ্গী হয়ে থেকে যায়। কিন্তু থাকে না

বলু। থাকে না অলিক। দূর পৃথিবীর গন্ধভরা বাতাস বুকে নিয়ে তারা চলে যায় দৃষ্টির বাইরে। আকাশ তার হাত বাড়িয়ে ডেকে নেয় কাউকে। আবার কাউকে ডাক পাঠায় পাশ্চাত্যের কোনো আলোকবরণী শহর। নিস্তন্ধ দুপুরের উদাসী বাতাস আপন মনে ঢেউ খেলে যায় কল্যাণপুরের এই পুরনো বাড়িটার আঙিনায়। স্নিগ্ধতার স্পর্শ ছড়ায় কুয়োতলায়, চাঁপা গাছটির পাতায় পাতায়। শ্রাবণের কালো মেঘ বৃষ্টি ঝরিয়ে যায়। আলো ছড়ায় মধ্যাহ্ন আকাশ। বীণা চুপচাপ বসে থাকে কুয়োতলায়। একা একা।

না, কুয়োতলায় বীণা এখন আর একা বসে তার সঙ্গে আছি আমি। এবং আমরা—আপনার অগণিত পাঠক, দর্শকশ্রোতা ও ভক্তমণ্ডলী। আপনার সৃজনশীল চিন্তা, উচ্চ হৃদয় এবং জাদুকরী কলম থেকে সৃষ্ট আপনার প্রতিটি চরিত্রের জন্য আপনার মমত্ব যেমন অনিশেষ, আমাদের ভালোবাসাও তেমনি অপরিমেয়। এক অপূর্ব স্বপ্ন কল্পনা ও মায়া বাস্তবতার জগৎ থেকে বের করে এনে আপনি যখন আপনার চরিত্রদের সত্তা এবং স্বাভাবিক দান করেন, সেই স্বাভাবিক চিহ্নিত সত্তার সপ্তপ্রদীপ জ্বালিয়েই তারা হয়ে ওঠে আমাদের আত্মার আত্মীয়, স্বপ্ন-সহচর। চারপাশের নিরেট বাস্তবতায় বিরাজমান মানুষগুলোর চেয়েও তারা হয়ে ওঠে অধিকতর বাস্তব, অধিকতর কাছের মানুষ। আর সে কারণেই ‘এইসব দিনরাত্রি’তে কিশোরী টুঙ্গীর মৃত্যু যখন ঘনি়ে আসে, এক অকথিত বেদনার ভারে আমরা তখন ন্যূজ হয়ে পড়ি। ‘কোথায় কেউ নেই’-তে বাকের ভাইয়ের ফাঁসি যখন অবধারিত হয়ে আসে, সত্য মিথ্যা কিংবা মায়া-বাস্তবতার মধ্যে বিরাজমান দূরত্বের কথা ভুলে গিয়ে আমরা বাকের ভাইয়ের জন্য রাস্তায় মিছিল নামাই। স্লেগানে স্লেগানে উচ্চৈঃস্বরে তুলি দশদিক ‘শ্যামল ছায়া’র সেই ছোট্ট গেরিলা দলটি যখন ‘৭১-এর অন্ধকার রাতে কখনো নৌকা আবার কখনো হাঁটা পথে এগিয়ে চলে মেথিকান্দা থানার উদ্দেশ্যে। আমাদের ভালোবাসা আর শুভকামনার সবটুকুই তখন ফুল হয়ে ঝরে পড়তে থাকে তাদের পথের ওপর। ‘অন্ধকারের গান’-এর বীণাও তেমনি আমাদের ভালোবাসার কেন্দ্রস্থলে নিজেকে অস্তিত্বময় করে রেখেছে। তাই এখন আর তার একা থাকার কোনো উপায়ই নেই। আমরা বসে আছি তাকে ঘিরে—চাঁপা ফুলের গন্ধে ভরা কুয়োতলার চারপাশে। কিন্তু হুমায়ূন, চোখ তুললেই আমরা দেখতে পাচ্ছি—একটি মখমল-মোড়া উঁচু আসন সেখানে খালি পড়ে আছে। তাই বীণা, বলু কিংবা অলিকের জন্য এখন আর আমাদের চোখ ছলছল করে না। প্রিয় ঔপন্যাসিক—এখন তা করে শুধু আপনার জন্য—যে আপনি অন্ধকারে গেয়েছেন আলোর গান, মুখর করে তুলেছেন অগণিত মূক হৃদয়ের সংগীত এবং শব্দের শ্বেত-মর্মরে বাজিয়েছেন শ্রাবণধারার সিম্ফনি—Rainbowed Sonata.

—সরদার আবদুস সাত্তার

হুমায়ূনের টেপরেকর্ডার

আমার একটি খুব প্রিয় গান আছে, গিয়াসউদ্দিন সাহেবের লেখা 'মরণসঙ্গীত'—
'মরিলে কান্দিস না আমার দায়।'

প্রায়ই ভাবি আমি মারা গেছি। শবদেহ বিছানায় পড়ে আছে, একজন কেউ গভীর
আবেগে গাইছে— 'মরিলে কান্দিস না আমার দায়।'

'নক্ষত্রের রাত' নামের ধারাবাহিক নাটকের গুটিং ফ্লোরে আমি আমার ইচ্ছা প্রকাশ
করলাম। এবং একজনকে দায়িত্ব দিলাম গানটি বিশেষ সময়ে গাইতে। সে রাজি
হলো। উৎসর্গপত্রের মাধ্যমে তাকে ঘটনাটি মনে করিয়ে দিচ্ছি। আমার ধারণা এসে
গেছে।

মেহের আফরোজ শাওন

চলে যায় বসন্তের দিন, হুমায়ূন আহমেদ, ২০১২ উৎসর্গপত্র

উল্লেখিত গানটি আমি প্রথম গুনি গায়ক সেলিম চৌধুরীর কণ্ঠে। ১৯৯৫ সালের
কথা। তখন ডিএফপি-তে বিশাল সেট ফেলে 'নক্ষত্রের রাত' ধারাবাহিকের গুটিং
করছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। গুটিংয়ের অবসরে প্রায়ই গল্পের আসর বসত, সঙ্গে থাকত
সেলিম চৌধুরীর গান। 'আইজ পাশা খেলবরে শ্যাম' গানটি গেয়ে সেলিম চৌধুরী তখন
জনপ্রিয়তার শীর্ষে। তাঁর গাওয়া এই গানটি ছিল হুমায়ূন আহমেদের অত্যন্ত পছন্দের।
ডিএফপি-র এক সন্ধ্যায় হুমায়ূন আহমেদ আমাকে বললেন, শুনেছি তুমি নতুন কুঁড়িতে
গানে প্রথম পুরস্কার পেয়েছ। দেখি শোনাও তো কেমন গাও।

আমি রাগভিত্তিক একটি নজরুল সঙ্গীত গাইলাম। তিনি বললেন, 'আইজ পাশা
খেলবরে শ্যাম' গানটা জানো?

না।

সেলিম, গানটা গাও তো।

সেলিম ভাই শোনালেন তাঁর সেই বিখ্যাত গান। হুমায়ূন আহমেদ মাথা নাড়িয়ে
ঝাঁকিয়ে গানের সঙ্গে তাল দিলেন।

গান শেষে আমাকে বললেন, এই গানটা গলায় তুলে আমাকে শুনিয়ে তো।

এখন শোনাব?

এখনই শোনাতে পারবে?

অবাক হলেও আমি গান গেয়ে শোনালাম। মাত্র একবার শুনেই কোনো গান যে গলায় তোলা যায় এই বিষয়টা হুমায়ূন আহমেদকে খুবই অবাক করল। সেদিন তিনি আমার নাম দিয়েছিলেন ‘টেপেরেকর্ডার’। এরপর প্রায়ই গানের আসরে তিনি আমার পরীক্ষা নিতেন। নতুন কোনো গান শুনে আমার দিকে তাকিয়ে বলতেন, ‘টেপ’। আমি গানটি কিছুদূর গাওয়ার পর বলতেন, ‘স্টপ’। তারপর তাঁর নতুন ‘টেপেরেকর্ডার’ আবিষ্কারের গল্প অন্যদের শোনাতে। আমার গান শুনে কেউ প্রশংসা করলে তার গর্বিত মুখ দেখে মনে হতো যেন তিনিই আমাকে গান শিখিয়েছেন। একবার শুনেই কোনো গান হুবহু গাইতে পারার সামান্য গুণটি কেন জানি হুমায়ূন আহমেদকে খুব মুগ্ধ করেছিল। একে একে রবীন্দ্রনাথের ‘চরণ ধরিতে দিয়োগো আমারে’, ‘মাঝে মাঝে তব দেখা পাই’, ‘তোমাকেই করিয়াছি জীবনের ধুবতারা’, নজরুলের ‘পথহারা পাখি’, ‘জনম জনম তব তরে কাঁদিব’সহ হুমায়ূন আহমেদের প্রিয় চমৎকার সব গানে সমৃদ্ধ হতে থাকল আমার গানের ঝুড়ি।

হঠাৎ করেই হুমায়ূন আহমেদ আমার গান শোনা বন্ধ করে দিলেন। এল একটি চিরকুট—

তোমার গান কতদিন শুনছি না।

গান শুনলেই বিষাদে আক্রান্ত হই। আমি এমনভাবে গান শুনতে চাই, যেন সেই সময় আশপাশে কেউ থাকবে না। শুধু আমি দুজন। কোনো ভান না, কোন ভনিতা না—

দেখব শুধু মুখখানি

শুনব যদি শোনাও বাণী

‘নক্ষত্রের রাত’ নাটকের সেটে একদিন সেলিম চৌধুরী গিয়াসউদ্দীনের সেই বিখ্যাত গানটি গেয়ে শোনালেন— ‘মরিলে কান্দিস না আমার দায় রে জাদুধন।’ গান শেষে হুমায়ূন আহমেদ বললেন, এটা আমার মৃত্যুসংগীত। এই গানটা এখন শাওনের গলায় শুনব। তার গান শুনে যদি আমার চোখে পানি আসে, তাহলে তার জন্যে পুরস্কার আছে।

পুরস্কার হিসাবে তাঁর মৃতদেহের পাশে বসে উল্লেখিত গান শোনানোর গুরুদায়িত্ব পেলাম।

শাওন,

তুমি কি জানো তোমার গান

আমার কত পছন্দ?

এবং তোমাকে আমার কত পছন্দ?

আমার গান হুমায়ূন আহমেদের কেন যে এত পছন্দ ছিল তা আমি কখনোই পুরোপুরি বুঝে উঠিনি। আমার এই প্রশ্নে তিনি একেক সময় একেক উত্তর দিতেন। আমার মা সবসময়ই আমার গান পছন্দ করতেন। তাঁর আশ্বাসেই আমি গান শিখেছি। কিন্তু হুমায়ূন আহমেদের মতো একজন ভক্ত পেয়ে গানের প্রতি আমি আরও যত্নশীল হই। তাঁর মতো করে আমার গানকে ভালোবাসতে শিখি। তাঁর চলচ্চিত্র ও নাটকগুলোতে আমার গাওয়া গান স্থান পেতে থাকে।

‘শ্রাবণ মেঘের দিন’ চলচ্চিত্রের শুটিংয়ের আগে কুসুম চরিত্রটি নিজের মধ্যে ধারণ করার জন্য তিনি আমাকে উপন্যাসটি পড়তে বলেন। পড়তে গিয়ে উপন্যাসের নায়ক মতি মিয়া’র গানের একটি লাইন আমার মাথায় পোকায় মতো ঢুকে যায়— ‘কে পরাইল আমার চউক্ষে কলঙ্ক কাজল?’

মাথার পোকাটি বারবার আমাকে বলতে লাগল, ‘এখানে তো তোমার কথাই বলা হচ্ছে। গানের লাইনটা আসলে হবে— কে পরাইল শাওনের চউক্ষে কলঙ্ক কাজল?’ হুমায়ূন আহমেদকে অনুরোধ করতাম এই এক লাইনের গানটা সম্পূর্ণ করতে। তিনি শর্ত দিলেন, গানটা যদি আমি গাই তবেই গানের বাকি অংশ লিখবেন।

সম্পূর্ণ গানটি লেখা হলো, সুর দিলেন হুমায়ূন আহমেদের প্রিয় সুরকার মকসুদ জামিল মিন্টু, গাইলাম আমি। গান শুনে ‘কিন্নরকণ্ঠী’ বিশেষ আমাকে বিশেষায়িত করলেন তিনি।

কিন্নরকণ্ঠী,

মুগ্ধ হয়ে গান শুনলাম। পছন্দ করণাময় তোমাকে যে সুর দিয়েছেন (যে দয়া তোমাকে করেছেন), সবসময় সেই দয়ার কথা মনে রাখবে। তোমার অপূর্ব সুরের জন্যে আমি এই মুহূর্তে তোমার দশটা অপরাধ (ভবিষ্যতে যা করবে) ক্ষমা করলাম।

হুমায়ূন আহমেদ

১০-০৪-৯৯

বিয়ের পর হুমায়ূন আহমেদ আমাকে গায়িকা শাওন বলে পরিচয় করিয়ে দিতেই বেশি পছন্দ করতেন। অভিনেত্রী শাওন, পরিচালক শাওন কিংবা স্থপতি শাওন খুব কমই বলতে শুনেছি। খুব আয়োজন করে একদিন গান শিখতে বসলেন গায়িকা শাওনের কাছে।

‘সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে শোন শোন পিতা

কহো কানে কানে শোনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গল বারতা।’

আধ ঘণ্টায় এই দুই লাইন গাইলেন বেশ কয়েকবার। তারপর—ধুর! আমার গলায়
সুর নেই এই বলে রণে ভঙ্গ দিলেন।

নুহাশপল্লীর বেশির ভাগ জোছনারাতে দীঘি লীলাবতীর শ্বেতপাথরের ঘাট কিংবা
পানিবিহীন সুইমিংপুলের ভেতরে বসত গানের আসর। সম্মিলক হুমায়ূন আহমেদ,
শিল্পী শাওন, শ্রোতা হুমায়ূনের বন্ধুদল Old Fools Club-এর সদস্য এবং
তাদের স্ত্রীরা। চাঁদ ওঠার পর থেকে একের পর এক গান হতো চাঁদ ডুবে যাওয়া পর্যন্ত
। সেই সময় হুমায়ূনের প্রিয় কিছু গান ছিল, সেগুলোর সাথে তিনি গলা মেলাতেন।
যেমন—

‘আমরা পুতুলওয়ালা যাই বেচে যাই

কে নেবে এসো বলো কী রঙ চাই

নগর প্রান্তরে অজানা পথ ধরে

সকাল সাঁঝে পুতুল বেচে যাই।

মাটির মানুষ মাটিতে মিশে

যেতে হবে দিনের শেষে।’

অথবা

‘আগুন লাগাইয়া দিল কোনে

হাসন রাজার মনে

নিতে না দারুণ আগুন জ্বলে দিল ও জানে।’

কখনো কখনো অভিনেতা স্বাধীন খসরুর গান হতো। তার গানের মাঝে
হুমায়ূনসহ Old Fools Club-এর সবাই কোরাস ধরতেন।

স্বাধীন : পাহাড়ে পাহাড়ে নগরে বন্দরে

খুঁজিয়া তোমারে ধরা বহাব।

কোরাস : আছি তারই আশায় যদি তারে পাওয়া যায়

স্বাধীন : নইলে এই ভবে মরিয়ে যাব

বন্ধুরে।

আহা, কী সুন্দরই না ছিল সেইসব দিন।

Old Fools Club-এর বিদেশি সদস্য হুমায়ূন-বন্ধু ড. নাসির জমাদার
(জাপানের রিক্কিও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর) মাঝে মাঝে তাঁর জাপানি ছাত্রীদের নিয়ে
নুহাশপল্লীর গানের আসরে যোগ দিতেন। ছাত্রীদের পাওয়া একটি গান হুমায়ূন

আহমেদের এতই মনে ধরল যে তৎক্ষণাৎ তিনি তার টেপরেকর্ডারকে সেই গান শোনাতে বললেন। টেপরেকর্ডার কুসুম পড়ল মহাবিপদে। জাপানি গান। সুর তো ঠিক আছে, কিন্তু একবার শুনে কথা মনে রাখা তো সম্ভব না। জাপানি ছাত্রী 'আইহারা এরি'-র সাহায্যে গানের কথা লিখে নিয়ে কিছুক্ষণ পর গানটি শোনানো হলো। গানটিতে একটি মজার ব্যাপার ছিল। প্রত্যেক লাইনের পর হাতে তালি কিংবা মেঝেতে পা দিয়ে বাড়ি দিয়ে উপস্থিত সবাইকে গানে অংশ নিতে হতো। হুমায়ূনের নিয়মিত গানের আসরে যুক্ত হয়ে গেল জাপানি গানটি।

‘শিয়া ওয়াসনে নারা তেও তাতাকে

(দুইবার হাতে তালি)

শিয়া ওয়াসসে নারা আসি নারাসো

(পা দিয়ে দুইবার মেঝেতে বাড়ি)

শিয়া ওয়াসসে নারা তাই দোদে শি মেসোয়ো

হোরা মিন নাদে আসি নারসো

(পা দিয়ে দুইবার মেঝেতে বাড়ি)

বাংলা, ইংরেজি, জাপানি গান ছাড়াও পুরানো দিনের হিন্দি গানও খুব পছন্দ ছিল গানপাগল হুমায়ূনের। ‘দিদার’ ছবির ‘বাচপান কে দিন ভুলা না দেনা’, ‘চামানমে রেহকে ভিরানা’ ‘বৈজু বাওয়া’ ছবির ‘দূর কোয়ী মারে দুনিয়া শুনায়ে’ সহ আরো অনেক হিন্দি গানই মুখস্থ রাখতে হতো তাঁর ব্যক্তিগত চলমান টেপরেকর্ডারকে যে-কোনো সময় তাঁকে শোনানোর জন্য। ‘তেরে ঘরকে সামনে’ ছবির একটি গান একেক বৈঠকে প্রায় ১০-১২ বার শুনতেন। একদিন এসে গেলেন গানটির বাংলা করতে।

তেরে ঘরকে সামনে

এক ঘর বানাউঙ্গা

তেরে ঘরকে সামনে

দুনিয়া সাজাউল।

হুমায়ূন লিখলেন—

তোমার ঘরের সামনে

ছোট ঘর বানাবোগো

তোমার ঘরের সামনে

দুনিয়া সাজাবোগো।

(এই গানটি পরবর্তীতে ‘যে থাকে আঁখিপক্সবে’ নামক গানের অ্যালবামে এস আই টুটুল এবং আমার কর্ণে দৈতভাবে গীত হয়।)

কয়েক বছর আগে হঠাৎ হুমায়ূন আহমেদ আমাকে বলতে শুরু করলেন, তুমি আমার লেখা গানে সুর করছ না কেন? আমি বোঝাতে চাইলাম এই ভয়ংকর কঠিন কাজটি আমার দ্বারা সম্ভব না। কিন্তু তিনি জোর দিয়ে বললেন, আমি নিশ্চিত তুমি চমৎকার সুর করবে।

শাওন

তোমার সুর করার জন্যে

প্রথম গান

১৫-৫-২০০৮

(দখিন হাওয়া)

দীঘির জলে কার ছায়াগো?

তোমার নাকি আমার?

তোমার কি আর মন চায় না

এই কণ্ঠাটা জানার?

বন পারুলের ফুল ফুটেছে

সুবাস আসে ঘরে

সেই সুবাসে শরীর কাঁপে

মন যে কেমন করে।

সাঁঝের বেলায় নেমে আসে

মধ্যরাতের আঁধার

আমি চলে যাই নদীর কাছে

দাঁড়াই বসি

সময় হলো কাঁদার।

কেন কাঁদি যখন তখন

ইচ্ছে করে জানার?

নদীর জলে কার ছায়াগো

তোমার নাকি আমার?

হুমায়ূন আহমেদ

মূলভাব

[মেয়েটি তার আবেগের কথা জানাতে চাচ্ছে।]

হুমায়ূন আহমেদ সবাইকে চমকে দিতে পছন্দ করতেন। আমাকে চমকে দেওয়া তিনটি ঘটনা পাঠকদের জানানোর লোভ সামলাতে পারছি না।

ঘটনা-১ : একবার একটি কলেজের প্রতিষ্ঠার ১২ বছর পূর্তিতে হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন প্রধান অতিথি। কলেজের নাম ঢাকা “ইমপিরিয়াল কলেজ”। প্রধান অতিথির স্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের দর্শকসারিতে আমি, ভোঁতামুখে বসে বক্তৃতা শুনিছি। সবার শেষে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় স্বভাবেসুলভ ভঙ্গিতে মজার মজার অনেক কথা বললেন হুমায়ূন। এমনকি আগের রাতে হওয়া আমাদের ঝগড়ার কথাও বলে ফেললেন। এক পর্যায়ে আমাকে অবাধ করে দিয়ে মধ্যে ডাকলেন তাঁর প্রিয় জাপানি গানটি সবাইকে শোনানোর জন্যে। গানের অর্থ ‘সুখী যদি হতে চাও হাতে তালি দাও।’ এই তথ্য সবাইকে যেমন জানালেন, তেমনি গানের কোন জায়গায় হাতে তালি কিংবা মেঝেতে বাড়ি দিতে হবে তাও বুঝিয়ে দিলেন। হলভর্তি প্রায় আড়াই হাজার ছাত্রছাত্রী যখন একসঙ্গে গানের ফাঁকে ফাঁকে মেঝেতে পা দিয়ে বাড়ি এবং হাতে তালি দিচ্ছিল তখন এক অভূতপূর্ব পরিবেশ তৈরি হয়েছিল।

ঘটনা-২ : ২০০৮ সালে বেক্সিফেব্রিক্স অন্যান্যদিন ঈদ ফ্যাশন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আমি গান গেয়েছিলাম। ‘যদি মন কাঁদে তুমি চলে এসো এক বরষার’ গানের শুরুতেই দর্শকসারিতে চোখ পড়ল। দেখলাম প্রথম সারিতে বসে হুমায়ূন, মিটিমিটি হাসছেন। কী আশ্চর্য! অনেক অনুরোধ করেও তো তাঁকে কোনো অনুষ্ঠানে নেওয়া যায় না। গান শেষে তাঁর পাশে গিয়ে একথা বলতেই জানালেন— ‘দর্শকসারিতে বসে তোমার গান শুনে কেমন লাগে তা দেখতে চলে এলাম।’

তাঁকে দেখে আয়োজকরা মহাশয় এর পরের বছরগুলোতেও একই অনুষ্ঠানে গান গাইবার আমন্ত্রণ পেয়ে বসেছেন, শুধু আমার গান নয়, গানের টানে অনুষ্ঠানে যাওয়া হুমায়ূনকেও তাদের প্রয়োজন।

ঘটনা-৩ : ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত একটি সরাসরি গানের অনুষ্ঠানে গান গাইছিলাম আমি। দেশ টিভির ‘কলের গান’। টেলিফোনে বিভিন্ন গানের অনুরোধ পাঠাচ্ছেন দর্শন। হঠাৎ একজন দর্শকের গলা শুনে চমকে উঠলাম।

“আমার নাম হুমায়ূন আহমেদ আমি নিষাদের মার কাছে একটি গানের অনুরোধ করতে চাই। গানটি হলো ...।”

হুমায়ূন শাওনের শেষ আনন্দময় গানের আসরটি বসেছিল মেরিল্যান্ডের এক বাসায়। শ্রোতা ছিলেন প্রবাসী লেখক মুনিয়া মাহমুদ ও তাঁর স্বামী নূরুদ্দিন মাহমুদ, হুমায়ূন আহমেদের ছেলেবেলার বন্ধু ফানসু মণ্ডল ও তাঁর স্ত্রী স্বপ্না ভাবি, গৃহকর্তা নজরুল ইসলাম ও তাঁর স্ত্রী তানিয়া, প্রবাসী পরিচালক সাইফুল ইসলামসহ আরও কয়েকজন। হুমায়ূন আহমেদ তাঁর পছন্দের গানগুলোর ইতিহাস বলছেন এবং পরক্ষণেই তাঁর টেপরেকর্ডার, আমি, সেই গানটি গেয়ে শোনাচ্ছি। ১৯০৫ সালে রেকর্ডকৃত প্রথম গান নিধুবাবুর টপ্পা, রবীন্দ্রনাথের গান, নজরুলের গান, রামকুমার

চট্টোপাধ্যায়ের গান এবং হুমায়ূন সঙ্গীত হলো। আমাদের প্রায় সব গানের আসর মৃত্যুসংগীত দিয়ে শেষ হলেও হুমায়ূন আহমেদ অসুস্থ হওয়ার পর থেকে ওই বিশেষ গানটি আমি গাইতে চাইতাম না।

পাঠকের যেমন মৃত্যু হয়, শ্রোতারও মৃত্যু হয়। অতি প্রিয় গান একসময় আর প্রিয় থাকে না। তবে কিছু গান আছে কখনো তার আবেদন হারায় না। আমার কাছে মরমি কবি গিয়াসউদ্দিনের একটি গান সে রকম। ওস্ত ফুলসে কবি গিয়াসউদ্দিনের একটি গান সে রকম। ওস্ত ফুলস ক্লাবের প্রতিটি আসরে একসময় এই গান গীত হতো। শাওনের প্রবল আপত্তির কারণে এই গান এখন আর গীত হয় না। গানটির গুরুত্বপূর্ণতা—

মরিলে কান্দিস না আমার দায়

ও জাদুধন মরিলে কান্দিস না আমার দায়।

কিন্তু সেদিন হুমায়ূনের গানটি শোনার প্রবল ইচ্ছার কাছে হার মানলাম। গান শুনে প্রথম দিনের মতো কাঁদলেন তিনি।

এরপর আর গান শোনানো হয়নি তাঁকে দ্বিতীয়বার অপারেশনের সাত দিন পর ফুসফুসে ভাইরাস সংক্রমণের কারণে তাঁকে মেশিনের সাহায্যে কৃত্রিমভাবে শ্বাস নিতে হয়। প্রক্রিয়াটি অস্বস্তিকর বলে বেশিরভাগ সময়ই তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হতো। সারা দিনে কেবল ১-২ ঘণ্টার জন্য তাঁর ঘুম ভাঙত। মুখে নল থাকার কারণে কথা বলতে না পারলেও আমাদের সব কথা শুনতে ও বুঝতে পারতেন তিনি। সেই সময়টাতে তাঁর সারা গায়ে হাত বুলািয়ে দিতাম, তাঁর সাথে কথা বলতাম নুহাশের কথা, নিষাদের কথা, নিনিতেব্বার কথা, নুহাশপত্নীর তাঁর প্রিয় গাছগুলোর কথা, আমার কথা। মাঝে মাঝে তাঁর চোখ বেয়ে পানি পরত, তাঁর হাত দিয়ে শক্ত করে ধরতেন আমার হাত। একদিন দেখলাম পাশের রুমে কোমায় থাকা এক রোগীকে নার্স গুনগুন করে গান শোনাচ্ছে আর চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে। জিজ্ঞেস করতেই নার্স জানালেন রোগীকে মিউজিক থেরাপি দেওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, একইভাবে গান শুনিয়ে হুমায়ূন আহমেদকে আমিও তো থেরাপি দিতে পারি। কিন্তু সেই সুযোগ আর দিলেন না হুমায়ূন। ১৯ জুলাই। নীরব নিখর হুমায়ূনের সাথে ডাক্তাররা যখন আমাকে একা কিছুটা সময় কাটাতে দিলেন তখন ...।

না। আমাকে দেওয়া গুরুদায়িত্ব পালনে তাঁর শবদেহের পাশে বসে 'মরিলে কান্দিস না আমার দায়' গানটি ধরতে পারিনি। হুমায়ূনের টেপারেকর্ডার বিকল হয়ে গেছে সেদিন থেকে।

শাওন

বাংলাদেশের হৃদয়ে হুমায়ূন

হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে এ বছর আমার সাক্ষাৎ হয়, যখন তিনি কয়েক সপ্তাহের জন্য ঢাকা এসেছিলেন, ক্যানসার চিকিৎসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাওয়ার আগে। এটাই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ মাথার চুল ছোট করে কাঁটা, জনসমক্ষে তিনি হ্যাট পরে হাজির হতেন, কিন্তু বাসায় পরতেন না। এ ছাড়া তাঁকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে, তিনি ভালো নেই। বরং তাঁকে এতটাই অবিশ্বাস্য রকম সুস্থ দেখাচ্ছিল যে আমি নিশ্চিত ছিলাম, চিকিৎসা শেষ করে আবার তিনি তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনে ফিরে যাবেন পূর্ণোদ্যমে। দুঃখ, তা আর হলো না।

তাঁর খাদ্যানুরাগ এবং অতিথিপরায়ণতার কথা আমি শুনেছিলাম, এবার নিজেই তার অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। আমি তাঁর উপন্যাস 'মধ্যাহ্ন' ইংরেজি অনুবাদের কাজ করছি। এ বিষয়ে আমার কিছু জিজ্ঞাসা ছিল। আমার নোট থেকে সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার পর তিনি আমাকে চা-নাস্তা আপ্যায়ন করলেন। একপ্রোট মন্ডা আনা হলো, এটি আমার প্রিয় মিষ্টি, কিন্তু কোনো কারণে আমি সবিনয়ে অপরাগতা জানলাম। তিনি জানতে চাইলেন স্বাস্থ্যগত কোনো কারণে মিষ্টি খেতে আমার অনিচ্ছা কিনা। আমি যখন না বললাম, তখন তিনি আমাকে খেয়ে দেখতে অনুরোধ করলেন। বললেন, খুব ভালো মিষ্টি এটা। আমি একটা নিব্বা, হ্যাঁ, সত্যি খুব ভালো।

ঘরে অনেক লোকজন ছিল, এবং আমার মনে হলো অন্যদেরকে কথা বলার সুযোগ দেওয়া উচিত, আমার যাওয়া উচিত। যখন আমি যাওয়ার জন্য উঠলাম, তিনি আমাকে তাঁর মিসির আলি নিয়ে লেখা গল্প সংকলন 'ভয়'-এর একটি কপি দিলেন। আপনার হয়তো ভালো লাগবে, তিনি বললেন।

এই আমার প্রথম ও শেষ দেখা হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে।

অবশ্যই বেশির ভাগ বাংলাদেশীর মতোই আমি তাঁর সম্পর্কে জানতাম। টেলিভিশনে তাঁর ধারাবাহিক নাটক আমি দেখেছি, কিছু ছোটগল্পও আমি পড়েছি। তার কাছে বেশ কয়েকবার চিঠিও লিখেছি, কখনো তাঁর ছোটগল্পের অনুবাদের অনুমতি চেয়ে, কখনো অনূদিত গল্প কোনো সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়ে। সবসময় তাঁর সম্মতি পেয়েছি। গল্প সংকলনগুলোর বেশ কয়েকটি প্রকাশনা উৎসব হয়েছে, তিনি কখনো আসতে পারেন নি।

টিভি নাটক, নাকি তাঁর লেখা-কোনটার মাধ্যমে প্রথমে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছি ঠিক মনে নেই হয়তো একটি সময় যদিও তাঁর টিভি নাটক আমি খুব উপভোগ করেছি,

তাঁর ছোটগল্প আমাকে তাঁর লেখার প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে। স্বীকার করতে হবে, তাঁর ছোটগল্পের প্রতি আমার আগ্রহ ঠিক সরাসরি হয়নি। আমার এক ননদ খুব পড়ুয়া এবং তাঁর পড়া বই নিয়ে আমার সঙ্গে গল্প করতে খুব পছন্দ করে। সে বলল, আমি হুমায়ূনের ছোটগল্প পড়লে আনন্দ পাব। আমি তার শ্রেষ্ঠগল্পের একটা কপি পেয়ে গেলাম এবং আবিষ্কার করলাম হুমায়ূন আহমেদ ছোটগল্পের এক নিপুণ রূপকার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন বলেছেন, ছোটগল্প হচ্ছে ছোট কথা, ছোট ছোট সুখ-দুঃখ যা মনের মধ্যে ছাপ ফেলে যায়। হুমায়ূনের ছোটগল্পগুলো রবীন্দ্রনাথের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়—

ছোট প্রাণ ছোট কথা
ছোট ছোট দুঃখ ব্যথা
নিতান্তই সহজ সরল
ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্তি হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।

হুমায়ূন আহমেদের লেখা যে ছোটগল্পটি আমি প্রথম পড়ি ও অনুবাদ করি তা হলো ‘খাদক’—আমার মন থেকে কিছুকিছু আমি খাদকের দৃশ্যকল্প অপসারণ করতে পারছিলাম না। এটা একজন লেখকের গল্প, যে দর্শকদের আনন্দ দেওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে খাবার খায়। একজন বর্ণনাকারীর বর্ণনায় গল্পটি লিখেন লেখক, যে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নয় বরং একজন প্রত্যক্ষদর্শী। হুমায়ূন আহমেদের আরও অনেক গল্প এই ভঙ্গিতে লেখা (হয়তো সমারসেট মম দ্বারা অনুপ্রাণিত, তাঁর উপন্যাস এই কায়দায় লেখা)। গল্প শেষ হয় খাদকের খাওয়া চলতে চলতে যখন তার ক্ষুধার্ত শিশুরা তার দিকে তাকিয়ে থাকে। বর্ণনাকারী প্রশ্ন করে, গল্পের শেষটা কি আনন্দদায়ক হবে? খাদক কি খাওয়া বন্ধ করে তার শিশুদের ক্ষেতে দিবে? কিন্তু না, সে খেতেই থাকে। গল্পের মধ্যে গভীর ভাব গাথা সামাজিক কটাক্ষ আছে। বাংলা একাডেমী জার্নালে গল্পের ইংরেজি অনুবাদ ছাপা হয়, পরে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাঙালিদের সাহিত্য পত্রিকা ‘ভয়েস’-এর সংকলনে এটি প্রকাশিত হয়।

তাঁর অন্য যে গল্পগুলো আমি পড়েছি এবং অনুবাদ করেছি বা অন্যদের করতে অনুরোধ করেছি গল্প সংকলনের জন্য, তার মধ্যে রয়েছে—‘অয়োময়’, ‘১৯৭১’, ‘জলিল সাহেবের পিটিশন’ ও ‘অপরাহ্ন’। ‘অয়োময়’—যার সঙ্গে এই নামের টিভি সিরিয়ালের কোনো মিল নেই—একজন ধনী জমিদার ও একজন মুর্মূষ মানুষের সম্পর্ক নিয়ে এই

গল্প রোজার মাস, জমিদার সাহেব অনেক কিছু নিয়ে ব্যস্ত। তার কাছে আশ্রয় নেওয়া গরিব ও অসুস্থ লোকটিকে নিয়ে সে সময় নষ্ট করতে চায় না। তাকে জানানো হয় লোকটিকে তওবা পড়ানো হলে সে তাড়াতাড়ি মারা যাবে। মসজিদের ইমাম সাহেবকে ডাকা হলো তওবা পড়ানোর জন্য— পড়ানোও হয় যথারীতি। লোকটি মরে না। সবার ধারণা লোকটা মরতে চায়না, এইজন্য তওবার ভান করেছে মাত্র। শেষ পর্যন্ত জমিদার সাহেবের মন বদলায়। লোকটা যদি বাঁচতেই চায়, তাহলে তাকে বাঁচতে দেওয়া উচিত। সে ঠিক করল তাকে শহরে নিয়ে যাবে, সেখানে তার ঠিকমতো চিকিৎসা ও সেবা দেওয়া যাবে। কয়েক পাতার গল্পে চিত্রিত হয় শ্রেণীবৈষম্য, ধর্মীয় আচার, কুসংস্কার, মানবিক সম্পর্ক এবং সর্বোপরি মানুষের বেঁচে থাকার ইচ্ছা।

‘১৯৭১’ এবং ‘জলিল সাহেবের পিটিশন’ দুটো গল্পই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে। প্রথমটি যুদ্ধের ও পরেরটি যুদ্ধের কয়েক বছর পরের প্রেক্ষাপটে লেখা। দুটোই কালোস্তীর্ণ। ‘১৯৭১’ একজন নিরস্ত্র সাধারণ বাঙালির পরিকল্পনা সেনাবাহিনীর সামনে অসীম সাহসিকতা দেখানোর গল্প ‘জলিল সাহেবের পিটিশন’ একজন পিতার সংগ্রামের গল্প। যে তার দুই ছেলেকেই যুদ্ধে হারিয়েছে। জলিল সাহেবের চাওয়া এইটুকুই তার ছেলে ও তাদের মতো যারা ১৯৭১-এ আত্মত্যাগ করেছে তাদেরকে সবাই স্বীকৃতি দিবে। তিনি একটা ফাইল হাতে নিয়ে নানা জায়গায় ঘুরাঘুরি করেন। গল্পের শুরুতে বর্ণনাকারী তাকে একজন খ্যাপাটে উপদ্রুত হিসাবে উপস্থাপন করে— পাঠকেরাও হয়তো একই রকম মনে করে। এরপর বর্ণনাকারী বিদেশে চলে যায়। ফিরে এসে দেখে লোকটি মারা গেছে। সে ভাবে জলিল সাহেবের অসমাপ্ত কাজ সে শুরু করবে। শেষ পর্যন্ত সে নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে যায়, এবই কাজটি আর করা হয়ে ওঠেনা। এভাবেই হুমায়ূন আহমেদ আমাদের সবাইকে অভিযুক্ত করেন, আমরা যারা মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের সুফল ভোগ করছি অথচ তাদের ব্যাপারে নীরব অথবা নিরাবেগ থাকছি।

আরেকটি চিন্তাসম্ভারী গল্প ‘অপরূহ’, একজন রিকশাচালকের মৃত্যু নিয়ে লেখা। কিছুদিন হলো ঢাকার অনেক রাস্তায় রিকশা চলেনা, কিন্তু একসময় রিকশাই ছিল সর্বত্র সাধারণ বাহন, রিকশাচালককে নিয়ে লেখা গল্পে আমরা যারা রিকশায় চড়ি বা কখনো চড়েছি সবাই নিজেদের অভিজ্ঞতাগুলো খুঁজে পাব। যেমন, আমরা ভাড়া কমানোর জন্য দর কষাকষি করি। তারপর যে লোকটা রিকশা চালাচ্ছে তার প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ উদাসীনতা— এগুলো দারুণভাবে তুলে ধরেছেন লেখক। এটা একটা বিষাদময় গল্প রিকশা চালকটি মারা যায়। অবশ্য এর মধ্যে কিছু হাস্যরসও আছে যেমন বর্ণনাকারী আরেকটি রিকশাচালক ঠিক করার সময় তাঁর নাম জিজ্ঞেস করে, জানতে চায় সে সুস্থ কি না ইত্যাদি। সে চায় না এই রিকশাচালকটিও আগের জনের মতো তাকে নিয়ে মারা যাক।

বেশ কয়েক বছর আমি যখনই গল্প সংকলন করেছি, হুমায়ূন আহমেদের ছোটগল্প সেখানে রেখেছি। এরপর কোনো কারণে সেটা থেমে গেল। এরপর গত বছর আমাকে অনুরোধ করা হলো তার উপন্যাস ‘মধ্যাহ্ন’ অনুবাদ করার জন্য। আমি ইতস্তত করছিলাম। আমি ছোটগল্প অনুবাদ করেছি, কিন্তু কখনো উপন্যাস নিয়ে কাজ করিনি। চারশত পৃষ্ঠা অনুবাদ করার সময় কি আমার আছে? কিন্তু আমি না বলতে পারলাম না। হুমায়ূন আহমেদ সবসময় তাঁর গল্প অনুবাদ করতে এবং সংকলন প্রকাশে আমাকে সম্মতি জানিয়েছেন। কাজেই আমিও সম্মত হলাম, এই শর্তে— আমি একা পুরো অনুবাদ করতে পারব না, আরেকজন অনুবাদককে সঙ্গে নিব।

হ্যাঁ, ‘মধ্যাহ্ন’র অনুবাদের প্রথম খসড়াটির কাজ শেষ হয়েছে। এইজন্যই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে আমি সেটা নিয়ে আলাপ করার সুযোগ পেলাম।

আমার কিছু প্রশ্ন ছিল রচনাভঙ্গি নিয়ে। কিন্তু লেখার বিষয়বস্তু নিয়ে উদাহরণস্বরূপ, বাংলা উপন্যাস লেখা হয় বর্তমান কালে, ইংরেজি অতীতকালে। আমরা কোনটি ব্যবহার করলে তিনি পছন্দ করবেন? তিনি বললেন, বর্তমানকাল। এরপর উদ্ধৃতি চিহ্ন, বাংলা সাহিত্যে এর ব্যবহার নেই, ইংরেজিতে আছে। তিনি বললেন, উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করতে। খসড়াটি পুনর্মাফাফ করার সময় আমি এবং আমার সহঅনুবাদক এই পরিবর্তনগুলো করলাম। কিন্তু কিছু প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে গেল, যেগুলো তিনি ভেবে জানাতে চেয়েছিলেন।

আমি বিষণ্ণ, তিনি আর নেই। বিষণ্ণ কারণ তাঁকে অনুবাদটির কাজ শেষ হওয়ার পর দিতে পারলাম না। বিষণ্ণ কারণ যে প্রশ্নগুলো নিয়ে তাঁর ভাবার কথা ছিল সেগুলোর উত্তর জানা হলো না। বিষণ্ণ, বইটির নাম নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলা হলো না। কিন্তু আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই হুমায়ূন আহমেদ— আপনার ছোটগল্পের জন্য, আপনার নাটকের জন্য, আপনার সিনেমার জন্য, আমাকে বিংশ শতকের তৃতীয় ও চতুর্থ দশক নিয়ে লেখা এই ঐতিহাসিক উপন্যাসটি পড়ানোর জন্য।

আমার এই শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষ করতে চাই মার্কিন কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের একটি উক্তি দিয়ে, “একজন কবির প্রমাণ হলো তার দেশ তাকে ততটাই স্নেহাৰ্হ হয়ে আপন করে নেয়, যতটা আপন সে তার দেশকে করে নেয়।” হুমায়ূন আহমেদকে বাংলাদেশ কতটা আপন করে নিয়েছে সেটা যদি কখনো মূল্যায়ন করা প্রয়োজন হয়, তাহলে শুধু তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে শহীদ মিনারে জড়ো হওয়া অসংখ্য মানুষের মিছিল স্মরণ করলেই হবে। তিনি চল্লিশ বছর ধরে তাদের আনন্দ দিয়েছেন, একটি পুরো প্রজন্মকে বাংলাদেশী বই পড়তে অনুপ্রাণিত করেছেন

—নিয়াজ জামান

গিডার

বড় ভাই হুমায়ূন আহমেদের মতো খেয়ালি মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। নিজের ইচ্ছের বাইরে সে কখনোই কিছু করেনি। একবার সে আমেরিকা যাচ্ছে কোন একটা বইমেলায়। হঠাৎ আমাকে ফোন দিল— এই তোর পাসপোর্ট আছে না? আছে বোধহয়। ভেতরে ভেতরে আমি সতর্ক হয়ে গেলাম। এরপর সে কী বলতে পারে! ওপাশ থেকে বলল, ‘বোধহয় আবার কী? খুঁজে বের করে জলদি জানা। তুই আমার সঙ্গে আমেরিকা যাবি।’ আমার তো কলিজা উড়ে গেল। দুটা কারণে কলিজা উড়ে গেল। এক. আমার প্রবল বিদেশ ভীতি (মতান্তরে প্লেন ভীতিও বলা যায়) আছে। দুই. তার তার সঙ্গে একা একা আমেরিকা যাওয়া মানে ধমক খেতে খেতে যেতে হবে। ধমক খাওয়ার সঙ্গত কারণও আছে। কারণ আমার পাসপোর্টে সাদা-কালো ছবি। সে পাসপোর্টে সাদা-কালো ছবি দেখলে ভয়ানক রেগে যায়।

যা হোক, পরদিন ভয়ে ভয়ে ফোন করে জানালাম, ইয়ে দাদাভাই পাসপোর্ট খুঁজে পাচ্ছি না। (মিথ্যা কথা)। চোখ কান বুজে ওপাশ থেকে একটা প্রবল ধমক খাওয়ার জন্য প্রত্তুতি নিলাম। কিন্তু না ধমক দিল না, তবে একটা বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করে ফোন রেখে দিল। সে যাত্রায় আমার আর আমেরিকা যাওয়া হলো না। আর কী আশ্চর্য দুদিন পরে শুনি সেও যাচ্ছে না। তার নাকি আর ভালো লাগছে না। ওদিকে আমেরিকার আয়োজকদের মাথায় হাত পেরকম তার খেয়ালি আচরণের কারণে সে অনেকের মাথায় বহবার হাত দিতে সক্ষম করেছে।

এরকম আরেকবার কোথায় যেন সে দাওয়াত গ্রহণ করেছে। তারপর হঠাৎ তার আর যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। পেঁ কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেছে কিছু লিখতে। আমাকে ডেকে বলল, ‘যা তো ওদের গিয়ে বল আমার শরীর খারাপ যেতে পারছি না...তুই ম্যানেজ কর।’

আমি ম্যানেজ করতে ছুটলাম। আয়োজকরা যখন গুনল সে আসবে না, যথারীতি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। আমিও সমবেদনা জানাতে তাদের পাশে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। দেশের মধ্যে মাথায় হাত দিয়ে বসা তবু সহ্য হয় কিন্তু বিদেশের মাটিতে মাথায় হাত দিয়ে বসা ... বোধহয় সহ্য করা একটু মুশকিল। তবে সে আবার পরে কীভাবে কীভাবে যেন মাথায় হাত দেওয়া আয়োজকদের নিজেই ম্যানেজ করত। তখন তারাও তার না-যাওয়ার মধ্যে প্রচুর আনন্দ খুঁজে পেত।

তবে যে দু’বার বিদেশ গিয়েছি সেটা তার কল্যাণেই গিয়েছি। আমরা পরিবারের সবাই মিলে। প্রচুর আনন্দ হয়েছে দুবারই। সেই স্মৃতি ভোলার নয়। সেখানে র‍্যাফটিং

থেকে শুরু করে যত ধরনের অ্যাডভেঞ্চার করা যায় সবই করেছি আমরা। এবং সব অ্যাডভেঞ্চারের লিডার সে।

একসময় সে ছিল আমাদের সকল আনন্দের লিডার আর এখন সে আমাদের সমস্ত বেদনার লিডার ... সেই লিডারের ছবির নিচে এখন ছোট করে লেখা থাকে '১৯৪৮-২০১২'। আমি এখনো আশ্চর্য হয়ে ২০১২ সংখ্যাটার দিকে তাকিয়ে থাকি ...। এমন প্রপঞ্চক একটা সংখ্যা? ... এক নিষ্ঠুর?

মনে আছে আজ থেকে চল্লিশবছর আগে স্বাধীনতার পর পর আমরা সবাই লঞ্চ করে পিরোজপুর যাচ্ছিলাম। শহীদ বাবার কবর দেখতে। লঞ্চের কেবিনে সবাই বসে আছি, বড় ভাইয়ের খবর নেই। সে আসছে না। লঞ্চ ছাড়ে ছাড়ে অবস্থা হঠাৎ তাকে দেখা গেল। তার হাতে একটা বড় বাক্স সমাধিফলক। তাতে লেখা—

শহীদ ফয়জুর রহমান আহমেদ, এসডিপিও, পিরোজপুর, সাহিত্য সুধাকর।

তার নিচে লেখা—

'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ যে তুমি নয়নে ...'

আমার-মা-বোনরা শ্বেতপাথরে হাত রেখে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল ...'

না, বড় ভাইয়ের কবরে কোনো শ্বেতফলক এখনো বসানো হয়নি। হয়তো একদিন বসানো হবে, সেখানে কী লেখা হবে আমি জানি না। এসব তো সে-ই ঠিক করে দিত। তার জন্যই আমরা অপেক্ষা করব ... কারণ মরে মৃত্যুহীনদের কাজেই যে একমাত্র মহান মৃত্যু আসে।

-আহসান হাবীব

জীবনবাদী হুমায়ূন আহমেদ

খুঁজেছেন। আনন্দ খুঁজে নিয়েছেন। আর তাই তাঁর লেখা নাটক, চলচ্চিত্র ও উপন্যাসে জীবনের অনেক কঠিন সত্য সহজ-সরলভাবে উঠে এসেছে।

ক্যানসার ধরা পড়ার পর সিঙ্গাপুর থেকে যখন হুমায়ূন আহমেদ বাংলাদেশে ফিরে এলেন, আমি তখন এয়ারপোর্টে যাই তাঁকে রিসিভ করতে। তিনি আমাকে দেখে খুবই বিস্মিত হলেন। যদিও এর আগে সিঙ্গাপুরে যখন তাঁর বাইপাস হলো তখনো তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। কিন্তু এর আগে তিনি বহুবার বিদেশ থেকে দেশে ফেরার সময় এয়ারপোর্টে কখনোই রিসিভ করতে যাইনি। এমনকি তাঁর সঙ্গে দলবলে কখনো কোথাও ঘুরতে যাওয়াও হয়নি। তাই হয়তো তিনি আমাকে এয়ারপোর্ট দেখে বললেন, কী ব্যাপার! তুমি কি এই আশা করেই এসেছো যে আমি আর জীবিত ফিরব না?

আমি একটু অপ্রস্তুত হয়েই বললাম, না হুমায়ূন ভাই! আপনার শরীরটা একটু ঋণাত্মক, তাই এয়ারপোর্টে এসেছি আপনাকে রিসিভ করার জন্য। এদিকে কাস্টমসের লোক, পুলিশের লোক, কেউ হুমায়ূন ভাইয়ের ছাত্র কেউ তাঁর ভক্ত, সবাই যখন জানল যে হুমায়ূন আহমেদ এসেছেন-সবমিলিয়ে বেশ কিছুসংখ্যক একটা ভিড় লেগে গেল। এত মানুষ দেখে হুমায়ূন আহমেদ ভাবলেন, তিনি অসুস্থ এই খবর নিশ্চয়ই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং এই জন্যই সবাই তাঁকে দেখতে এসেছে। অথচ তাঁর অসুস্থতার খবর আমরা যারা ঘনিষ্ঠজন ছিলাম তাঁর ছাড়া আর কেউ জানতেন না। আসলে তিনি এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন যে, তাঁর আসার খবর শুনে তাকে একনজর দেখার লোভ কেউ সংবরণ করতে পারেনি। সবশেষে তিনি যখন তার গাড়ির কাছে গেলেন সেখানেও বেশ কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই দলটাকে দেখে তিনি বললেন, তোমরা বোধহয় খুব আনন্দিত হতে আমি যদি না হেঁটে আসতাম। এই যে উপলব্ধি, তিনি দাঁড়িয়ে আসবেন নাকি শুয়ে আসবেন তিনি যেভাবে ভেবেছেন বা দেখেছেন আমরা সেভাবে ভাবিনি, দেখিনি। এই যে শুয়ে আসার ব্যাপারটা তিনি যতটা সহজভাবে উপস্থাপন করেছেন, আমরা সেটা কখনোই করতে পারতাম না। শুধু বলতে পারি তাঁর শুয়ে আসার দৃশ্য দেখে কেউই আনন্দিত হতে পারেনি। পুরো দেশ চোখের জলে ভেসেছে। তাঁর মৃত্যুতে যে জনসমুদ্র সৃষ্টি হয়েছিল তা বাংলাদেশের ইতিহাসে বিরল। এটি শুধু তাঁর সৃষ্টিশীল সত্তার জন্য নয়, তাঁর মহৎ মানবিক সত্তার জন্যও।

তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে টেলিভিশন নাটকের কারণে। ইমপ্রেস টেলিফিল্ম যখন বাংলাদেশে প্রথম যাত্রা শুরু করে ঢাকায় সেই সময় সবচেয়ে বড় প্রোডাকশন হাউস ছিল 'ইনফ্রেম'। বাংলাদেশের খ্যাতিমান নির্মাতারা সবাই সেই সময়

নাটক তৈরি করতেন সেখান থেকেই। সঙ্গত কারণেই তারা নতুন একটি জায়গা থেকে অনুষ্ঠান করতে রাজি ছিলেননা। নবীন পরিচালকেরাই শুধু সেই সময়ে ইমপ্রেসের কারিগরি সুবিধা নিয়ে নাটক নির্মাণ করছিলেন। সেই সময়েই শুনতে পেলাম বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও নির্মাতা হুমায়ূন আহমেদ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ইমপ্রেস থেকে নাটক পরিচালনার জন্য। সে সংক্রান্ত আলোচনার জন্যই তার সঙ্গে দেখা করতে যাই। সেই সময়ে তিনি শান্তিনগরের সাসটেইন স্টুডিওতে একটি নাটকের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের কাজ করছিলেন। সেখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। তাঁর সঙ্গে আগে থেকেই কিছুটা আলাপ-পরিচয় থাকলেও ঘনিষ্ঠতার শুরু এখান থেকেই। বড় নির্মাতাদের মধ্যে তিনিই প্রথম যোগ দিলেন ইমপ্রেস টেলিফিল্মে। একটি নতুন চ্যানেলের যাত্রা সময়ে হুমায়ূন আহমেদের মতো একজন বড় মাপের নির্মাতা চ্যানেল আইয়ের সঙ্গী হওয়ায় তাঁর সহযোগিতায় আমাদের বন্ধুর চলার পথ অনেকটাই মসৃণ হয়েছিল। তিনি ছিলেন চ্যানেল আই পরিবারের অন্যতম সদস্য, তার শেষ সময় পর্যন্ত সঙ্গে থেকে তিনি চ্যানেল আই এবং এর সকল দর্শককে করেছেন নানাভাবে সমৃদ্ধ। তিনি এমন একজন সৃজনশীল মানুষ যিনি যেখানেই হাত দিয়েছেন সেখানেই সোনা ফলেছে। আর ইমপ্রেস টেলিফিল্মের সঙ্গে কাজ শুরু করার পর থেকেই নির্মাতার হুমায়ূন আহমেদ নাটকের বাইরেও বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

একসময় হুমায়ূন আহমেদ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান নির্মাণের চিন্তা করলেন। গতানুগতিক ধারার বাইরে একেবারে অস্বাভাবিক একটি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান শুরু হবে ঢোল বাজিয়ে। ঢোল বাজাবে একজন নয়, বেশ কয়েকজন ঢুলি। যেখানে ঢাকা শহরে একজন ঢুলি পাওয়াই ছিল কষ্টসাধ্য ব্যাপার, সেখানে তিনি জোগাড় করলেন বেশ কয়েকজন। সেই সময় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান মানেই যেখানে ছিল বড় বড় সব শিল্পীর গান, সেখানে হুমায়ূন আহমেদ গাওয়ালেন প্রথমবারের মতো বারী সিদ্দিকীকে দিয়ে। অসাধারণ এই ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানটির নামটাও ছিল বেশ অদ্ভুত। 'রঙের বাড়'। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন প্রথিতযশা অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূর।

হুমায়ূন আহমেদ তৈরি করেছিলেন সঙ্গীতানুষ্ঠানও, যেখানে ফিরোজা বেগমের মতো বড় মাপের শিল্পী শুধু অংশগ্রহণই করেননি, বেশ কয়েকদিন পরিশ্রম করে অনুষ্ঠান ধারণে সহায়তাও করেছিলেন। দেশের প্রথম টেলিফিল্ম তৈরির কৃতিত্বও তাঁর। এটির নাম হলো 'নীতু তোমাকে ভালবাসি'। নিজের নাটক ও চলচ্চিত্রের অংশবিশেষ নিয়ে তিনি বেশ কয়েকটি বিজ্ঞাপনও নির্মাণ করেছিলেন।

এমনকি বিচার-কর্মের প্রতি চরম অনীহা থাকা সত্ত্বেও চ্যানেল আইয়ের ক্ষুদে গানরাজের বিচারক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। অবশ্য এটা তাকে দিয়ে

করানো সম্ভব হয়েছে গানের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসার জন্য। আমরা জানি, তিনি বেশকিছু গান রচনা করেছেন এবং প্রতিটি গানই ভীষণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। যারা গান গায় কিংবা গানের সঙ্গে যাদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, তাদেরকে তিনি ভীষণ ভালোবাসতেন। তাই আমরা ভাবলাম যে মানুষটি গানকে এতটা ভালোবাসে, তাঁকে দিয়েই যদি আমাদের নতুন প্রজন্মের শিল্পী নির্বাচন করি তবে এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না। এই চিন্তা থেকে তাঁকে বিচারক হওয়ার জন্য বলি। তিনি সানন্দেই রাজি হয়েছিলেন। শুধু ভালোবাসার টানে। এটাও তাঁর চরিত্রের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি যাকে কিংবা যা কিছু পছন্দ করতেন, ভালোবাসতেন, তার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতেও দ্বিধা করতেন না।

আর একটা ব্যাপার তার মধ্যে ছিল, তিনি যা কিছু ভালো মনে করতেন, যা কিছু করণীয় মনে করতেন, তা-ই করতেন। কে কী বলল বা ভাবল সেটা নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা ছিল না। বেশিরভাগ সময় দেখতাম তাঁর চিন্তাটিই সঠিক। তাঁর নির্মিত সর্বশেষ চলচ্চিত্র 'ঘেটুপুত্র কমলা' নির্মাণের শুরু থেকেই আমার সংশয় ছিল-এই ধরনের গল্পের একটি ছবি আমাদের দেশের মানুষ, আমাদের দর্শক কীভাবে নেবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, তিনি ছবিটি নির্মাণ করলেন এবং দর্শকও এটি খুব ভালোভাবে গ্রহণ করেছে। এমনকি দর্শক হিসেবে আমি নিজে ছবিটি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। তিনি এতটাই গুণী নির্মাতা ছিলেন যে অতি সাধারণ বিষয়কেও অনন্যসাধারণ করে তুলতেন। তবে এত বড় একজন নির্মাতার কাজ করার আনন্দ আর অস্বস্তির ছোঁয়া দুটোই আমরা পেয়েছিলাম। সমান্য একটু অসঙ্গতি খুঁজে পেলেই ভীষণভাবে রেগে যেতেন তিনি। হয়তো বলেই বসতেন, এই কাজ আমি শেষ করব না। তখন ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে যেতাম সবাই। প্রথমদিকে সবসময় আতঙ্কিত থাকতাম আমরা কিছুদিনের মধ্যেই সবাই বুঝে গেলাম, তাঁর রাগ অনেকটা শরতের প্রকৃতির মতোই। এই মেঘ এই রোদ্দুর। রাগ যেমন তিনি যুক্তিপূর্ণ কারণে করেন ঠিক তেমনি তাঁর সেই রাগ নেমে যেতেও সময় লাগে না।

তাঁর একটি অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তিনি মানুষকে খুব সহজে আপন করে নিতে পারতেন। মানুষকে অপ্রভুত করে, বিস্মিত করে কাছে টেনে নিতেন। তিনি যখন কোথাও যেতেন দেখা যেত তাঁর চারপাশে অজস্র মানুষের ভিড়। বলা যায় তাঁর কাছে ছিল সবার অবাধ বিচরণ।

দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অসামান্য। বিশেষ করে তরুণ সমাজ আর দেশের উন্নতি নিয়ে ভীষণভাবে ভাবতেন। তাঁর নানা সৃষ্টিকর্মেই এর প্রতিফলন দেখা গেছে। কখনো কখনো একটি ছোট্ট কথাও যে বুলেটের চেয়ে

শক্তিশালী হয় তিনি তা প্রমাণ করেছেন। 'বহুব্রীহি' ধারাবাহিকে 'তুই রাজাকার'-মাত্র এই দুটি শব্দ দিয়ে তিনি যুদ্ধাপরাধবিরোধী চেতনা, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়াকে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তরুণদেরকে সবসময় উদ্বুদ্ধ করতেন। একবার একটি চলচ্চিত্রের শুটিংয়ের সময় একটি ছেলে অনেক চেষ্টা-তদ্বির করে সুযোগ পেলে হুমায়ূন ভাইয়ের সঙ্গে একটি ছবি তোলায়। হঠাৎ তিনি ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কী কর? সে বলল, 'বিএ পরীক্ষা দিয়েছিলাম, কিন্তু পাস করতে পারি নি। তখনই তিনি ছবি তোলা বন্ধ করে ছেলেটিকে বলেন, 'তুমি বিএ পাস করে আমার সঙ্গে দেখা করবে, তখন আমি তোমার সঙ্গে ছবি তুলব। পরে ছেলেটি বিএ পাস করেই তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিল এবং সেদিন হুমায়ূন ভাই ছেলেটির সঙ্গে ছবি তুলেছিলেন।

এমনকি 'লাক্স-চ্যানেল আই সুপার স্টার' আয়োজনের ক্ষমিয়ে তিনি স্বৈচ্ছায় গিয়েছেন। প্রতিযোগীদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেছেন, এমন কিছু কথা বলেছেন, যা তাদের অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। তারা অনেক বেশি সমৃদ্ধ হয়েছে, মেধাবী হয়েছে।

এবিষয়ে ব্যক্তিগত একটি ঘটনা যোগ করি। হুমায়ূন আহমেদের সব লেখাই ছিল অসাধারণ, খুবই জনপ্রিয়। ছোটদের নিয়ে আমার লেখা একটি বইয়ের প্রকাশনা উৎসবে উপস্থিত ছিলেন তিনি এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। বইটির প্রকাশক অন্যপ্রকাশের মাজহারুল ইসলাম হুমায়ূন আহমেদের পত্রটি আগের রাতেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পরে শুনেছি তিনি রাত তিনটা পর্যন্ত পড়ে বইটি শেষ করেছিলেন এবং শেষ করার একটাই কারণ ছিল পরদিন দুপুরে প্রকাশনা উৎসবে এ সম্পর্কে তাঁকে কিছু বলতে হবে। তিনি বললেন, 'বইটি সম্পর্কে আমি না পড়েও বলতে পারতাম। যেহেতু আমি ছোটদের বই, ছোটদের নিয়ে লেখা বই পড়তে ভালোবাসি তাই আমি পুরো বইটি শেষ করেছি।' বইটির একটি চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্যও করলেন, 'যে চরিত্রটিকে অসম্পূর্ণ দেখানো হয়েছে; তার কোনো পরিণতি দেখানো হয়নি। অনেক বেশি মনোযোগ দিয়ে বইটি না পড়লে এমন মন্তব্য করা সম্ভব হতো না। তাঁর এই সততা, এই আন্তরিকতার কোনো তুলনা হয়না।

হুমায়ূন আহমেদের মতো একজন বড় মাপের মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল, তাকে আমি জানতাম, এটা আমার জন্য অনেক গর্বের অনেক অহংকারের। আবার মাঝে মাঝে মনে হয়, মানুষ হুমায়ূনের সঙ্গে হয়তো আজও আমার পরিচয় হয়নি। এত বৈচিত্র্যময় তাঁর জীবন! তাঁর জীবনে এত বড় বড় সব ব্যাপার রয়েছে যে সেসবের সঙ্গে পরিচয় হতে আমার আরও অনেক সময় লাগবে, হয়তো আজীবন।

তার কাছে আমরা ঋণী। তিনি আমাদের যা কিছু দিয়েছেন, এর প্রতিদান দেওয়ার সাধ্য আমাদের নেই। প্রতিদানে যে ক্ষুদ্র কথাটুকু তাঁকে দিতে চেয়েছি সে ক্ষেত্রেও রবি ঠাকুরের ওই লাইন দুটির কথা বারবার মনে হয়েছে—‘তোমারে যা দিয়েছি সে তোমারই দান/ গ্রহণ করেছে যত ঋণী তত করেছে আমার।’ আজকে আমার মনে হয়। অনেক কিছুতে আমরা তাকে চমকে দিতে চেয়েছি, আনন্দ দিতে চেয়েছি। কিন্তু তিনি তো মানুষের মন পড়তে পারতেন। তিনি বুঝতে পারতেন আমরা কী চাইছি। আমরা যেটা করতে চেয়েছি সেটা উনি আগে থেকেই বুঝতে পেরেছেন এবং সেইভাবেই তিনি চমকিত হয়েছেন, বিস্মিত হয়েছেন।

শেষবারের মতো হুমায়ূন আহমেদ আমেরিকায় চিকিৎসার জন্য যখন যান, তখন আমি তাঁকে একটা জাদুর বাস্র উপহার দিয়েছিলাম। যার মধ্যে কয়েন ফেললে কয়েনটি অদৃশ্য হয়ে যায়। তিনি এটা দেখে খুবই বিস্মিত হন। সবাইকে ডেকে বলেন, দেখো সাগর আমাকে কেমন বিস্ময়কর একটি জিনিস উপহার দিয়েছে! তারপরও তিনি এত বেশি বিস্মিত, চমকিত হয়ে আমাকে যে ভালো লাগা উপহার দিলেন তা সত্যিই অতুলনীয়। তাঁর মতো বড় মাপের মানুষেরা তো সর্বোচ্চ তৃপ্তি দেখেই বেশি আনন্দ পান।

যেদিন থেকে তিনি ইমপ্রেস টেলিফোন শো দেন সেই সময় থেকেই চ্যানেল আইয়ের বিশেষ আয়োজন মানেই হুমায়ূন আহমেদ। চ্যানেল আইয়ের জন্মদিন, দুই সপ্তাহের দিন রাত ৭:৪৫ মিনিট উৎসব করা হয়েছিল হুমায়ূন আহমেদকে। আগামীতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে। হুমায়ূন আহমেদ হয়তো আর কখনো নাটক-চলচ্চিত্র পরিচালনা করবেন না। কিন্তু তাঁর সৃষ্টি তো রয়ে গেছে। তিনি ছিলেন এক বিশাল সিন্ধু। সেখান থেকে তিনি মুক্তা একসময় নিজেই দান করতেন। এখন হয়তো সেগুলোকে কষ্ট করে আহরণ করতে হবে, এটুকুই পার্থক্য শুধু।

তার সৃষ্টিকর্ম কখনোই পুরনো হবে না। তাঁর নন্দিত নরকে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে যারা পড়েছেন, সেই লেখার প্রতি ভালো লাগা আজও তাদের তেমনই আছে। আবার চল্লিশ বছর পরের এই প্রজন্মের কেউ যখন বইটি পড়ছে, তারও উপন্যাসটি ঠিক একই রকম ভারো লাগছে, সমানভাবে আলোড়িত হচ্ছে সে। অন্য কথায়, তাঁর ৪০ বছর আগের সৃষ্টিগুলোকে এখনো মনে হয় সমকালীন আর একথা নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি যে, আগামী অন্তত চল্লিশ বছর তাঁর সৃষ্টি নিয়ে আমরা অনুষ্ঠান নির্মাণ করতে পারব অনায়াসেই।

আমাদের চেষ্টা থাকবে হুমায়ূন আহমেদকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি আজীবন রক্ষা করতে। কারণ তাঁর চরিত্রের এটাই যে সবচেয়ে বড় গুণ ছিল। তিনি কাউকে কোনো

কথা দিলে সেটি রাখার আশ্রয় চেষ্টা করতেন। 'ঘেটুপুত্র কমলা' তৈরি করার সময় তিনি বলেছিলেন, এটাই আমার শেষ ছবি। আমরা বারবার তাঁকে অনুরোধ করেছি যেন এটা তাঁর শেষ ছবি না হয়। তিনি যে তাঁর কথা রাখার জন্য এভাবে আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন ভাবতেও পারিনি। এটা যদি জানা থাকত তবে বলতাম, ঠিক আছে হুমায়ূন ভাই, এটাই আপনার শেষ ছবি, তবুও আপনি আমাদের মাঝে থাকুন।

হুমায়ূন আহমেদ যে আমাদের মাঝে নেই সে কথাই বা বলি কেন? তিনি তো আজীবন বেঁচে থাকবেন তাঁর সৃষ্টির মাঝে। আর তাঁর সৃষ্টিগুলোকে যদি ধরে রাখতে হয় তাহলে এখনই তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। তাঁর বইগুলোকে নেট-এ নিয়ে আসতে হবে। তাঁর অনেক বই আছে যা এখন আর পাওয়া যায় না। সেগুলো পুনর্মুদ্রণ করতে হবে। বারবার মুদ্রণ বা বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে মুদ্রণের কারণে তাঁর বইগুলোতে যে ভুল-ত্রুটি তৈরি হয়েছে সেগুলো সম্পাদনা করে নতুন করে প্রকাশ করতে হবে। তাঁর টেলিভিশনের জন্য নির্মিত অনুষ্ঠানগুলো আর্কাইভে সংরক্ষণ করতে হবে।

হুমায়ূন আহমেদ যে কত বড় মাপের স্রষ্টা, সৃষ্টিশীল মানুষ, তা সময়ই বিচার করবে। আর এজন্যই তাঁর শিল্পকর্ম সংগ্রহ করতে হবে। আর এটা করতে হবে এখনই, নয়তো অনেক কিছুই আমরা হারিয়ে ফেলব।

করিমুর রেজা সাগর

দেখা অদেখায়

হুমায়ূন আহমেদ

নাট্যকার হিসেবে চেনার আগে তাঁকে আমি লেখক হিসেবে চিনতাম। বাংলাদেশ টেলিভিশনের স্টুডিওতে তাঁর সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা, তার আগেই ‘শজনীল কারাগার’, ‘নন্দিত নরকের মতো উপন্যাসগুলো তাকে পরিচিতি দিয়েছে। তবে নাটকপাড়ায় হুমায়ূন আহমেদ তখনো খুব আলোচিত নাম নয়। একপর্বের একটি নাটক করতে গিয়ে নাট্যকার হুমায়ূনের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। নাটকটির প্রযোজক ছিলেন সম্ভবত মোস্তাফিজুর রহমান। আমার একটা অভ্যাস, সবসময় একটা দৃশ্যের-দৃশ্যায়ন শেষ হলেই সবার কাছে জানতে চাইতাম, কেমন হলো কাজটা। এই আচরণই হুমায়ূন আহমেদের কাছে আমাকে আলাদা করে তুলেছিল। আর আমার দিক থেকে, ভালো নাট্যকার এবং লেখক হিসেবে এক ধরনের শ্রদ্ধাবোধ তো ছিলই। সেই থেকে শুরু। বলছি সম্ভবত ‘৭৬ সালের কথা।

এরপর একে একে ‘অয়োময়’, ‘এইসব দিক্তাঙ্গি’, ‘বহুব্রীহি’, ‘কোথাও কেউ নেই’... সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ হতে থাকে। সেই সময় হুমায়ূন আহমেদের প্রায় সবগুলো নাটক-সিনেমাতেই আমি ছিলাম পরিচিত মুখ। শুধু অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূরই না, ব্যক্তি নূরের সঙ্গেও ততদিনে তার বেশ ভালো বোঝাপড়া তাই আমি যখন রাজনীতি শুরু করলাম, প্রথম প্রথম খুব স্বেচ্ছায় গিয়েছিলেন। ‘আপনি রাজনীতি করলে নাটক করবে কে?’ পরে অবশ্য মেনে নিতেন।

একপর্বের নাটক, ধারাবাহিক নাটক-হুমায়ূন আহমেদের বহু নাটকে আমি অভিনয় করেছি। একটা নাটকের কথা বলি। নাটকের নাম ‘নিমফুল’। তবে ‘নিমফুল’ নাম হওয়ার পেছনে একটা মজার গল্প আছে। সেই সময় বিটিভির টিভি গাইড ছাপা হতো। নাটক প্রচার হওয়ার আগেই নাটকের নাম জমা দিতে হতো। একটা গল্প মাথায় রেখে হুমায়ূন নাম দিলেন— ‘নিমফুল’। পরে দেখা গেল, গল্প বদলে গেছে। তখন আর নাম বদলের সুযোগ নেই। ‘নিমফুল’ নামে দর্শক যে নাটক দেখল, সেটি আসলে হুমায়ূন আহমেদের লেখা ‘চোখ’ গল্পটির নাট্যরূপ। নাটকে আমার চরিত্র—মনা ডাকাত। হুমায়ূনের নাটকগুলোতে একেকবার আমি একেক রূপে হাজির হতাম। এই ব্যাপারটা আমাকেও খুব আনন্দ দিত। ‘কোথাও কেউ নেই’ নাটকে কথা ছিল আমি মোনার প্রেমিকের চরিত্রটা করব। যে চরিত্রে পরে খায়রুল আলম সবুজ অভিনয় করেছেন। আমি হুমায়ূন আহমেদকে বলেছিলাম, এই চরিত্রে অভিনয় করলে আমি সচরাচর যা

করি, তা-ই করা হবে। হুমায়ূন মেনে নিয়েছিলেন। সে চিন্তা থেকেই পরে বাকের ভাইয়ের চরিত্রে আমাকে নেওয়া।

হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে একটা দীর্ঘ সময় কেটেছে নুহাশপল্লীতে। নুহাশপল্লীর প্রথম দিককার কথা। সেই সময় এখনকার মতো পাকা ঘর ছিল না। একটা টিনের ঘর ছিল, আর ছিল একটা বাঁশের মাচার ঘর। মনে আছে সেই মাচার ঘরে পা ফেললেই ক্যাচক্যাচ শব্দ হতো। একবার শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেল ছাত্র শিবিরের হামরায়। দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। একটা বিশ্ববিদ্যালয় এতদিন ধরে বন্ধ-হুমায়ূনের কাছে ব্যাপারটা ভালো লাগেনি। তাঁর পরামর্শে সভা ডেকে আমরা দলবেঁধে রওনা হলাম সিলেট, বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার দাবিতে অনশন করব বলে। ষাট-সত্তর জনের বিশাল দল, সিলেটে থাকা-খাওয়ার কোনো বন্দোবস্ত নেই, এ নিয়ে তার কোনো চিন্তাও নেই। সেই সময় সিলেটে এ নিয়ে দারুণ উত্তেজনা। ট্রেনে রওনা হওয়ার দু'এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা খবর পেলাম, নুহাশপল্লীতে। সেই বাঁশের মাচার ঘর কে বা কারা যেন পুড়িয়ে ফেলেছে।

একবার আমরা একটা দৃশ্যের দৃশ্যায়ন করলাম। সেই দৃশ্যের অন্যতম কুশীলব ছিল কালো একটা ঘোড়া। কদিন পর একই দৃশ্যের গুটিং আবারও সেই কালো ঘোড়াকে তলব করা হলো। জানা গেল, কালো ঘোড়াটা বিক্রি হয়ে গেছে। কালো ঘোড়াটা নেই, তবে একটা সাদা ঘোড়া খুঁজা গেছে। একদিন দেখি এক লোক জুতার ব্রাশে রঙ লাগিয়ে ঘোড়াকে কালো করার চেষ্টা করছে। হুমায়ূন সেই সাদা ঘোড়াকেই জুতার কালি মেখে কালো করবেন। ঘোড়া নিয়েই আরও কাণ্ড আছে। নদীর ওপরে গুটিং হবে। ঘোড়াটাকেও নদীর ওপার নিতে হবে। রাতের বেলা, ঘোড়া নিয়ে নদী পাড়ি দেওয়া-বিরাট ব্যক্তি। ঘোড়া কিছুতেই নৌকায় উঠতে চায় না। একসময় তো ঘোড়া নৌকা থেকে পানিতেই পড়ে গেল। গুটিং-টুটিং মাথায় উঠল, সে এক বিপজ্জনক অবস্থা। এত রাতে সবাই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘোড়াটাকে টেনেটুনে পাড়ে তুলেছিল। সেই দৃশ্যের গুটিং করতে অপেক্ষা করতে হয়েছিল পরদিন পর্যন্ত একবার আরও কত শত ঘটনা। আজই করতে হবে, এক্ষুনি করতে হবে-এই পাগলামি হুমায়ূন আহমেদের মধ্যে অধিক মাত্রায় ছিল। চট করে রেগে যেতেন, আবার ঠিক হয়ে যেতেন।

আমার বিজ্ঞাপনী সংস্থা থেকে তাঁকে দিয়ে বেশ কিছু জনসচেতনামূলক নাটক করিয়েছি। এসব নাটক হুমায়ূন যে খুব আনন্দ নিয়ে করতেন, তা না। তবে আমার অনুরোধ ফেলতেও পারতেন না। আমার চাপে পড়ে এক প্রকার বাধ্য হয়েই লিখতেন। মাঝে মাঝে এসব নাটক লেখার পর প্রযোজন সংস্থাগুলো কিছু কিছু জায়গা পরিবর্তন করতে বলত। হুমায়ূন বলতেন, আমি ওসব পারব না, আপনি করে নিন। ছোটখাটো

পরিবর্তনগুলো আমিই করতাম, হুমায়ুনকে দেখাতামও না। পরে তিনি অবাক হয়ে বলতেন, 'আপনি তো আমার মতো করেই লিখেছেন!' তাঁর সঙ্গে কাজ করতে করতেই আসলে এমন একটা বোঝাপড়া তৈরি হয়ে গিয়েছিল, হুমায়ুন আহমেদের সংলাপ কেমন হবে, আমি জানতাম।

হুমায়ূনের সঙ্গে গল্প করতে বসলেই বোঝা যেত, পড়ার প্রতি তাঁর তীষণ ঝোঁক। শুধু যে সাহিত্য পড়তেন তা না, বিজ্ঞান নিয়েও প্রচুর পড়তেন। লিখতেনও। কঠিন কঠিন বিষয়-সহজ করে লিখে ফেলতেন। তাঁর পড়ালেখার বিষয় বিজ্ঞান। যে সময় পড়ালেখা করেছেন, শুধু সেই সময়ের বিজ্ঞানই না, বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার নিয়েও তিনি খুব ভালো ধারণা রাখতেন। আমার খুব অবাক লাগত। ভাবতাম, হুমায়ুন পড়েন কখন? যতদূর মনে হয়, ভোর থেকে শুরু করে দুপুরে খাওয়ার আগে পর্যন্ত—এই ছিল তাঁর পড়া আর লেখার সময়। কখনো হয়তো তাঁকে ধরেছি, টেলিভিশনের জন্য একটা ছোট্ট নাটিকা লিখে দিতে হবে। দুই কি এক মিনিট দৈর্ঘ্যের। বলতেন, আজ না কাল আসেন। এমন করতে করতে বেশ করেকদিন পেরিয়ে গেলে তাঁর বাসায় গিয়ে হাজির হতাম, বলতাম যে করেই হোক, আজ বোকাটা লাগবে। হুমায়ুন বলতেন, আপনি আধঘণ্টা ঘুরে আসেন। ঘুরে এসে দেখুন, লেখা হয়ে গেছে। অথচ সামনে বসে থাকলে লেখা হতো না। হুমায়ূনের লেখার প্রতি-অবিশ্বাস্য!

হুমায়ুন আহমেদ কৌতুক শুনতে অস্বীকার করতে ভালোবাসতেন। আর ভালোবাসতেন ম্যাজিক। দেখাতেনও দারুণ! আমার কখনো কখনো মনে হতো, তাঁর মধ্যে এক ধরনের অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা আছে। জানি না কেন। একটা কারণ হতে পারে, হুমায়ুন যখন নানা ধরনের গল্প বলতেন, মাঝে মাঝে কিছু গল্প সত্যি বলে মনে হতো। তা ছাড়া অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা না থাকলে একটা মানুষ এভাবে লিখতে পারেননা। অনেকে বলে, হুমায়ূনের সব লেখা ভালো না। এটা সব বড় লেখকের ক্ষেত্রেই সত্যি। শুধু তাঁর ভালো গল্প-উপন্যাসগুলোই যদি ধরেন, তার সংখ্যাও কিন্তু অনেক।

হুমায়ুন খুব গানপাগল ছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত পছন্দ করতেন। হাছন রাজার তীষণ ভক্ত ছিলেন। আমার মনে হয়, তাঁর নিজের জীবনটাও অনেকটা হাছন রাজার মতোই। একেবারেই সাদাসিধে ছিলেন। ঘরের দরজা কখনোই লাগাতেন না। বেশির ভাগ সময়ই খালি গায়ে থাকতেন। আমি বাসায় গেলে হয়তো বলতেন, 'নূর, আসেন।' বলতে বলতে শাটটা গায়ে দিতেন, বোতামও লাগাতেন না। এরকমই ছিলেন মানুষটা...

-আসাদুজ্জামান নূর

বড়ো বেদনার মতো বেজেছে তুমি হে..

রবীন্দ্রসঙ্গীত বড়োই প্রিয় ছিল তাঁর। অনিন্দ্য সেই বাণী ও সুরের ভবনে নিমজ্জন ছিল বড়োই আকাঙ্ক্ষিত। নিজের লেখা অনেক বইয়ের নামকরণের জন্য হাত পেতেছেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। অকুণ্ঠচিত্তে নিয়েছেন শরণ। আমাকে ও আমার স্ত্রী শাহীন আখতারকে একটি উপন্যাস উৎসর্গ করেছিলেন নব্বইয়ের দশকে। সে বইটির নামও রবীন্দ্রসংগীত থেকে নেওয়া। নামটি হলো : তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে। জননন্দিত কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদের স্মরণে কিছু লিখতে গেলে রবীন্দ্রকবির ভাণ্ডার হাতড়ানো তাই প্রাসঙ্গিক। জায়েজও বটে। স্বজন হারানোর শোকোচ্ছ্বাস এখনো স্তিমিত হয়নি। এই রচনায় তাই এলোমেলো টুকরো কথার মালা গাঁথবার চেষ্টা।

যদিই আমি ক্রিজে থাকব, রান করে যাব। রান ছাড়া আমি ক্রিজে টিকে থাকতে চাই না। এই কথা বলেছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। বাংলাদেশের জননন্দিত কথাশিল্পী, তাঁর এক জন্মদিনের অনুষ্ঠানে। কথা রেখেছেন। মৃত্যুর পর কিছুদিন আগ পর্যন্ত সচল ছিল তাঁর কলম। বেশ কয়েক বছর ধরেই সাদৃশ্যের উদ্‌যাপন করা হয়ে আসছে হুমায়ূন আহমেদের জন্মদিন। উদ্যোক্তা তার বইয়ের প্রকাশকেরা প্রতিবছর ১৩ নভেম্বর জন্মদিন উপলক্ষে একক বইমেলার আয়োজন করা হয়। থাকে আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। শাহবাগের কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি চত্বর সরগরম হয়ে ওঠে হুমায়ূন-ভক্তদের সমাগমে।

গতবছর, ২০১১ সালে তখন হুমায়ূন আহমেদের ৬৩তম জন্মদিন ঢাকায় উদ্‌যাপিত হয়, তখন তিনি ছিলেন আমেরিকায়, চিকিৎসাধীন। সেটা হয়েছিল তাঁর অনুপস্থিতিতে। এবারের (২০১২) আয়োজন করা হবে তাঁর অবর্তমানে। লাখে অনুরাগীকে শোকস্তব্ধ বেদনার্ত করে দিয়ে তিনি চলে গেছেন অন্য ভবনে। তার অস্তিম শয়ান হয়েছে তাঁর নিজেরাই হাতে গড়া স্বপ্নপুরী নিভৃত নিঝুম নুহাশপল্লীতে। এই নুহাশপল্লী ছিল তাঁর অহঙ্কারের জায়গা। আত্মমগ্ন থাকবার, অবসর কাটানোর, লেখালেখি করবার, একান্ত সময় কাটানোর জায়গাও বটে।

মনে পড়ছে একটি ছোট্ট ঘটনার কথা। এই ঘটনার সঙ্গে নুহাশপল্লীর অনুষঙ্গ জড়িত। আমি তখন দৈনিক 'জনকণ্ঠ' সিনিয়র রিপোর্টার। নব্বইয়ের দশকের শেষ দিককার কথা। ঢাকায় অনুষ্ঠিত হলো মিনি বিশ্বকাপ ক্রিকেট। সাজ সাজ রব। 'জনকণ্ঠ' থেকে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো খেলার পাতায় যেন হুমায়ূন আহমেদের লেখা জোগাড় করে দিই। নিয়মিত কলাম। জোগাড় করে দিয়েছিলেন। নিউ ইস্কাটিনের 'জনকণ্ঠ' অফিসে একদিন তাঁকে আমন্ত্রণ জানালাম। সানন্দে গ্রহণ করলেন

সেই আমন্ত্রণ এক রাতে চলে এলেন 'জনকণ্ঠ' অফিসে। সঙ্গে আনলেন তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্র 'শ্রাবণ মেঘের দিন' এর গানের সিডি। একটা না। তিন তিনটা। একটা 'জনকণ্ঠের' উপদেষ্টা সম্পাদক তোয়াব খানের জন্য। একটা পত্রিকার মালিক সম্পাদক মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ খান মাসুদের জন্য। অন্যটা এই অধর্মের জন্য।

'শ্রাবণ মেঘের দিন' ছবির গানগুলো সুপার হিট। 'আমার গায়ে যত দুঃখ সয়', 'শোয়াচান পাখি আমি ডাকিতাছি তুমি ঘুমাইছ নাকি', 'নাও বাওয়া মর্দ লোকের কাম', 'এক যে ছিল সোনার কন্যা' ইত্যাদি গান আছে এই চলচ্চিত্রে। এই সিডি জনকণ্ঠে আমার সহকর্মী রিপোর্টাররা আত্মহ ভরে শুনেছেন বহু বহু দিন।

জনকণ্ঠ সম্পাদক আতিকউল্লাহ খান মাসুদ সাহেবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম হুমায়ূন ভাইয়ের। তিনি সম্পাদক সাহেবকে নুহাশপল্লীতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। বেশ ভালো কথা। হুমায়ূন আহমেদ মৃদুকণ্ঠে কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, কিন্তু একটা শর্ত আছে ভাই। সম্পাদক সাহেব শর্তের কথা শুনে একটু থমকে গেলেন যেন। জিজ্ঞাসা চোখে তাকালেন জননন্দিত কথাসিদ্ধীর দিকে। ব্যাপারটা খোলাসা করলেন হুমায়ূন আহমেদ— আপনাকে যেতে হবে পূর্ণিমার রাতে। সারারাত থাকবেন। আপনাকে বারী সিদ্দিকীর বাঁশি শোনাও। তবে শর্ত হলো, আপনি যে সম্পাদক— এ কথাটা ভুলে থাকতে হবে।

পূর্ণিমার রাত ভারী পছন্দ ছিল তাঁর। লেখায়, সাক্ষাৎকারে আছে সেই ভালো লাগার পরিচয়, প্রতিফলন বিবরণী। পত্রিকার হুমায়ূনের বিখ্যাত সেই গানের কথা কে না জানে—

ও কারিগর দয়্যার সাগর
ওগো দয়্যাময়/ চান্নি পসর রাইতে
যেন আমার মরণ হয়।

নব্বইয়ের দশকেই হুমায়ূন আহমেদের একজন সফরসঙ্গী হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম সুনামগঞ্জের হাসন উৎসবে। তখন কাজ করতাম দৈনিক বাংলায়। মনে পড়ে, খুব ঘটা করে সেবার হাসান উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়েছিল। আমাদের অবস্থান সুনামগঞ্জ সার্কিট হাউসে। কবি শামসুর রাহমানও অংশ নিয়েছিলেন হাসন উৎসবে। এক রাতে ঠিক হলো। হাসন রাজার কবর দেখতে যাব আমরা। তখন চলছে ঘোর কৃষ্ণপক্ষ। চান্নিকে ঘুরঘুটি অঙ্ককার। সেই ঘনকৃষ্ণ রাতেই আমরা দেখলাম হাসন রাজার কবর। দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে জ্বেলে। হুমায়ূন ভাইকে ঠাট্টা করে বললাম, শুধু জোছনা জোছনা করেন আপনি। অঙ্ককারেরও কিছু সৌন্দর্য আছে। সেটা অন্যরকম। সে কারণেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন। 'আঁধারের রূপ' নামের

প্রবন্ধ। জোছনার জন্যে এক ধরনের হাহাকার ও ব্যাকুলতা কাজ করতো হুমায়ূন আহমেদের মধ্যে। সেজন্যেই তাঁর সৃষ্টি সঙ্ঘ্যারে জোছনা-প্রীতির এস্তার উদাহরণ মিলবে। আরো পরের দিকে তাঁর লেখা কিছু কবিতা নিয়ে একটা কার্ড বেরয় কাকলী প্রকাশনী থেকে। নাম 'গৃহত্যাগী জোছনা'। চান্নি পসর রাতে নিজের মৃত্যু কামনা করেছিলেন তিনি। আফসোস! তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণ হয়নি। অমাবস্যার রাতে তাঁকে চিরবিদায় নিয়ে হয়েছে।

হুমায়ূন আহমেদ এক অসামান্য স্রষ্টা। তাঁর সৃষ্টিসম্ভারে বৈচিত্র্য যেমন আছে, তেমনি মনোগ্রাহিতার অনেক উজ্জ্বল উপাদানও উপস্থিত। কেমন ছিল তাঁর সমাজভাবনা, দেশচিন্তা? ছোট্ট একটি সাক্ষাৎকারে তাঁর দেশ ভাবনা, মাতৃভূমিকে নিয়ে গভীর নিবিড় স্বপ্ন, আকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ২০১০ সালের ১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষের সূচনা দিনে তাঁর একটি সাক্ষাৎকারভিত্তিক লেখা ছাপা হয়েছিল যেখানে আমি বর্তমানে কর্মরত, সেই 'আমার দেশ'-এ। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায়, অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে। হুমায়ূন আহমেদের ছবিসমেত। পয়লা বৈশাখের আগের দিন 'দখিন হাওয়া'য় গিয়ে তাঁর সাক্ষাৎকারটি নিই। কথাবার্তা শেষ হলে বলি, লেখাটা কি টেলিফোনে আপনাকে পড়ে শোনাব? তিনি জবাব দেন, না। তার দরকার নেই।

সেই লেখা পাঠকসমীপে নিবেদন করা হলো এখানে—

পহেলা বৈশাখ নিয়ে ছেলেবেলার স্মৃতি নেই আমার। তবে জন্মষ্টমীর মেলার স্মৃতি নেই আমার। তবে জন্মষ্টমীর মেলার স্মৃতি আছে। এটা আমার ৪/৫ বছর বয়সের কথা। সিলেট, নেত্রকোণায় দেখেছি এসব মেলা। নেত্রকোনায় নানাবাড়ির এলাকায় মেলা দেখতে গেছি। ছেলেবেলায় দেখা মেলা এবং এখনকার মেলার মধ্যে বড় ধরনের কোনো পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। আমার ধারণা, মেলার ক্ষেত্রে বিবর্তন খুব একটা হয়নি।

গরমের সময় হতো মেশা। সেই মেলায় পাওয়া যেত মাটির খেলনাপাতি। পাওয়া যেত তো কমা দেওয়া শরবত। সেসব খেয়েছি। মনে পড়ে, একধরনের পিছলা জিনিস গলা দিয়ে নামছে। আর পাওয়া যেত বাতাসা, কদমা। চিনির সিরায় তৈরি নানা ধরনের পুতুল। মেলার ব্যাপারটি বেশ উপভোগ করতাম। যে কোনো বাচ্চারই উপভোগ করার কথা। ঝিনুক ঘষে ধার করে এক প্রকার ছুরি বানানো হতো। তা দিয়ে কাটা হতো আম। সেসব ছুরি বিক্রি হতো মেলায়।

মনে পড়ে, একবার আমি মেলায় হারিয়ে গিয়েছিলাম। মামাদের সঙ্গে মেলায় গেছি। মনের আনন্দে ঘুরতে ঘুরতে হারিয়ে গেছি একসময়। আমি কিন্তু মোটেও চিন্তিত ছিলাম না এ নিয়ে। ভেবেছি, মামারা আমাকে খুঁজে পাবেনই সন্ধ্যাবেলা মেলা যখন

ভাঙতে শুরু করেছে। লোকজন চলে যাচ্ছে, মেলার মাঠ ফাঁকা হয়ে আসছে তখন মামারা আমাকে খুঁজে পান। না, তারা কোনো বকাঝকা আমাকে করেননি। আমাকে খুঁজে পাওয়ার আনন্দেই তারা অভিভূত ছিলেন।

মেলায় পাওয়া যেত মুড়ি-মুড়কি। ছোট ছোট বাচ্চারা হাত দিয়ে এক-দু'মুঠো মুড়ি-মুড়কি নিয়ে নিত। আশ্চর্য ব্যাপার হলো, দোকানিরা ওদের কিছু বলত না। নিশ্চয়ই এ ধরনের ব্যাপার আজকাল ঘটে না।

বাংলাদেশের সব উৎসবই ধর্মভিত্তিক। একুশে ফেব্রুয়ারি ও পহেলা বৈশাখ ছাড়া। আমাদের দুই ঈদই ধর্মভিত্তিক। একুশে ফেব্রুয়ারি ও পহেলা বৈশাখ সব বাঙালির। সব ধর্মের মানুষের। এ দুটি উৎসব সর্বজনীন; এখানে ধর্মের কোনো ব্যাপার নেই।

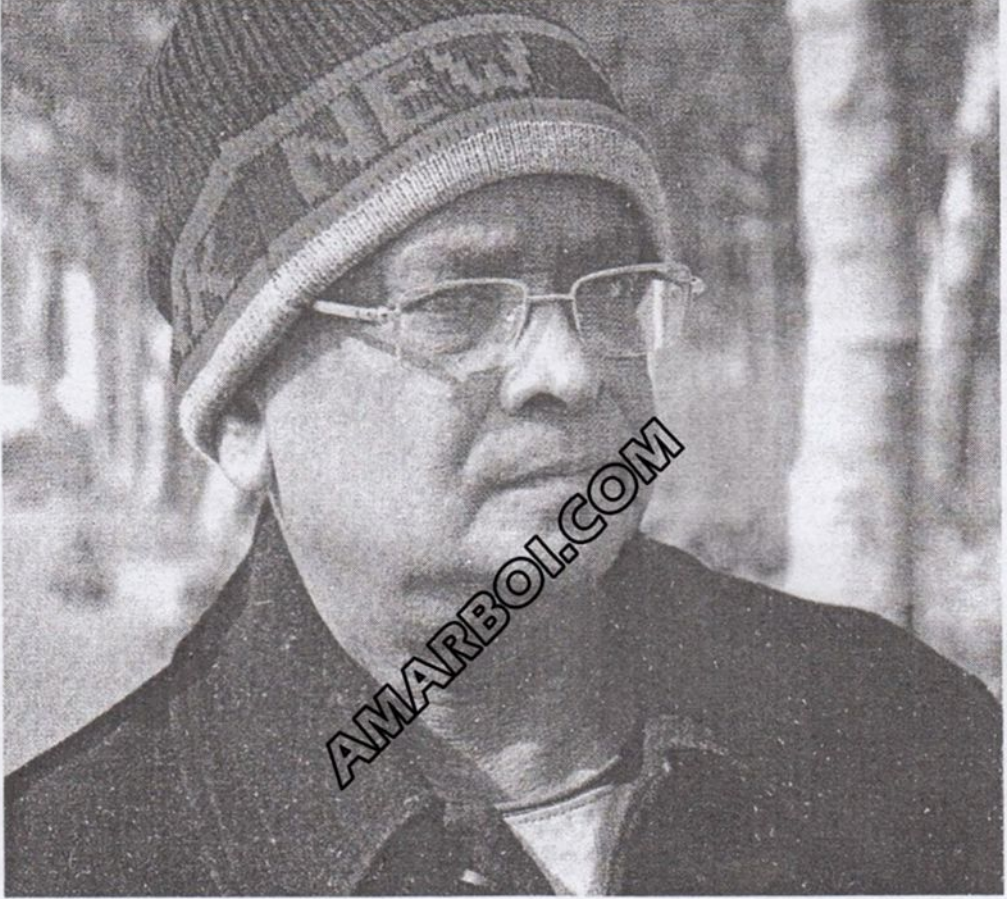
ইংরেজি বছরই আমরা দৈনন্দিন জীবনে অনুসরণ করি। তবে গ্রামের মানুষ বাংলা সন অনুযায়ী চলেন। শহরে মানুষরা চট করে বলতে পারেন না বাংলা কোন মাস চলছে, কত তারিখ আজ। ইংরেজি বছর হচ্ছে কাজের, চাকরিজীবীরা খ্রিষ্টবর্ষের মাস হিসেবে বেতন পান। খ্রিষ্টিয় বর্ষ কাজের, আর বাংলা বর্ষ হচ্ছে হৃদয়ের। বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনে পরিবর্তন আসছে। ভবিষ্যতে আরও আসবে। তবে একটা কথা কী, আমাদের কোনো সংস্কৃতি, কোনো ঐতিহ্যকেই হাতছাড়া হতে দেওয়া যাবে না। আমাদের শেকড়ের যা সম্পদ, সংস্কৃতির ঐতিহ্য, তাকে হাতছাড়া হতে দেওয়া উচিত নয়। আমার আশঙ্কা, কোনদিন না কোন কোম্পানি বলে বসে পহেলা বৈশাখ আমরা লিজ নিয়ে নিলাম। এ ধরনের কিছু ঘটলে তা হবে অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা।

পহেলা বৈশাখের দিনটি আমি বাড়িতেই থাকি। ঘরে বসে দিন কাটাই। টিভিতে অনুষ্ঠানমালা দেখি। যা গরম থাকে! ছাত্রজীবনেও রমনা বটমূলে ছায়ানটের গানের আসবে যাওয়া হয়নি। কারণ, এত সকালে আমার ঘুমই ভাঙে না। আজকাল আমার বাড়িতে পহেলা বৈশাখের দিন পান্তাভাতের আয়োজন থাকে। পান্তাভাত নিয়ে বাড়িবাড়িও কম হচ্ছে না। কবে কোন ফাইভ স্টার হোটেল বলে ফেলবে আমাদের কাছে পাওয়া যাবে স্ট্রাবেরি ফ্লেভারড পান্তা-আমি সে অপেক্ষায় আছি। এভাবে আমাদের সংস্কৃতি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার শঙ্কা রয়েছে।

নতুন বাংলা সন ১৪১৭-এ বাংলাদেশকে দেখতে চাই বিদ্যুৎ সঙ্কট থেকে মুক্ত দেশ হিসেবে। বিদ্যুৎ সঙ্কটের সমাধান হলে পানি সমস্যারও সুরাহা হবে। বিদ্যুৎ, পানি, যানজট এই তিন সঙ্কট থেকে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে মুক্ত দেখতে চাই। ঢাকা শহরে যানজটের জন্য আজকাল চলাফেরা করা যাচ্ছে না। ভয়ে আমি ঘর থেকে বেরোই না। ধরুন, একজন বৃদ্ধ মানুষ যানজটে আটকা পড়ে আছেন। তিন ঘণ্টা। তার প্রস্রাবের সমস্যা আছে। তাকে তো গাড়িতেই প্রস্রাব করে ফেলবে হবে। উপায় নেই।

১৪১৭ নতুন বাংলা সনে বৃহত্তর বাংলাদেশের জন্য যা চাই, তা হলো শান্তি। আর কিছু না। ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ড তো চোখের সামনেই দেখছি।

-হাসান হাফিজ



নন্দিত লেখক হুমায়ুন আহমেদ

জন্ম : ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮

মৃত্যু : ১৯ জুলাই ২০১২